ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদক

অসিত সেন ও সুধীর দাস



মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—ছয় টাকা—

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৪ বাগমারী রোড, কলি-১১ হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

বন্ধুবর রাহুল সাংকৃত্যায়নের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থ "ভোল্‌গা সে গঙ্গা"র বঙ্গানুবাদ বের হ'ল। গ্রন্থটি প্রায় সকল ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বহির্ভারতেও ইংরাজী ও বর্মী ভাষায় এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

"ভোল্‌গা সে গঙ্গা" গ্রন্থখানির প্রথমতম আবেদন হচ্ছে এর আখ্যানবস্তু ; সমগ্র গ্রন্থটি ছোট ছোট গল্প বা কাহিনীর আকারে লেখা। কিন্তু এই কাহিনী বা আখ্যানের পেছনে একটি ব্যাখ্যানও রয়েছে। সে ব্যাখ্যান বিরাট পটভূমিকার ওপর ঐতিহাসিক সত্য-বস্তুর : প্রায় ছয় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দকালে ভারতের সুদূর উত্তরপশ্চিমে দক্ষিণবাহিনী ভোল্‌গার তীরে অরণ্যতুষারসমাচ্ছন্ন পরিবেশে যে মানবগোষ্ঠীর পদপাত শোনা গিয়েছিল, তাঁদেরই আবাস, জীবন, প্রেম ও ভালবাসা নিয়ে এ মহাগ্রন্থের প্রথম দৃশ্যপট উত্তোলিত হ'ল। তারপর সেই মানুষ ক্রমে মধ্য ভোল্‌গাতটে অগ্রসর হয়ে এল, তার সমাজ বিকশিত হয়ে উঠল, ক্রমে ক্রমে তার ভাষাও বিন্যস্ত হয়ে এল। ক্রমে এই হিন্দী-স্লাভ ভাষাভাষী মানুষ আরও অগ্রসর হয়ে এল, তরঙ্গের পর তরঙ্গে তারা মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে গেল—পামিরে, উত্তর কুরুতে তাদের বসতি হ'ল, এবার জন্ম হ'ল হিন্দী-ইরাণী ভাষার। ক্রমে তারা স্বাত উপত্যকায় পৌছে গেল, এবার সারা গান্ধার জুড়ে তাদের আবাস ; —হিন্দী-আর্য ভাষা তখন জন্ম নিয়েছে, সম্ভবতঃ সেখানেই ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে এই আর্যভাষীদের বসতি স্থাপিত হয়েছে।

এই ভাবে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে কাহিনীর পর কাহিনীতে বিংশ শতাব্দীতে পৌছে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের কাহিনীগুলো কাহিনী হলেও নিছক কল্পনাপ্রসূতই নয়। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পগুলি ধারাবাহিক ভাবে রচিত হয়েছে। তাই ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে কোথাও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ; বরং কাহিনীতে কায়ালাভ ক'রে ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই আরও বাস্তব, আরও সজীব হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি গল্পচ্ছলে অনুধাবন করার পক্ষে এ গ্রন্থের মূল্য তাই অনস্বীকার্য।

"ভোল্‌গা সে গঙ্গা"র প্রথম কয়েকটি কাহিনীতে বাস্তব তথ্যপ্রমাণে স্বাভাবিক অপ্রতুলতা রয়েছে। কারণ, ভোল্‌গা থেকে মানবের প্রাচীন গোষ্ঠীসমূহের ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌছবার সময়টা প্রাগৈতিহাসিক। নিশা, দিবা, অমৃতাশ্ব, পুরুহূত প্রভৃতি কাহিনী-রচনায় রাহুল প্রধানতঃ লুইস মর্গানের 'এনসেন্ট সোসাইটি', এঙ্গেল্‌সের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', রবার্ট ব্রিফলের 'দি মাদার্স' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানীদের অনুমোদিত তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন ; তবে এখানে তাঁর স্বকীয়তাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। হয়ত এ কথা সত্য যে, রাহুলের নির্ধারিত মতামত কোনও কোনও ক্ষেত্রে এখনও স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে, এবং প্রকৃতপক্ষে ভূমিকা-লেখকও বহুক্ষেত্রে রাহুলের মতামতকে সম্পূর্ণতঃ স্বীকার করেন না—বহু স্থানে ইতিহাসের ইঙ্গিতমাত্র আশ্রয় করে রাহুল কাহিনীতে যে গাঢ় বর্ণলেপ দিয়েছেন, তাও হয়ত সর্বত্র যথাযথ না হয়ে থাকতে পারে ; কিন্তু শুধু তারই জন্য, যে উপায়ে এবং যে দৃষ্টি নিয়ে রাহুল এই সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসকে অধ্যয়ন করেছেন তার মূল্য তুচ্ছ হতে পারে না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনীগুলো ঐতিহাসিক যুগের অর্থাৎ প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের—পুরুধান থেকে প্রবাহণ পর্যন্ত কাহিনীগুলোতে রাহুল বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পুরাণ এবং বৌদ্ধভাষ্য অট্ঠকথার সাহায্য নিয়েছেন। এর মধ্যে সুদাস সম্পূর্ণভাবে ঋগ্বেদের উপর নির্ভর করে লেখা। প্রবাহণের আধার ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং তার সঙ্গে অট্ঠকথা। এই অংশে খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর থেকে প্রায় সাত শত খৃষ্টপূর্ব বৎসর পর্যন্ত তেরশ' বছরের বর্ণনা রয়েছে।

তারপর পাঁচশ' খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে গুপ্তযুগের প্রাক্কাল অবধি কাহিনীগুলোর মোটামুটি আধার হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ এই দুটি গ্রন্থ—এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রীক পর্যটকের ভ্রমণকথা, জয়সওয়াল-এর 'হিন্দু পলিটি' ও অন্যান্য ইতিহাস। তদুপরি প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটক, উইণ্টারনিট্‌জের 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস', রিজ ডেভিড্স-এর 'বৌদ্ধ ভারত' এই পর্যায়ের কাহিনী-রচনায় বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে। এর পর সুপর্ণ-যৌধেয় কাহিনীতে এসে পুরাপুরি গুপ্তযুগের বিবরণ পাওয়া গেল—এর বহু বিবরণ গুপ্তযুগের পুরালেখসমূহ থেকে আহৃত হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ থেকেই গৃহীত, তা' ছাড়া চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন-এর ভ্রমণবৃত্তান্তও কাজে লেগেছে। এই বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাণ্ডেরকারের গবেষণালব্ধ সামগ্রীর সাহায্য নিয়ে "জয় যৌধেয়" নামক একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও রাহুল লিখেছেন।

এর পরের আখ্যান দুর্মুখ মূলতঃ হর্ষচরিত, কাদম্বরী এবং হি উয়েন সাঙ এবং ইৎসিঙ-এর বিবরণাদির উপর নির্ভরশীল, তেমনি চক্রপাণির ঐতিহাসিকতারও মোটামুটি প্রমাণ নৈষধ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু লেখমালা। তারপর নূর দীন থেকে গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার নিদর্শন আরও স্পষ্ট এবং এ সব পর্যায় সম্পর্কে সমালোচকের অঙ্কুশ ততটা উদ্যত হয়ে নেই। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, এ গ্রন্থের অধিকাংশ আখ্যানের পাত্রপাত্রীই সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তবে তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে তারা পূর্বাপর ঐতিহাসিক সময়সূত্রে গ্রথিত।

সর্বশেষ আর একটি বক্তব্য, গ্রন্থের অনুবাদ যে সর্বত্রই একেবারে ত্রুটিহীন হয়েছে তা হয়ত নয়; এতে আরও খানিকটা পরিমার্জনার সুযোগ হয়ত ছিল—কিন্তু তাতে বিষয়ের কোন তারতম্য ঘটেনি। মূল হিন্দী থেকে অনুবাদ করার জন্য বন্ধুবর শ্রীসুধীর দাস ও শ্রীমান্ অসিত সেন যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানানোই যথেষ্ট নয়, তাঁদের সফলতাকেও সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। আশা করি, অন্যান্য ভাষায় "ভোল্‌গা সে গঙ্গা"র অনুবাদ যেরূপ সমাদর লাভ করেছে, বঙ্গানুবাদও ততটা বা তারও বেশী সমাদর লাভ করবে। এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বন্ধুবর শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের সাহায্য এবং সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিমধিকমিতি—

১লা বৈশাখ, ১৩৬১
স্বাধীনতা কার্যালয়,
কলিকাতা।

শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা

নিশা

দেশঃ ভোলগা নদীর তীর
কালঃ ৬০০০ খৃষ্ট পূর্ব

১

বেলা দ্বিপ্রহর, অনেকদিন পরে আজ সূর্যের দর্শন পাওয়া গেল। এখনকার দিনগুলি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, রৌদ্রের তীব্রতা নেই, মেঘহীন তুষার ও কুয়াসামুক্ত এবং ঝঞ্ঝাহীন এই সূর্যের সুদূরবিস্তারী কিরণ দেখতে মনোহর—তার স্পর্শ এক আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে। আর চারিদিকের দৃশ্য? ঘন নীল আকাশের নীচে পৃথিবী রয়েছে কর্পূরের মতো সাদা তুষারে ঢাকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর তুষার পাত না হওয়ার জন্য পূর্বের দানা দানা তুষার কণাগুলি কঠিন জমাট হয়ে গেছে। এই হিমবসনা ধরিত্রী দিগন্তবিস্তারী নয়—বরং উত্তর থেকে দক্ষিণে কয়েক মাইল পর্যন্ত চলে গিয়েছে আঁকা-বাঁকা রূপালী রেখার মতো—যার দুধারে পাহাড়ের ওপর নিবিড় অরণ্যরেখা। আসুন এই বনরাজিকে আরও কাছে গিয়ে দেখি। এই তরুশ্রেণীর মধ্যে মূলত দুই ধরনের বৃক্ষাদি আছে। একটির নাম ভূর্জ—শ্বেত বল্কলধারী এবং বর্তমানে নিষ্পত্র, অপরটি পাইন—উত্তুঙ্গ ও ঋজু (অর্থাৎ সরলরেখার মত সোজা) শাখাগুলি সমকোণে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে—সূচ্যগ্র পাতাগুলি হরিৎ বর্ণ—কোনটা ঘন গাঢ় সবুজ আর কেউবা কিছুটা ফিকে। তুষারের অজস্র দান থেকে গাছগুলি নিষ্কৃতি পায় নি, গাছের কোণে তুষারের স্তূপ সাদা কালোয় রূপ রেখা সৃষ্টি করেছে—পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরো? চারিদিকে ভয়ঙ্কর নীরবতার অখণ্ড রাজত্ব বিদ্যমান। কোনদিক থেকেই শোনা যায় না ঝিঁ ঝিঁর ঝঙ্কার, পাখীর কলরব বা পশুর শব্দ।

আসুন, পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরস্থিত পাইন গাছের ওপরে উঠে চারিদিকটা দেখি। হয়তো ওখানে গেলে বরফ, জমি ও পাইন ছাড়া আরও কিছু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। বড় বড় বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে যে এখানকার সব গাছই কি এই রকম? কেন, এই জমিতে ছোট ছোট চারা গাছ বা ঘাস জন্মায় না? কিন্তু, সে সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত দিতে পারি না। আমরা শীতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করেছি। এই বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলি কতখানি বরফের স্তূপে ঢাকা পড়েছে—তা বলা শক্ত, আমাদের কাছে মাপবার কোন জিনিস নেই। হতে পারে—এই বরফের স্তূপ আট হাত অথবা তার চেয়েও বেশী। বরফ এ বছর বেশী পড়েছে—অভিযোগ সকলেরই।

পাইনের ওপরে এসে কি দেখা যাচ্ছে ? দেখছি সেই বরফ, সেই বনরাজি আর সেই উঁচু নীচু পার্বত্য-ভূমি। হাঁ, পাহাড়ের অপর পারে এক জায়গায় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। প্রাণী-শব্দশূন্য বনভূমির মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। চলুন, ওখানে গিয়ে নিজেদের কৌতূহল মিটিয়ে আসি।

ধোঁয়া অনেক দূর। স্বচ্ছ মেঘশূন্য আকাশের পটভূমিতে কত কাছেই না মনে হচ্ছিল। যাই হোক, হাঁটতে হাঁটতে আমরা তার কাছে পৌঁছে গেছি, গন্ধ পাচ্ছি আগুনে পোড়া চর্বি ও মাংসের। আর, শব্দও শোনা যাচ্ছে—শোনা যাচ্ছে ছোট শিশুদের কলরব। আমাদের খুব সাবধানে শ্বাস বন্ধ কোরে পা টিপে টিপে যেতে হবে। না হলে জানতে পারবে। জানতে পারলে—কে জানে—ওরা কিম্বা ওদের কুকুরগুলো কি রকম অভ্যর্থনা করবে !

হাঁ, সত্যি সত্যিই ছোট ছোট শিশুরা রয়েছে—আট থেকে এক বছরের মধ্যে এদের বয়স। একটি ঘরের মধ্যেই জনা ছয়েক ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। আর ঠিক্ ঘর বলা চলে না—স্বাভাবিক পর্বত গুহা মাত্র। এই গুহাগৃহের পাশে ও পেছনে কতদূর পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তৃত জানি না—আর জানার চেষ্টা করাও উচিত নয়! পূর্ণবয়স্করা? একটি বৃদ্ধাকে দেখা যাচ্ছে—তার জটাধরা ধোঁযাটে শনের মতো সাদা চুলগুলি এলোমেলো ভাবে মুখে এসে পড়ছে, বুড়ি হাত দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ থেকে সেগুলি সরিয়ে দিচ্ছে। ভুরুর চুলগুলিও পেকে সাদা রং ধরেছে। সাদা মুখের চামড়া কুঁচ্‌কে জায়গায় জায়গায় ঝুলে পড়েছে, গুহার ভেতরে আগুনের তাপ ও ধোঁযা দুই আছে—বিশেষ করে যেখানে আছে শিশুগুলি ও তাদের দিদিমা। মাতামহীর দেহে কোন অবরণ নেই, নেই কোন কাপড়-চোপড়ের বালাই। শীর্ণ কঙ্কালসার হাতদুটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে, চোখ কোটরগত—ফিকে নীল চোখের তারা দুটি জ্যোতিহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝকমক করে ওঠে, এতে মনে হয় সেগুলি এখনো একেবারে জ্যোতিহীন হয়নি! কান দুটি তো খুবই সজাগ। মনে হচ্ছে দিদিমা যেন শিশুদের কথা মন দিয়ে শুনছে। এইমাত্র একটি শিশু চীৎকার করে উঠল, দিদিমা সেদিকে তাকাল। এক বছর ও দেড় বছরের দুটি শিশু, মাথায় দুজনেই সমান। দুজনেরই চুল পিঙ্গল বর্ণ। এদের চুলের রং বৃদ্ধার চেয়ে আরো সুন্দর ও উজ্জ্বল। এদের নধরকান্তি দেহ, দুধে আলতার রং, বড় বড় চোখ, ঘন নীল তারা। ছেলেটি চীৎকার করে কাঁদছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে চুষিকাঠির মত একটি ছোট হাড় চুষছে। দিদিমা কম্পিত স্বরে ডাকল—

"অগিন! আয়। এখানে আয় অগিন! এই যে তোর দিদা এখানে।"

অগিন উঠল না! একটি বছর আটেকের ছেলে এসে অগিনকে কোলে করে মাতামহীর কাছে নিয়ে গেল। এই ছেলেটিরও কেশ শিশুদের মত উজ্জ্বল স্বর্ণাভ শুভ্র, তবে কিছু বেশী লম্বা এবং জট পাকানো। দেহের বর্ণ গৌর, তবে শিশুদের মতো পরিপুষ্ট নয়। গায়ের এখানে ওখানে ময়লা জমে আছে। ছেলেটি ছোট শিশুটিকে এনে মাতামহীর কাছে দাঁড় করিয়ে বলল—

"দাদী ! রোচনা হাড় কেড়ে নিয়েছে, অগিন কাঁদছে।"

ছেলেটি এই বলে চলে গেল। মাতামহী তার শীর্ণ হাতে শিশুটিকে তুলে নিল। অগিন তখনও কাঁদছিল। তার চোখের জলের ধারায় গালের ময়লা কেটে গিয়েছে, সেখানে উঁকি মারছে গৌরবর্ণের ওপরে সোনালী রেখা। মাতামহী অগিনের মুখে একটি চুমু খেয়ে বলল,—

"অগিন ! কেঁদো না, আমি রোচনাকে মারছি।"

এই বলে দাদী খালি হাতটা চর্বিমাখা মাটির ওপর আঘাত করল! অগিনের কান্না তখনও থামেনি, চোখের জলও ফুরায়নি। মাতামহী তার ময়লা হাত দিয়ে অগিনের মুখ মুছিয়ে দিলে—তার হাতের ময়লাতে শিশুর গালের সোনালী রেখাগুলি আবার কালো হয়ে গেল। অগিনকে শান্ত করার জন্য মাতামহী তার নিজের শুকনো স্তনটি হাতে তুলে দিল। অগিনের কান্না বন্ধ হোল, মাতামহীর স্তন চুষতে লাগল। এই সময় বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। শিশুটি শুকনো মাই ছেড়ে সেই দিকে তাকাল। কার যেন মিষ্টি গলার স্বর শোনা গেল—

"অ-গি-ই-ই-ন !"

অগিন আবার কেঁদে উঠল। দুটি স্ত্রীলোক একটি কোণের দিকে তাদের মাথা থেকে কাঠের বোঝা ফেলে দিল। তারপর একজন রোচনার কাছে অপরজন অগিনের কাছে ছুটে গেল। ক্রন্দনরত অগিন আরো জোরে "মা" "মা" বলে চেঁচিয়ে উঠল। মা তার ডান হাতকে খালি রেখে ডানদিকের স্তনের ওপর থেকে লোমযুক্ত বলদের চামড়ার আবরণটি খুলে ফেলল। শীতের দিন খাওয়া দাওয়া ভাল নেই বলে তরুণীর দেহ যথেষ্ট মাংসল নয়, কিন্তু তা সৌন্দর্যে অসাধারণ। ময়লাহীন আরক্তিম গালের উজ্জ্বল আভা, জটা-বিহীন সোনালী চুল, তন্বী দেহ, পরিপুষ্ট বুকের ওপর গোল গোল শ্যামল-মুখ স্তন, কৃশ কটি, আকর্ষণীয় নিতম্ব, পরিপুষ্ট পেশল জানু, পরিশ্রমে গড়ে ওঠা পায়ের ডিম—সেই অষ্টাদশী তরুণী অগিনকে দু'হাতে তুলে তার মুখ চোখ গাল অজস্র চুমুতে ভরে দিল। অগিনের রোদন বন্ধ হোল। তার দুটি রক্তাভ ঠোঁটের আড়ালে কচি দাঁতগুলি চিক চিক করছে, চোখ দুটি আধ বোজা, গালে পড়েছে টোল। একটি ষাঁড়ের চামড়ার ওপর বসে তরুণী তার কোমল স্তনটি তুলে দিল অগিনের মুখে। এই সময় অপর তরুণীটিও রোচনাকে নিয়ে তার কাছে উপবেশন করল, দেখলেই বোঝা যায় ওরা দুজন সহোদরা।

২

গুহার মধ্যে এদের নিভৃত গল্প-গুঞ্জনে রত রেখে আমরা বাইরে এসে কি দেখলাম? বরফের ওপর চামড়ার আবরণে আচ্ছাদিত অনেকগুলি পায়ের চিহ্ন দেখা গেল। আসুন! আমরা ওদের এই পদচিহ্ন দ্রুত অনুসরণ করি। পায়ের সারি গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের

ওপাশের জঙ্গলে। আমরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু চলমান পায়ের রেখা বহন করে নিয়ে চলেছে টাটকা পায়ের ছাপ! আর—আমরা চলেছি শুভ্র তুষার ক্ষেত্র অতিক্রম করে—আর কখন-ও বা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এসে পড়ছি অন্য কোন হিম ক্ষেত্রে—সর্বশেষে আমাদের নজরে পড়ল একটি বৃক্ষ লতা হীন পাহাড়ের 'পরে। এখানে নীচে থেকে ওঠা শুভ্র হিমরাশি গিয়ে মিশেছে নীল নভোমণ্ডলে—আর এই নীলাকাশের পটভূমিতে মানব মূর্তি দেখা যাচ্ছে, এই মানুষের সারি গিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে পাহাড়ের প্রান্তে। মূর্তিগুলির পেছনে যদি নীলাকাশ না থাকত তো আমরা কিছুতেই মানুষগুলিকে দেখতে পেতাম না। ওদের শরীরে হিমের মতই সাদা বৃষচর্ম ছিল; তার হাতের অস্ত্রগুলিও যেন ধবধবে সাদা। এই পরিব্যাপ্ত শ্বেত তুষারের ক্ষেত্রে আন্দোলিত মূর্তিগুলিকে কি করে চিনে উঠা যায়!

আরো কাছে গিয়ে দেখা যাক। সবার আগে রয়েছে একজন স্ত্রীলোক, বলিষ্ঠ তার দেহ—বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যে। তার নগ্ন দক্ষিণ বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে খুব বলবতী। মাথার চুল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আমাদের গুহায় দেখা পূর্বোক্ত তরুণীদ্বয়ের মতই—তবে আকারে বড়। হাতে একটি নখযুক্ত ছুঁচালো তিন হাত লম্বা ভূর্জ গাছের মোটা কাঠ। ডান হাতে কাঠের হাতলে দড়ি দিয়ে বাঁধা পাথরের কুঠার, শিকারের জন্য ঘষে ঘষে শান দেওয়া হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে চারজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক। একটি পুরুষের বয়স মেয়েটির চেয়ে কিছু বেশী, আর বাকী সকলেই চৌদ্দ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। বয়স্ক পুরুষটির মাথার চুল লম্বা এবং বড় আর সকলের মতো স্বর্ণাভ-শুভ্র, সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা। পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মতো বলিষ্ঠ শরীরের গঠন এবং তারও হাতে স্ত্রীলোকটির মতই দুটি অস্ত্র আছে। বাকী তিনজন পুরুষের মধ্যে দুজনের মুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা, কিন্তু বয়স কম। স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে একজনের বয়স বাইশ অপর জন ষোড়শী হয়তো বা আরো কম। আমরা আগের গুহায় মাতামহীকে দেখেছি। এদের সকলকে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা সকলেই একই ছাঁচে গড়া।

এই নরনারীদের হাতে কাঠ, হাড় ও পাথরের অস্ত্রাদি এবং তাদের অভিযান দেখে মনে হয়, তারা যেন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে।

পাহাড় থেকে নামার পথে প্রথম স্ত্রীলোকটিকে মা বলা যেতে পারে, সে ঘুরল বাঁ দিকে—আর সকলে তাকে নীরবে অনুসরণ করল। বরফের ওপর দিয়ে চলবার সময় তাদের চামড়ায় ঢাকা পায়ের কোন শব্দ হচ্ছিল না। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া একটি পাহাড় রয়েছে—তার চারপাশে কতকগুলি টিলা। শিকারীরা এবার তাদের গতি একেবারে কমিয়ে দিল। তারা সতর্কতার সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তারপর অতি ধীরে, সন্তর্পণে দূরে দূরে পায়ের পাতা ফেলে টিলার দিকে এগুতে লাগল। মা সকলের আগে গুহা মুখে গিয়ে পৌঁছল। গুহার বাইরের সাদা বরফের দিকে ভাল করে তাকাল—সেখানে কোন কিছুর পায়ের চিহ্ন পড়েছে কি না? দেখল কোন চিহ্ন নেই। সে একলাই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল—কয়েক পা এগুলে দেখা গেল গুহাটি ঘুরে গেছে, আলো খুবই

কম। কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারকে চোখ-সওয়া করে নিল, তারপর এগুলো। সেখানে দেখতে পেল তিনটি ধূসর রং এর ভাল্লুক—বাবা, মা ও তার বাচ্চা নীচের দিকে মুখ করে নিশ্চল ভাবে পড়ে আছে—মরে গেছে কিনা অনুমান করা যায় না। জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মা পা টিপে-টিপে ফিরে গেল। মায়ের উৎফুল্ল মুখ দেখে পরিবারের আর সকলেই ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝে নিল। বুড়ো অঙ্গুল দিয়ে কড়ে আঙ্গুল চেপে মা তিনটি আঙ্গুল তুলে দেখালে। তারপর মা আবার গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। অস্ত্রাদি বাগিয়ে তার পিছনে চলল দুজন পুরুষ। বাকি সবাই দমবন্ধ করে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। গুহার মধ্যে গিয়ে মা দাঁড়াল মরদ ভাল্লুকটির কাছে, আর দুজন পুরুষের মধ্যে একজন মাদী ভাল্লুকটির কাছে—অপরজন বাচ্চাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনজনে একই সঙ্গে ভাল্লুকের উদরে সুতীক্ষ্ণ কাঠের বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জখম করল। জন্তুগুলো আর নড়াচড়া করবার অবসর পেল না, তাদের শীতকালের ছমাস নিদ্রাভঙ্গের তখনও একমাস বাকি। কিন্তু শিকারীদের পক্ষে তখন তা জানার উপায় ছিল না! তাদের তাই সতর্ক হয়েই কাজ করতে হয়। ডাণ্ডাটির তীক্ষ্ণ ফলাটি আরো তিন চার বার সজোরে আঘাত করে ভাল্লুকগুলিকে উল্টে দিল। তারপর নির্ভয়ে ভাল্লুক তিনটির পা ও মুখ ধরে বাইরে টেনে আনল। সকলেই খুসী হয়েছে, এতক্ষণে তাদের প্রাণ-খোলা হাসি ও গলা-ছেড়ে চীৎকার শোনা গেল।

বড় ভাল্লুকটিকে চিৎ করে ফেলে মা চকমকি পাথরের ছুরিটা চামড়ার পোষাক থেকে বার করে পুনরায় ভাল্লুকটির প্রথম আঘাত স্থানের ক্ষত থেকে সুরু করে পেটের চামড়াটা চিরে ফেলল। পাথরের ছুরি দিয়ে এত পরিষ্কার ভাবে চামড়া চেরা খুবই অভ্যস্ত ও মজবুত হাতের কাজ। তারপর মা নরম হৃৎপিণ্ড থেকে এক খণ্ড মেটে কেটে নিজের মুখের মধ্যে পুরল এবং আর একখণ্ড নিয়ে সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটির মুখে দিল। সবাই ভাল্লুকটির চারদিকে ঘিরে বসল আর মা তাদের সবাইকেই কলিজার মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে ভাগ করে দিতে লাগল। একটি ভাল্লুকের মেটে খাওয়া শেষ করে অন্যটির কলিজা কাটবার জন্য মা যখন উদ্যোগ করছিল তখন দলের ষোল বছরের মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে এসে একখণ্ড বরফ মুখে পুরে দিল। এই সময় দলের প্রবীণ পুরুষটিও বেরিয়ে এসে বরফের টুকরো তুলে মুখে দিল এবং ষোড়শী মেয়েটির হাত চেপে ধরল। মেয়েটি প্রথমটা একটু ইতস্তত করে শান্ত হল। পুরুষটি তাকে বাহুবেষ্টিত করে এক পাশে চলে গেল। এরা দুজনে যখন হাত ভর্ত্তি বরফকণা নিয়ে কাটা ভাল্লুকের কাছে ফিরে এল তখন তাদের চোখ মুখের রং উজ্জ্বল, গাল রক্তিমাভ দেখাচ্ছিল।

পুরুষটি বলল ; "এবার দাও আমি কাটি, তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।"

মা তার হাতে ছুরিটি তুলে দিল। তারপর একটু নত হয়ে পাশে উপবিষ্ট চব্বিশ বছরের যুবকটির মুখে চুমু খেয়ে তার হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

এরা সকলে মিলে তিনটি ভাল্লুকের মেটে খেয়ে ফেলল। চারমাসের অনাহারী

নিদ্রিত ভাল্লুকগুলোর চর্বি বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বাচ্চা ভাল্লুকটির মাংসই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল নরম ও উপাদেয়—তাই তার অনেকখানি মাংসই এরা খেয়ে ফেলল। তারপর সবাই পাশাপাশি শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল।

এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা; মর্দা ও মাদী ভাল্লুক দুটির চার পা চামড়ার দড়িতে বেঁধে লাঠিতে ঝুলিয়ে দুজন দুজন করে কাঁধে নিল, বাচ্চাটিকে কাঁধে নিল ষোড়শী তরুণী, পাথরের কুড়ুল হাতে নিয়ে মা আগে আগে চলল।

এই সব বন্য মানুষগুলির সময়ের হিসাব ছিল না, ঘড়ির কাঁটার কোন জ্ঞান না থাকলেও এ ধারণা তাদের ছিল যে আজকের রাত চাঁদনী রাত হবে। তারা কিছুদূর যাবার পর সূর্য দিগন্তে অস্তমিত হল বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু তখনো সূর্যাস্ত হয়নি—আরো কয়েক ঘণ্টা গোধূলির আলো রইল—সূর্যকিরণের শেষ গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতে না যেতে বিশ্ব চরাচর শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ভরে গেল।

তাদের গুহাশ্রয় তখনো অনেক দূরে। পথ চলতে চলতে মা হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে থমকে দাঁড়াল, কান পেতে শুনতে লাগল। ষোল বছরের মেয়েটি ছাব্বিশ বছরের ছেলেটির কাছে গিয়ে বলল।

"গুর্র্, গুর্র্, বৃক্, বৃক্" (অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ)।

মা মেয়েটির কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "বহুত বৃক্, বহুত বৃক্" (অনেক নেকড়ে)।

তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে মা অবার বলল,—"প্রস্তুত হও"

শিকার মাটিতে রেখে সকলে নিজ নিজ হাতিয়ার শক্ত করে ধরল এবং প্রতি দুজনে পিঠে পিঠ দিয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়াল। নিমেষের মধ্যে সাত আটটি নেকড়ে বাঘের একটি দল লক্‌লকে জিভ বার করে তাদের দিকে এগিয়ে এলো, তারা কাছে এসে গজরাতে গজরাতে চারিদিক বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল—মানুষের হাতে কাঠের বর্শা ও পাথরের কুঠার দেখে নেকড়েগুলো তাদের আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে লাগল। ইতিমধ্যে সর্বকনিষ্ঠ যে ছেলেটি চক্রের মাঝখানে ছিল সে তার লাঠির সাথে বাঁধা কাঠের ফলক খুলে নিল, তারপর নিজের কোমরে বাঁধা শক্ত চামড়ার দড়ি খুলে ছিলের মতো কাঠে বেঁধে ধনুক তৈরি করে ফেলল। কে জানে কোথায় নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল ছুঁচলো পাষাণ ফলকের তীর, তা সে বার করে তীর ও ধনুক দিল চব্বিশ বছরের যুবকটির হাতে; আর যুবকটিকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল চক্রের মধ্যস্থলে নিজের জায়গায় নিজে গিয়ে দাঁড়াল তার জায়গায়। চব্বিশ বছরের যুবকটি তখন ধনুকের গুণকে আরো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে গুণ টেনে এক টঙ্কার দিল, তারপর তীর ছুঁড়ে একটি নেকড়ের পেটে বিদ্ধ করল। নেকড়েটি গড়িয়ে পড়ে গেল, কিন্তু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার যখন মরিয়া হয়ে আক্রমণের উদ্যোগ করছিল—সেই সময়েই যুবকটির দ্বিতীয় তীর গিয়ে পড়ল—আঘাতটা হল মারাত্মক। নেকড়েটাকে নিশ্চল পড়ে থাকতে দেখে অন্য বাঘগুলি তার কাছে এগিয়ে এল, তার দেহ থেকে ঝরে পড়া গরম তাজা রক্ত

পান করতে লাগল; আর পরক্ষণেই মৃতের দেহ খণ্ড খণ্ড করে তার মাংস খেতে সুরু করল।

জানোয়ারগুলিকে ভোজন উৎসবে ব্যস্ত দেখে মানুষের দলটি নিজেদের শিকার তুলে নিয়ে সতর্কতার সাথে দ্রুত পায়ে এগুতে লাগল। এবার মা চলেছে সবার পিছনে, আর বার বার পিছনে ফিরে চারিদিকে নজর রাখছিল। আজ তুষারপাত হয়নি, তাই চাঁদনী রাতের আলোতে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণের কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। তাদের গিরি গুহা থেকে যখন তারা আধ মাইল পথ দূরে রয়েছে, তখনই নেকড়ের পাল আবার তাদের ঘিরে ধরল। তারা শিকারগুলো মাটিতে রেখে হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়াল। ধনুকধারী কয়েকটি তীর ছুড়লো, এবার কিন্তু একটিও বিদ্ধ করা সম্ভব হল না। কারণ, নেকড়েগুলি এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রতি মুহূর্তে স্থানবদল করে বেড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষবার পর চারটে নেকড়ে এক সঙ্গে ষোল বছরের মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা তার পাশেই ছিল। সে একটি নেকড়ের পেটে তার বর্শা ঢুকিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু, অন্য তিনটে নেকড়ে মেয়েটির ঊরুতে নখ দিয়ে মাটিতে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে পেট চিরে নাড়ি ভুঁড়ি বার করে ফেলল। সকলের নজর যখন এই ষোল বছরের মেয়েটিকে বাঁচাবার দিকে ছিল—সেই সময়েই অন্য তিনটে নেকড়ে চব্বিশ বছরের যুবকটির অরক্ষিত পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর আত্মরক্ষার সামান্য সুযোগটুকুও না দিয়ে পেট চিরে ফেলল। যখন অন্য সকলে আবার যুবকটিকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত, সেই অবসরে নেকড়েগুলো ষোল বছরের মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত দেহ প্রায় হাত পঁচিশেক দূরে নিয়ে গেল। মা চেয়ে দেখল মৃতপ্রায় নেকড়ে বাঘটির পাশে চব্বিশ বছরের যুবকটিও শেষ নিশ্বাস ফেলেছে। মুমূর্ষু নেকড়েটির মুখে ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, একজন সামনের পা চেপে ধরেছে আর সকলে তার ক্ষত স্থানে মুখ লাগিয়ে লোনা রক্ত পান করছে। নেকড়ের কণ্ঠনালি কেটে দিয়ে মা তাদের কাজ আরো সহজ করে দিল। ব্যাপারগুলি ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তারা জানত যে মেয়েটিকে খাওয়া শেষ করে নেকড়েগুলি আবার তাদের ওপর আক্রমণ করবে। তাই তারা মৃতপ্রায় যুবকটিকে সেখানে ফেলে রেখে তাদের তিনটি ভাল্লুক ও মৃত নেকড়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল এবং নিরাপদে গুহায় পৌছল।

গুহার মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তারই লাল আভায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিল শিশুরা আর তরুণীদ্বয়। শিকারীদের ফিরে আসার শব্দ পেয়ে বৃদ্ধা ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল—

"নিশা-আ-আ এলি ?"

"হাঁ" বলে মা প্রথমে এককোণে তার অস্ত্র-শস্ত্র রেখে চামড়ার পোষাকটি খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন দিগম্বরী হল, অন্যেরাও শিকারগুলো মাটিতে রেখে তার মত চামড়ার পোষাক ছেড়ে নগ্ন দেহের প্রতি রোমে আগুনের আরামদায়ক উত্তাপ উপভোগ করতে লাগল।

এখন গোটা ঘুমন্ত পরিবারটি জেগে উঠল। সামান্য শব্দে জেগে ওঠার অভ্যাস

ছেলেবেলা থেকেই এদের মজ্জাগত। খাদ্য রসদ যা পাওয়া যেত তা খুব হিসাবের সঙ্গে খরচ করেই মা তার এই গোষ্ঠীকে এ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। হরিণ, খরগোস, বনগরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি শিকার করার সুযোগ শীত আরম্ভ হওয়ার আগেই পাওয়া যায়—কারণ শীতের দিনে এই সব প্রাণী দক্ষিণে গরম প্রদেশে চলে যায়। মায়ের পরিবারেরও আরো কিছুটা দক্ষিণে যাওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু ঐ সময়টাতেই ষোড়শী তরুণীটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই যুগের মানব সমাজের নিয়ম অনুসারে পরিবারের মা (অর্থাৎ গোষ্ঠীর কর্ত্রী) একজনের জন্য পরিবারের সকলের জীবন বিপন্ন করতে পারত না—তা বিধেয় ছিল না। কিন্তু মায়ের আন্তরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেল এই মেয়েটির অসুখের সময় এবং তার ফলে আজ তাকে একজনের বদলে পরিবারের দুজনকে হারাতে হল। শিকারযোগ্য প্রাণীদের এই অঞ্চলে ফিরে আসবার এখনো দু মাস বাকি। এর মধ্যে না জানি আবার কত-জনকে হারাতে হয়। তিনটি ভাল্লুক এবং একটি নেকড়ের মাংসে বাকি শীতকালের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ছোট ছেলেমেয়েগুলি খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে—বেচারিরা খালি পেটেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা আগে নেকড়ের মেটে কেটে ছোটদের মধ্যে ভাগ করে দিতে লাগল, ছেলেরা গোগ্রাসে চেটেপুটে খাচ্ছিল। এই অবসরে মা খুব সতর্কতার সঙ্গে নেকড়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলল—কারণ লোমশ চামড়া খুবই দরকারী। মাংস কাটার সময় যাদের ক্ষুধা খুব বেশী পেয়েছিল তারা খানিকটা কাঁচা খেয়ে নিল—তারপর আগুনের অঙ্গারে ঝলসে নিয়ে খেতে লাগল। প্রত্যেকেই তাদের পোড়া মাংস থেকে এক কামড় খাবার জন্য মাকে অনুরোধ করতে লাগল। মা বলল, "ব্যস্, আজ তোমরা সকলে পেট ভরে খাও, কাল থেকে কিন্তু এতটা পাবে না।"

মা উঠে গুহার একটি কোণ থেকে চামড়ার থলি হাতে নিয়ে এল, বলল—"এইটুকু মধু সুরা আছে, আজ সুরা পান, নৃত্য ও ফুর্তি কর।"

ছোটদেরও এক-আধ ঢোক দেওয়া হল, বড়রা পেল বেশী বেশী। ক্রমেই মদোন্মত্ত উল্লাস দেখা দিল, চোখ হল লাল—আর হাসির উঠল ফোয়ারা। এদের মধ্যে কেউ একজন গান ধরল, প্রবীণ লোকটি একটি কাঠির ওপর কাঠি দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল—আর সকলে মিলে নাচ জুড়ে দিল। আজ হল অবারিত আনন্দের রাত। পরিবার ছিল মাতৃশাসনে—কিন্তু সে রাজ্যে অন্যায় বা অসাম্য ছিল না। বুড়ী মাতামহী ও প্রবীণ পুরুষটি ছাড়া বাকি সকলে মায়ের সন্তান-সন্ততি। মা এবং প্রবীণ পুরুষটি আবার বৃদ্ধা মাতামহীর সন্তান—কাজেই এদের মধ্যে "এটা আমার", "ওটা তোমার" এই প্রশ্ন ওঠেনি—বস্তুত সে যুগে তখনো মানুষের মনে সম্পত্তিবোধ সৃষ্টি হয়নি। তবে একথা ঠিক যে মায়ের অধিকার ছিল সমস্ত পুরুষের ওপর আর সে অধিকার সর্বাগ্রে। চব্বিশ বছরের যে যুবকটি নেকড়ের আক্রমণে মারা গেল সে ছিল মায়ের পুত্র এবং পতিও বটে। তার মৃত্যুতে মায়ের মনে কোন কষ্ট হয়নি তা নয়, তবে সে সময় মানুষ অতীতের চেয়ে বর্তমানের কথা ভাবতে বাধ্য হত বেশী। মায়ের এখন দুজন স্বামী বর্তমান—তার অপর

সন্তানের বয়স চৌদ্দ মাত্র, তবে সে অল্পকালেই স্বামী হবার উপযুক্ত হবে। মায়ের রাজত্বকালের মধ্যেই এখন যারা শিশু আছে তাদের কজন স্বামী হবে তা কেউ বলতে পারে না। মা চব্বিশ বছরের যুবকটিকে ভালবাসত বেশী—তাই তিন জন তরুণীর ভাগে পঞ্চাশ বছরের পুরুষটি ছিল।

শীত শেষ হবার আগেই বৃদ্ধা মাতা মহী একদিন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হল। শিশুদের তিনটিকে নেকড়ে বাঘে নিয়ে গেছে আর প্রবীণ লোকটি একদিন বরফ গলার সময় তুষার স্রোতে ভেসে গেল। এইভাবে ষোল জনের পরিবারের মাত্র ন'জন বেঁচে রইল।

৩

এখন বসন্তকাল। দীর্ঘদিনের হিম-মৃত্যুতে ঢাকা প্রকৃতি আবার নবজীবনে মঞ্জুরিত হয়ে উঠছে। গত ছ'মাস ধরে যে ভূর্জ গাছ ছিল পল্লবহীন—তাতে নূতন পাতার জন্ম হচ্ছে। বরফ গলে যাওয়ার পর পৃথিবী আবার হয়ে উঠছে শ্যামল, বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে বনস্পতি ও ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ছড়াচ্ছে অপূর্ব মাদকতা। দিগন্তব্যাপী সারা পৃথিবী নূতন জীবন্ত হয়ে উঠছে। কোথাও গাছে গাছে শোনা যেতে লাগল পাখীদের সুরের কাকলী—কোথাও বা ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক। গলে যাওয়া বরফের স্রোতের ধারে বসে কোথাও বা নানাজাতীয় জলচর পাখী ছোটখাট পোকা-মাকড় খুঁটে খাচ্ছে—আর কোথাও বা রাজহংসগুলিকে প্রণয় ক্রীড়া-রত দেখা যাচ্ছে। এখন এই শ্যামল পার্বত্য বনের মধ্যে দেখা যাবে দলে দলে হরিণগুলোকে ছুটে বেড়াতে। কোথাও ভেড়া, কোথাও ছাগল, রুরুমৃগ বা গরু চরে বেড়াচ্ছে দেখা যাবে—আর এদের শিকারের জন্যে কোথাও বা ওৎ পেতে বসে আছে নেকড়ে আর চিতাবাঘ।

শীতের সময় নদী হয়ে যায় অবরুদ্ধ জমাট বরফ, শীতের অবসানে আবার বিগলিত ধারায় প্রবাহিত হয়। অবরুদ্ধ নদীর মতই যে মানুষের দল আটক পড়েছিল তারাও দিকে দিকে প্রবাহিত হতে লাগল। আপন আপন অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, চামড়া ও ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝা ঘাড়ে করে গৃহ-অগ্নি নিয়ে মানুষের দল আরও উন্মুক্ত অঞ্চলে অগ্রসর হতে থাকল। যতই দিন যেতে লাগল—পশু ও বনস্পতির মতই মানুষের শুকনো কুঞ্চিত চামড়ার নীচে আবার মেদ-মাংস জমতে লাগল, কখনও কখনও তাদের পোষা রোমশ কুকুরগুলো হরিণ বা ছাগল ধরে আনত—আর কখনও বা তারা নিজেরাই ফাঁদ পেতে তীর বা কাঠের বর্শা নিয়ে কোন কোন জানোয়ার শিকার করত। নদীতে মাছও ছিল প্রচুর, ভোল্‌গার তীরবর্তী অধিবাসীদের জাল কখনো খালি উঠত না।

এই সময়টা রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ত, তবে দিনের বেলা থাকত গরম—বর্তমানে আরও কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে মিলে ভোল্‌গার তীরে নিশা পরিবার বসবাস করছিল। নিশার পরিবারের মত অন্যান্য পরিবারগুলিও মায়ের শাসনে ছিল। পিতৃশাসিত নয়, পরিবারগুলি মাতৃশাসিত। তার কারণও ছিল—তখন কে কার পিতা তা বলা আদৌ সম্ভব ছিল না। নিশার বয়স বর্তমানে পঞ্চান্ন—তার আটটি মেয়ে ও ছ'টি ছেলের মধ্যে চার মেয়ে এবং তিনটি ছেলে বেঁচে আছে। তারা যে নিশার সন্তান তাতে কোন সন্দেহ নেই—কারণ প্রসবের সাক্ষী স্বয়ং মজুদ, কিন্তু কে যে পিতা তা বলা যায় না। নিশার আগে তার মা অর্থাৎ বৃদ্ধা মাতামহীর যখন শাসন ছিল, তখন তার পরিণত বয়সে অনেকগুলি স্বামী ছিল—এই স্বামীদের মধ্যে কেউ বা ভাই-স্বামী কেউ বা পুত্র-স্বামী। তারা আবার বহুবার নিশার সাথে নাচ গানের সময় প্রেমপ্রার্থী হয়েছে। তা পর নিশা যখন নিজে কর্ত্রী হল তখন তার নিরন্তর পরিবর্তনশীল কামনাকে প্রত্যাখ্যান করবার সাহস তার ভাই বা পুত্রদের ছিল না। এই জন্যেই নিশার জীবিত সাত সন্তানের কে কার পিতা বলা অসম্ভব। নিশার পরিবারে এখন সে নিজেই সবচেয়ে বড়—বয়স ও প্রতিপত্তি দুই দিক দিয়েই। অবশ্য এই কর্তৃত্ব আর বেশী দিন থাকবে না—দু এক বছরের মধ্যে সে নিজেও বুড়ী দিদিমাতে পরিণত হবে। আর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠা শক্তিশালিনী কন্যা হচ্ছে লেখা—সে-ই তার স্থান দখল করবে। অবশ্য এই অবস্থাতে লেখার সঙ্গে তার বোনদের ঝগড়া অনিবার্যভাবেই বাধবে। প্রত্যেক বছরই কিছু লোক নেকড়ে বা চিতাবাঘের মুখে, ভাল্লুকের থাবায়, বুনো ষাঁড়ের সিংএ, ভোল্‌গার স্রোতে যেখানে প্রাণ হারাচ্ছে—সেই ক্ষয়িষ্ণু পরিবারকে রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে প্রতি পরিবারের রাণী মায়ের। অবশ্য লেখার বোনদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র পরিবার গড়ে তুলবে। এই রকম পরিবারের শাখা বেরিয়ে যাওয়া তখনি বন্ধ হবে যখন পুরুষ হবে দলের কর্তা—অনেক পুরুষের একজন স্ত্রীর বদলে একজন পুরুষ অনেক স্ত্রীর স্বামী হবে।

পরিবারের কর্ত্রী নিশা লক্ষ্য করেছে তার মেয়েদের মধ্যে লেখাই সবচেয়ে শিকারে পটু। পাহাড়ে চড়তে পারে হরিণের মত দ্রুত গতিতে। একদিন সকলের নজরে পড়ল উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে একটি মৌচাকের ওপর। এত উঁচু যে মধুভুক্ ভাল্লুকও সেখানে পৌছতে পারেনি। কিন্তু লেখা লাঠির পরে লাঠি বেঁধে টিকটিকির মত সেগুলো বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাত্রে মশাল জেলে হলো মাছিগুলোকে পুড়িয়ে মৌচাক ফুটো করে দিয়ে তার নীচে থলি ধরল—তাতে কম করে হলেও তিরিশ সেরের কম মধু পড়েনি। শুধু নিশা পরিবার নয়। লেখার এই দুঃসাহসিকতার প্রশংসা অন্যান্য পরিবার-গুলিও করেছিল। কিন্তু মা নিশা এতে আনন্দিত হল না। মা দেখল যে তার পুত্রেরা এখন লেখার ইঙ্গিতে নাচতে যতটা উৎসাহ পায়—ততটা আগ্রহান্বিত নয় তার কথায়। অবশ্য খোলাখুলিভাবে তাকে অবজ্ঞা করবার সাহস এখনো তাদের হয়নি।

কিছুকাল ধরেই নিশা একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিল। অনেক সময় তার ইচ্ছা হত লেখাকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেলতে, কিন্তু সে সাহস পেতনা—সে জানত লেখা তার চেয়ে শক্তিশালিনী। সে অন্যের সাহায্য চাইতে পারে—কিন্তু তাকে অন্যেরা সাহায্য করবে কেন? পরিবারে সব কয়টি পুরুষই লেখার প্রেম-প্রার্থী, কৃপার পাত্র হতে চায়, নিশার অন্য মেয়েরাও তাকে সাহায্য করবে না, কারণ তারা ভয় করত লেখাকে। তারা জানত যদি এই ধরনের কোন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের সকলকেই অসহ্য কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।

নির্জনে বসে বসে নিশা ভাবছিল। সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—লেখাকে পরাস্ত করবার উপায় সে খুঁজে পেয়েছে।

বেলা তখন একপ্রহর। নিশা ও পরিবারের অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ তাঁবুর পেছনে বসে অথবা শুয়ে, নানা দেহে রোদ পোহাচ্ছিল। নিশা বসেছিল তাঁবুর সামনে, লেখার তিন বছরের ছেলেটি খেলছে তার সামনে।

নিশার হাতে ছিল পাতার ঠোঙা ভর্তি লাল লাল ফল স্ট্র-বেরী। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ভোল্‌গা নদী, নিশার সুমুখের জমি ঢালু হতে হতে ভোল্‌গার জলে গিয়ে মিশেছে। নিশা একটা ফল মাটিতে গড়িয়ে দিল—ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে খেল। আর একটি ফল নিশা গড়িয়ে দিল—এটা কুড়িয়ে নিতে ছেলেটি আরো কিছু দূর এগিয়ে গেল। আরও একটা ফল গড়িয়ে দিল—আরো দূরে গেল ছেলেটি। এইভাবে দ্রুত তালে একটার পর একটা ফল নিশা গড়িয়ে দিতে লাগল—ক্রমেই ছেলেটি তা কুড়িয়ে নিতে আরো দ্রুত আরো দূরে যেতে লাগল—এমনি করে এক সময় হঠাৎ পা পিছলে ভোল্‌গার খরস্রোতে ছেলেটি পড়ে গেল।

সেই দিকে চেয়ে নিশা চীৎকার করে উঠল। লেখা কিছু দূরে বসে দেখছিল। সে ছুটে এসে নদীর খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটি তখনো একবার ভাসছে একবার ডুবছে—লেখা তাকে ধরে ফেলল। ছেলেটি ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে—তাছাড়া ভোল্‌গার বরফ গলা ঠাণ্ডা জল বর্শার মত তার গায়ে বিঁধছিল। অনেক কষ্টে লেখা তার ছেলেকে নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে লাগল—এক হাতে তার ছেলে অন্য হাত ও পা দিয়ে সে সাঁতার কেটে এগোবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে টের পেল যে এক জোড়া বলিষ্ঠ হাত তার গলা চেপে ধরেছে। লেখার আর বুঝতে বাকি রইল না—কে সে? অনেকদিন ধরেই লেখা লক্ষ্য করছিল তার প্রতি নিশার ব্যবহারের পরিবর্তন—আজ দেখল সুযোগ বুঝে নিশা তার পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে উদ্যত। লেখা তখনো নিশাকে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে পারত—কিন্তু তার হাতে ছিল ছেলে। লেখাকে বাধা দিতে দেখে নিশা নিজের দেহের সমস্ত ভার নিয়ে লেখার মাথার ওপর নিজের বুকটাকে চেপে ধরল। এতক্ষণ পর লেখা প্রথম জলের নীচে তলিয়ে গেল—আবার ওপরে উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ছেলেটা হাত থেকে ফসকে গেল। ইতিমধ্যে নিশা তাকে বেশ সঙ্কটজনক অবস্থায় এনেছিল। কি হঠাৎ নশার গলার

নাগাল পেয়ে লেখা তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হাত দিয়ে নিশার গলা চেপে ধরল। লেখা ততক্ষণে নিজেও অজ্ঞান হয়ে গেছে আর তার দেহের গুরুভার নিশাকেও জলের নীচে টেনে নিচ্ছিল—নিশার তখন বাধা দেবার সামর্থ্য ছিল না। তবু নিশা কিছুটা চেষ্টা হয়ত করত—কিন্তু এখন সবই বিফল। দুজনে দুজনের দ্বারা পিষ্ট হয়ে ভোল্‌গার স্রোতে তলিয়ে গেল।

পরে নিশা পরিবারের কর্ত্রী-মা হল পরিবারের সবচেয়ে বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক রচনা।*

* আজ থেকে ৩৬১ পুরুষ আগেকার কথা। তখন ভারত, ইরাণ এবং যুরোপের জাতিগুলি ট্রাইব স্তরে ছিল। সেটা ছিল মানব সমাজের প্রারম্ভিককালে।

দিবা

দেশঃ মধ্য ভোল্‌গা তট
জাতিঃ হিন্দি স্লাভ ভাষাভাষী
কালঃ ৩৫০০ খৃঃ পূঃ

১

"দিবা! রোদ বড কড়া, ত্মাখ্ তোর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। আয়, এই শিলাখণ্ডের ওপর বসি।"

"বেশ তাই হোক, সুরশ্রবা-আ" এই বলে দিবা সুরশ্রবার সাথে এক বিশাল পাইন গাছের ছায়ায় এক শিলাখণ্ডের ওপর বসল।

গ্রীষ্মকাল, সময় মধ্যাহ্ন! হরিণের পেছনে এত ছোটাছুটির পর দিবার ললাটে অরুণাভ মুক্তাকাশের মত স্বেদবিন্দু ঝরবে—তাতে আর আশ্চয কি? কিন্তু, এই স্থানটি এমনই যে এখানে ক্লান্তি দূর হতে মোটেই বেশী সময় লাগে না। পাহাড়ের নীচে থেকে মাথা পর্যন্ত শ্যামল আস্তরণে আচ্ছাদিত। বিশাল পাইন গাছ আপন শাখা ও সুচালো পত্রাবলী বিস্তার করে সূর্যকিরণের গতিরোধ করছে, নীচে স্থানে স্থানে বিচিত্র বনৌষধি, লতাগুল্ম ও নানাবিধ গাছ গাছড়া পুষ্পসম্ভারে মুকুলিত হয়ে আছে। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তরুণ-যুগলের শ্রান্তি বিদূরিত হল; চারিদিকের রং বেরংএর ফুল, অপূর্ব মধুর গন্ধ তাদের মন হরণ করছিল। তরুণ যুবকটি আপন ধনুর্বাণ ও তার পাথরের কুঠার শিলাখণ্ডের ওপর রাখল, ক্ষণপরে পার্শ্বস্থিত কলকল শব্দে প্রবাহিতা স্ফটিকস্বচ্ছ জলস্রোতের পাশে এসে সাদা বেগুনী ও লাল রংএর ফুল আহরণ করতে লাগল। তরুণীও আপন অস্ত্রাদি রেখে নিজের দীর্ঘ সোনালী চুলে হাত দিয়ে অনুভব করল যে চুলের গোড়া তখনো ভিজে আছে। একবার নীচের দিকে তাকিয়ে প্রবাহিতা ভোল্‌গার প্রশান্ত রূপ দেখে নিল। পাখীর কলকুঞ্জনে আকৃষ্ট হয়ে চোখ ফেরাতে দৃষ্টি গিয়ে আবদ্ধ হোল পুষ্পচয়নরত তরুণের প্রতি। যুবকের চুলও সোনালী, তবু তরুণী তার নিজের কেশরাশির সঙ্গে তুলনা করতে চাইল না—সে জানতো তার নিজের কেশদাম অনেক সুন্দর। তরুণের মুখমণ্ডল ঘন পিঙ্গল বর্ণ দাড়িগোঁফে ঢাকা—তার উপরে নাক, কপোল ও ললাটের অরুণিমা দেখা যাচ্ছিল। তরুণীর দৃষ্টি এইবার পুরুষটির পুষ্ট রোমশ বাহুর ওপর পড়ল; তার মনে পড়ে গেল—একদিন সুরশ্রবা তার ঐ শক্ত হাত দিয়ে পাথরের কুঠারের ঘায়ে এক শূকরের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল পুরুষের ঐ হাত কতই না কর্কশ ও কঠিন, আর আজ পুষ্পচয়নরত সেই বাহুকেই মনে হচ্ছে কেমন সুন্দর! তবে একথা ঠিকই যে বাহুর শক্ত পেশী ও তার সঞ্চালনে স্ফীত মনিবন্ধের শিরা—আজও সেই শক্তিরই

পরিচয় দিচ্ছে। একবার তরুণীর মনে হল, উঠে গিয়ে ঐ বাহুযুগলকে চুম্বন করে ; হাঁ, এই মুহূর্তে তা খুব প্রিয় মনে হচ্ছিল। এইবার যুবকের উরুদ্বয়ের দিকে দিবার নজর পড়ল। প্রতি পদক্ষেপে গতির তরঙ্গ লীলায়িত হচ্ছিল। একেবারেই চর্বিহীন পেশীবহুল উরু। শক্তিমান জঙ্ঘা এবং ক্ষীণ কটি দিবার কাছে অতি মনোরম মনে হচ্ছিল। সুর অনেকবারই দিবার ভালবাসা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে—অবশ্য মুখে নয়। ভাবে ভঙ্গীতে। নাচের শ্রম কৌশল দেখিয়ে দিবাকে খুসী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার 'জনের' অন্য যুবকেরা যখন দিবার সাথে নাচের সুযোগ পেয়েছে, যখন হয়তো দিবার ঠোঁটে চুমু খাবার অনুমতি পেয়েছে—কিম্বা বহুবার হয়তো তাদের অঙ্কশায়িনী হয়েছে—সে সময় হতভাগা সুর একটি চুম্বন, একটি আলিঙ্গন—এমন কি নাচের সময় একবার হাতে হাত ধরবার সুযোগও পায়নি।

সুর অঞ্জলি ভরা ফুল নিয়ে দিবার দিকে এগিয়ে আসছিল। সুরের নগ্ন দেহ, বিশাল বক্ষ, চর্বিহীন অথচ পেশীময় কৃশ উদর কি অপূর্বই না দেখাচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে এখানে বসে আজ দিবার মনে ক্ষোভ জেগে উঠল। কেন সে এতদিন সুরের কথা ভাবেনি। অবশ্য এর জন্য দিবাকে দোষ দেওয়া যায় না—অপরাধ যদি কারুর থাকে তা সুরের। তার মুখচোরা লজ্জা এতদিন তার মুখ ফোটাতে দেয়নি। দিবার দরজায় যে ঘা দিতে পেরেছে দরজা তার জন্যেই খুলছে।

সুর কাছে এলে দিবা হাসি মুখে বলল—"কি সুন্দর ফুলগুলো, কত না সুমিষ্ট এর গন্ধ !"

উপলখণ্ডের উপর ফুলগুলো রেখে সুর বলল—

"তোমার ঐ সোনালী চুলে এই ফুলগুলো গুঁজে দিলে তবেই এর সৌন্দয পরিপূর্ণ হবে।"

"আচ্ছা সুর ! সত্যিই কি আমার জন্যে এই ফুলগুলি তুমি এনেছ ?"

"হাঁ, দিবা ! এই ফুলগুলো দেখে তোমার মুখের দিকে তাকালাম—মনে পড়ল জলপরীদের কথা !"

"জলপরী ?"

"হাঁ ! জলপরীরা খুবই ভাল। তারা খুসী হ'লে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেয়—আর যদি রুষ্ট হয় প্রাণ নিতেও ছাড়ে না।"

"আমাকে কি ধরনের জলপরী মনে হয়, সুর !"

"রুদ্রাণী নয়।"

"কিন্তু, আমি তো তোমার ওপর কখনো সোহাগ দেখাইনি।"

এই কথা বলে দিবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

ক্ষণকাল পরে সুরশ্রবা বলল—

"না দিবা ! তুমি তো আমার উপর কখনো রুষ্টা হওনি। তোমার মনে পড়ে কি আমাদের ছেলেবেলার কথা ?"

"তখনও তুমি কিন্তু এমনি লাজুক ছিলে !"

"তবে, তুমি আমার ওপর কখনো বিরূপ হও নি?"

"তখনকার দিনে আমি নিজে থেকেই তোমাকে চুমু খেতাম।"

"হাঁ, কি মিষ্টিই না লাগত তোম'র সেই মুখচুম্বন।"

"কিন্তু যখন থেকে আমার এই গোল গোল স্তন উঁচু হয়ে বড় হতে লাগল, যখন সারা 'জনে'র তরুণকুল আমাকে পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল—সেই সময় থেকেই আমি তোমার কথা ভুলে গেলাম।"—এই বলে দিবা কিছুট: ম্রিয়মান হল।

"তোমার কোন দোষ ছিল না, দিবা!"

"তবে দোষটা কার?"

"আমারই। আমাদের 'জনে'র ছেলেরা চুমু খেতে চাইলে তুমি তা দিয়েছ, তারা যখনই তোমার প্রেমালিঙ্গন কামনা করেছে তাও দিয়েছ। আমাদের মধ্যে সুন্দর সবল দেহ যে কোন যুবক মৃগয়ায় শৌয, কিম্বা নাচে কুশলতা দেখিয়েছে—তুমি তো কখনো তাদের নিরাশ করোনি।

"কিন্তু স্বর! তুমিও তো তাদেরই মত—বরঞ্চ তাদের চেয়ে কর্ম্মঠ, ক্ষিপ্রগতি, সুগঠিত তোমার দেহ—আমি তোমার কামনাকে তো নিরাশ করেছি।"

"আমি তো কখনো কামনা প্রকাশ করিনি, দিবা!"

"মুখে করনি বটে! মনে পড়ে ছেলে বেলার কথা, তখনো তুমি মুখে কিছুই প্রকাশ করতে না—কিন্তু তোমার মনের কথা বুঝতে পারতাম। তারপর দিবা স্বরকে ভুলে গেল। দিবা কখনো স্বরকে—দিন কখনো সূর্যকে ভুলে থাকতে পারে? না স্বর! দিবা আর কখনো তোমাকে ভুলে থাকবে না।"

"তা হলে ছেলেবেলার সেই দিবা-স্বর হয়ে উঠব আমরা আবার।"

"হাঁ! এবার তাহলে তোমার ঠোঁটে আমি চুমু খাই!"

ছোট শিশুর মত নগ্ন মনোরম দুটি মূর্তি পরিপূর্ণভাবে পরস্পরের অধরে অধর মিলিয়ে দিল—আর দিবা স্বরের তিসি ফুলের মত নীল চোখ দুটোর ওপর তার দৃষ্টি রেখে চুমু খেতে খেতে বলল, "তুমি আমার আপন মায়ের ছেলে—আর তোমাকেই আমি ভুলে ছিলাম।"

দিবার চোখ জলে ভরে উঠল। স্বর দিবার গাল নিজের চোখের জলের ধারায় মুছিয়ে দিয়ে বলল—

"না, তুমি তো আমায় কখনো ঠকাওনি, দিবা! তুমি যখন বড় হয়ে উঠলে, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চোখ, তোমার সারা দেহে যখন পরিবর্তন দেখা দিল—তখন আমিই তোমার থেকে দূরে সরে গেলাম।"

"মনের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই নয়, স্বর!"

"দিবা, সে কথা…।"

"না, তোমাকে বলতেই হবে। তুমি বল আর কখনো তুমি আমায় দেখে লজ্জা পাবে না?"

"না, আর কখনো তোমার কাছে আমার লজ্জা ভয় থাকবে না।···আচ্ছা, এবার আমি তোমার চুলে সেই ফুলগুলো সাজিয়ে দিই!"

"স্থর লম্বা গাছের ছাল থেকে আঁশ বার করে সেই সুতোয় লাল, সাদা, বেগুনি প্রভৃতি নানা রংএর ফুল দিয়ে একটি সুন্দর মালা গাঁথল। দিবার চুলের রাশ একত্র করে তা পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল। গরমের দিনে ভোল্‌গার তীরবাসী তরুণ তরুণীরা প্রায়ই জলে নেমে স্নান করত ও সাঁতার কাটত—তাই দিবার চুলে কোন জট ছিল না। স্থর নিজের গাঁথা মালাটি দিবার চুলে তিন ভাঁজ করে—কটিবন্ধে মেখলা জড়ানোর মত করে দুপাশে সাজিয়ে দিয়ে একটা প্রান্ত তার কপালের উপর ঝালরের মত ঝুলিয়ে দিল—তার দুপাশে রইল দুটো রক্ত বর্ণের আর মাঝখানে সাদা রং-এর ফুলের সারি।"

দিবা তখনও সেই শিলাখণ্ডের ওপর বসেছিল, স্থর একটু দূরে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। কত সুন্দরই না দেখাচ্ছিল দিবাকে! আরো একটু পেছনে সরে এসে স্থর দেখতে লাগল—আরও সুন্দর দেখাল। তবে দূরে চলে আসার জন্য আর ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফিরে এসে স্থর দিবার পাশে বসল, নিজের গালের সাথে দিবার গাল মিলিয়ে দিল। দিবা তার সাথীর চোখে চুমু খেল আর নিজের ডান হাত স্থরের কাঁধের ওপর রেখে দিল। স্থর তার বাঁ হাত দিয়ে দিবার কটিদেশ জড়িয়ে নিয়ে বলল; "দিবা! এই ফুলগুলো আগের চেয়েও কিন্তু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"ফুল না আমি?"

স্থরের মুখে কোন উত্তর যোগাল না ক্ষণকাল মৌন থেকে সে বলল,—

"আমি যখন তোমাকে দূর থেকে দেখছিলাম তখন তোমাকে কতই না সুন্দর দেখাচ্ছিল, তারপর আরও একটু দূরে গেলাম—আরও অনেক বেশী সুন্দর লাগল।"

"আর যদি ভোল্‌গা তট থেকে দেখতে, তাহলে?"

"না, না, অতদূর থেকে নয়"—এই কথা বলার সময় স্থরের চোখে আতঙ্কের ঝলক নেমে এলো। সে আবার বলল, "বেশী দূরে গেলে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না, আর তোমার মুখটাও অস্পষ্ট হয়ে যায়।"

"তুমি তাহলে আমাকে কিভাবে দেখতে চাও? দূর থেকে না কাছ থেকে?"

"তোমার কাছে থাকতে! দিনের মধ্যেই সূর্য থাকে উজ্জ্বল—দিবার কাছেই থাকবে স্থর।"

"আচ্ছা, আজ তুমি আমার সঙ্গে নাচবে তো!"

"নিশ্চয়ই।"

"আজ সারাদিন আমার সাথে থাকবে?"

"অবশ্যই।"

"সারারাত?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

"তাহলে আমি আজ 'জনে'র অন্য কোন পুরুষকে কাছে থাকতে দেব না।"—এই বলে দিবা স্বরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল।

এই সময় শিকারী তরুণ তরুণীরা ফিরে এলো। তাদের সাড়া পেয়েও এরা দুজনে আগের মতই দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রইল।

নবাগতাদের একজন বলল, "কিরে দিবা! আজ তুই স্বরকেই সাথী করে নিলি।"

ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দিবা বলল,—"হ্যাঁ! এই দেখ্, স্বর আমাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে।"

এক তরুণী কলকণ্ঠে বলল,—"স্বর! তুমি তো বেশ ফুল সাজাতে পার? আমার চুলও সাজিয়ে দাও না?"

দিবা প্রতিবাদ করে বলল, "আজ নয়—আজ স্বর আমার। আমার একার।"

তরুণী বলল, "বেশ, কাল স্বর আমার।"

"না! কালও স্বর আমার থাকবে।"

তরুণী এবার রাগতস্বরে বলল,—"রোজ রোজ স্বর তোমারই থাকবে না কি? এ ঠিক না, দিবা।"

দিবা নিজের ভুল বুঝতে পারল,—

"রোজ রোজ তো নয়, শুধু আজ আর কাল।"

ক্রমে আরও অনেক শিকারী সেখানে এসে হাজির হল। একটা বিরাট কালো কুকুর এলো তাদের সাথে—আর এসেই স্বরের পা চাটতে লাগল। স্বরের মনে পড়ে গেল যে এই ভেড়াটা সে শিকার করেছিল। দিবার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে এক দৌড়ে সে চলে গেল।

২

কাঠের দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি দেওয়া এক বিশাল কুটির। পাথরের কুঠার ধারাল হলেও তাই দিয়ে ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি কাটা সম্ভব হয় নি। কুড়ুলের ব্যবহার করলেও বড় বড় কাঠ কাটার ব্যাপারে আগুনের সাহায্য নিতে হয়েছে। আর এত বড় কুটির? নিশা নাম্নী পুরাকালের কোন স্ত্রীলোকের বংশধরদের নামেই নিশা জনের উৎপত্তি। হাঁ, নিশা জনের সমস্ত লোকজনই এখানে বাস করে। সমগ্র জন বা গোষ্ঠী এক ছাউনির নীচে বাস করে, একই সাথে শিকার করে, ফল মধু সবই একত্রে আহরণ করে। সবাই একজন কর্ত্রীকে মানে, গোষ্ঠী পরিচালিত হয় সমষ্টিগত ভাবে—সমিতির দ্বারা। পরিচালনা—হাঁ, এই পরিচালনায় জনের ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কোন

ঘটনাই সমষ্টি জীবনের বাইরে ছিল না—শিকার, নাচ, প্রেম, গৃহ নির্ম্মাণ, চামড়ার গাত্রবাস তৈরী—সমস্ত কাজই জন-সমিতি বা কমিটির পরিচালনায় হত—আর এই সমস্ত কাজে জন-মাতাদের প্রাধান্যই ছিল প্রবল। নিশা জনে দেড়শ' নরনারী বাস করে। তবে কি এরা সকলে একই পরিবার-ভুক্ত? এক অর্থে তাদের সবাইকেই একটা পরিবার-ভুক্ত বলা চলে—আবার অন্য অর্থে কয়েকটি পৃথক পরিবারের সমষ্টিও বলা চলে। মাতার জীবিতকালে তাদের কন্যাদের যে সন্তানাদি হয় তার দ্বারা আবার ছোট ছোট পরিবারের সৃষ্টি হয়, কারণ মাতার নামেই সন্তানরা পরিচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দিবার সন্তানরা দিবা-পুত্র বা দিবা-কন্যা বলেই পরিচিত। কিন্তু খাদ্য মাংস বা ফল মধু যাই তারা সংগ্রহ করুক না কেন তা দিবা সন্তানদের ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি হবে না। জনের স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রে সম্পত্তি অর্থাৎ খাদ্যবস্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করে—আর সকলে মিলেই তা ভোগ করে। যদি কিছুই আহরণ করা সম্ভব না হয়, তবে এক সঙ্গে সকলেই অনাহারে থাকবে। জন থেকে পৃথক করে ব্যক্তিবিশেষের কোন বিশেষ অধিকার থাকে না। জনের বা গোষ্ঠীর আজ্ঞা এবং রীতিনীতি পালন করা তাদের কাছে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার মতই সহজ বলে মনে হত।

এই ঘরটাও তাদের অস্থায়ী বাসস্থান। কারণ যখন শিকার যোগ্য জীব এখান থেকে চলে যাবে, ফলমূলের অভাব ঘটবে—তখন সারা গোষ্ঠীর সকলে এ জায়গা ছেড়ে নতুন অঞ্চলে সরে যাবে। বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে—কোথায় কখন শিকার পাওয়া যাবে। এখান থেকে চলে যাবার পর এই খড়ের ছাউনি যায় পড়ে। কিন্তু কাঠ বা পাথরের দেওয়াল কয়েক বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে। নতুন জায়গায় গিয়ে এরা অনুরূপভাবে পরিত্যক্ত দেওয়ালের ওপর খড়ের ছাউনি দিয়ে নতুন ঘর বানাবে আর তারই একাংশে জিনিস-পত্র রাখা ও অপরাংশে রান্নার কাজে ব্যবহার করবে। এরা এখন হাতে গড়া মাটির বাসন তৈরী করতে শিখেছে। কখনো বা কাঁচা মাংস খায়—আবার তাজা মাংস পুড়িয়েও খায়, তবে শুকনো মাংস সেঁকে খাওয়ার রীতি নেই—তা নিষিদ্ধ। ভোল্‌গার এই অংশে মধু পাওয়া যায় যথেষ্ট আর তার জন্যে মধুপায়ী ভাল্লুকের সাক্ষাতও মিলত প্রচুর। নিশা গোষ্ঠী (জন) আহার এবং মদ্যপানের জন্যও মধু পান করত।

মধুর সংগীতের আওয়াজ আসছে না? ঘরে গানের আসর বসেছে। নারী পুরুষ সকলেই গলা ছেড়ে সজীব কণ্ঠে গান ধরেছে। চামড়া পিটিয়ে যখন গাত্রবস্ত্র তৈরী হোত সেই কর্ম্মরত মানুষের সংগীত? তখনকার দিনে সমস্ত গোষ্ঠীর লোক কোন কাজ শুধু যে সম্মিলিতভাবেই করত,—পরন্তু তা সম্পাদন করত মনোরঞ্জক ভঙ্গিমা সহকারে—তা ছিল সম্মিলিত কাজের একটি অংগ। সংগীতের মূর্ছনা কর্মের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়, কিন্তু এই গান কর্মকালীন গান নয়। এখন বিশ্রামকালীন আনন্দের গান হচ্ছে। একবার নারীকণ্ঠের ললিত স্বরের লহরী শোনা যাচ্ছে—আবার শোনা যায় পুরুষ কণ্ঠের পরুষ ও গম্ভীর স্বর।

দিবা

কুটিরের এক অংশে গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, জোয়ান একত্রে সমবেত হয়েছে। ছাউনির মাঝখানে কাটা আছে, আর তারই নীচে পাইন কাঠের আগুন জ্বলছে। স্ত্রী-পুরুষ স্খলিত তালে গান গাইছে, গানের পদে এই শব্দগুলো বোঝা যাচ্ছে—

"অ-স্ত-স্ত-গ-ল-ী-ী-এ-সে-া-া…"

মনে হচ্ছে, এরা যেন আগুনের কাছে প্রার্থনা করছে। তাকিয়ে দেখুন! গোষ্ঠী নেত্রী ও জনের সমিতির লোকেরা আগুনের মধ্যে মাংস, চর্বি, ফল ও মধু আহুতি দিতে আরম্ভ করল। বর্তমানে জনের হাতে শিকার অনেক জমা আছে, প্রচুর ফল ও মধু আহরিত হয়েছে আর এই ঋতুতে কেউ জানোয়ার বা শত্রুর দ্বারা নিহত হয় নি। তাই আজ জনের মানুষেরা পূর্ণিমার রাত্রে অগ্নি-দেবতার কাছে কৃতাঞ্জলী ও প্রার্থনা নিবেদন করছে। জনের নেত্রী এক পাত্র সোমরস আগুনে সমর্পণ করল এবং গোষ্ঠীর সবাই আগুনের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়াল। জন্মের সময় মানুষ যেমন উলঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে আসে—এরা সেই জন্ম থেকে আজও নিরাভরণ উলঙ্গ, সেই ভাবেই এখানে এসেছে। আর এখন শীতকাল নয়—গরমের সময়, অন্য পশুর চামড়ায় নিজের দেহ আবৃত করার দরকার মনে করে না।

কিন্তু, কি সুন্দর সুডৌল এদের শরীর? কারও পেটেই ভুড়ি গজায় নি, কারও শরীরে চর্বি জমে দেহ স্থূল হয় নি। একেই বলে দেহ সৌন্দর্য—সুন্দর স্বাস্থ্য! এদের সকলের মুখশ্রী একই ছাঁচের। আর, না-হবেই বা কেন? এরা সকলেই নিশা সন্তান—পিতা, পুত্র ভাইদের দ্বারা জাত। সকলেই স্বাস্থ্যবান এবং বলিষ্ঠ। অস্বাস্থ্য এবং ক্ষীণ-বল ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারে না, এই প্রকৃতি ও পশু জগতের শত্রুতার মাঝে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

গোষ্ঠী-কর্ত্রী উঠে কুটিরের বড় ঘরটায় গেল। অন্যান্য সকলে কুটিরের মাটি-লেপা মেঝেতে এসে বসল।

চামড়ার থলির পর থলি ভর্তি হয়ে মধু সুরা (সোমরস) আসতে লাগল। কারও কাছে পষক (মাটির পেয়ালা) কেউবা নিয়েছে ভাঁড়, কারও হাতে হাড়ের খুলি, আবার কেউ হয়তো জোগাড় করেছে গাছের পাতার ঠোঙা। তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই পানাহারে মত্ত হল। সব দল দল ভাবে পৃথক হয়ে খাচ্ছিল। অবশ্য এটা সাধারণ রীতি নয়। বৃদ্ধদের মনে পড়ছিল—তাদের বয়সকালে তারা জীবনের আনন্দ কিভাবে উপভোগ করেছে। তারা জানে এখন তরুণ-তরুণীর পালা, কোন কোন তরুণী অবশ্য বৃদ্ধের মুখে মদের পাত্র তুলে ধরছিল—যারা জীবন সায়াহ্নে এসে পৌছেছে—তাদের কাছে পৌছে দিয়েছিল যৌবনের হাতছানি। ঐ দেখুন দিবাকে। তাকে ঘিরে কত তরুণ-তরুণী বসে আছে। তার হাত আজ রিভুর কাঁধে। সুর বসেছে আজ দামার সঙ্গে।

পান-আহার, নৃত্যগীত এ সবের পর—একই ঘরের মধ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরের অঙ্কশয্যায় শয়ন করে রইল! সকালে উঠে কতক স্ত্রী পুরুষ ঘরের কাজে লাগবে, কতক শিকারে বেরুবে, আর কিছু লোক যাবে ফল আহরণে। রক্তিম কপোল ছোট ছোট শিশুরা কেউবা মায়ের কোলে, আর কেউবা গাছের ছায়ায় বিছানো চামড়ার উপর-

শুয়ে রইল—আবার কেউবা একটু বয়স্ক বালক বালিকারা কোলে কাধে চেপে ঘুরতে লাগল, কেউ কেউ ভোল্‌গার বালুতটে লাফালাফি করে বেড়াতে লাগল।

নিশার যুগের তুলনায় এ যুগের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা অনেক বেশী শান্ত ও সন্তুষ্ট। গোষ্ঠী বা জন এখন আর একজন মায়ের অধীনে নয়। পরন্তু অনেক জীবিতা মায়ের ছেলেমেয়ে এখন একত্রে এক গোষ্ঠীতে বা বৃহৎ পরিবার সমবেত হয়েছে এবং এখানকার কর্ত্রী মায়ের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়—রাজত্ব একচ্ছত্র নয়। জন-সমিতি এখন দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। আজ আর তাই কোন নিশার আপন কন্যাকে জলে ডুবিয়ে মারবার দরকার হয় না।

৩

দিবা এখন চার পুত্র এবং পাঁচ কন্যার জননী। বয়স পঁয়তাল্লিশ—এখন সে নিশা-গোষ্ঠীর কর্ত্রী মায়ের পদে অধিষ্ঠিতা। গত ২৫ বছরে নিশা-গোষ্ঠীর লোক সংখ্যা তিন গুণ বেড়ে গেছে। এই বাড় বাড়ন্তের জন্য সুব যখনই দিবাকে চুমু খেয়ে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছে, দিবা জবাব দিয়েছে—"এ সবই অগ্নির দয়ায়—সূর্য দেবতার কৃপায়। অগ্নি ও সূর্য যারই সহায় হন—সে যেখানেই থাক—ভোল্‌গার স্রোতের মতই তার ঘরে মধুর বন্যা বইবে; দলে দলে হরিণ আসবে বনে—তার আহার যোগাবার জন্যে।"

নিশা জনের সমস্যাও বেড়েছে অনেক। আগে তারা যে সমস্ত জঙ্গলে আস্তানা গাড়ত—এখন আর সেই রকম ছোট জঙ্গলে আর তাদের কুলোয় না। তাদের 'জন-দম' (যৌথ বাসগৃহ) গুলিই যে তিন গুণ বাড়াতে হয়েছে তাত নয়—মৃগয়াক্ষেত্রের পরিধি দরকার তিন গুণ। বর্তমানে তারা যে মৃগয়া ভূমির কাছে আস্তানা নিয়েছে—তার ওপারে উষা জনের মৃগয়াক্ষেত্র। উভয়ের সীমানার মাঝখানে ছিল একটি অনধিকৃত বনভূমি। নিশা-গোষ্ঠীর লোকেরা সময়ে সময়ে শুধু যে অনধিকৃত ভূমিতে শিকার করত—তা নয়, পরন্তু তারা উষা-গোষ্ঠীর মৃগয়া ভূমিতে কয়েকবার শিকার করতে গিয়েছে। জন-সমিতি (গোষ্ঠীর মন্ত্রণা পরিষদ) দেখল যে এতে করে উষা গোষ্ঠীর সাথে নিশা পরিবারের সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে, কিন্তু এর প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। একদিন তো দিবা স্পষ্টভাবে 'জন সমিতি'তে বলল, "ভগবান যখন আমাদের এতগুলি জীব দিয়েছেন তখন এই সব বন-জঙ্গলে তাদের খাদ্যও নিশ্চয় পূর্ণ থাকবে। 'এই সব মৃগয়াক্ষেত্র ছাড়া এতগুলো মুখে আহার যোগানো সম্ভব নয়। এই সব জঙ্গলে যে সমস্ত ভাল্লুক, গরু, ভেড়া আছে তা কিছুই ছাড়া যায় না—যেমন আমরা ছেড়ে দিতে পারি না এই ভোল্‌গার মাছ।

উষা-গোষ্ঠী দেখল যে নিশা জন অন্যায়ের পর অন্যায় করে চলেছে। একবার দুবার উষা জনের জন-সমিতি নিশা-গোষ্ঠীর জন-সমিতির সংগে আলাপ আলোচনা করল, স্মরণ করিয়ে দিল এই দুই জনের মধ্যে আবহমান কাল ধরে কোন সংঘর্ষ হয় নি; এ কথাও বলল যে প্রতিবার শীতের সময় তারাই এখানে এসে থাকে। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে যদি নিশা-গোষ্ঠীকে ন্যায়ের পথ নিতে হয়—তা কি করে সম্ভব? সকল আইন যখন বিফল তখন জঙ্গল আইনের আশ্রয় নিতে হয়। উভয় গোষ্ঠীই ভিতরে ভিতরে লড়াইএর প্রস্তুতি করতে লাগল। একের খবর অপরের পাবার উপায় ছিল না। কারণ এই সময়ে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—আপন আপন গোষ্ঠীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত।

নিশা জনের এক দল একদিন পাশের বনে উষা জনের মৃগয়া ভূমিতে শিকার করতে গেল। উষা গোষ্ঠীর লোকেরা লুকিয়ে বসেছিল—তারা আক্রমণ করে বসল। নিশা গোষ্ঠীর লোকেরা বীরত্বের সঙ্গে লড়ল—কিন্তু তারা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে বেশী সংখ্যায় আসে নি। আপন দলের বহু মৃতকে ফেলে এসে—আহতদের সঙ্গে নিয়ে শিকারীর দল পালিয়ে এল। জন-মাতা সমস্ত শুনল, জন-সমিতি আলোচনা করল, তার পর সর্বশেষে সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। সমস্ত ঘটনা তাদের সামনে উপস্থিত করা হল। মৃতের নাম বার বার উচ্চারিত হল, আহতদের সামনে এনে হাজির করা হল। মৃত ও আহতদের ভাই-ছেলেরা, মা-মেয়ে-বোনেরা রক্তাক্ত প্রতিহিংসার জন্য উত্তেজিত করতে লাগল। রক্তের প্রতিশোধ নিতে না পারায় জন ধর্মের বিরোধিতা করা তা কেউ কল্পনা করতে পারত না। সমগ্র গোষ্ঠী সমবেত ভাবে সিদ্ধান্ত করল, মৃতের রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে।

নাচের বাজনা যুদ্ধের বাজনায় পরিবর্তিত হল। শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষার জন্য কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ রেখে বাকি সকলে যুদ্ধ যাত্রা করল; ধনুক, পাষাণ-কুঠার, কাঠের বল্লম ও কাঠের মুদ্গার আর দেহ রক্ষার জন্য কঠিন ও দৃঢ় চামড়ার বর্ম আবরণ। সামনে চলল বাদকেরা—তার পর চলল—যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত স্ত্রী-পুরুষ। গোষ্ঠী নেত্রী দিবা সকলের আগে চলল, প্রধানা হিসাবে সেই পরিচালিকা। বাজনার আওয়াজ দিয়া দিগন্ত ধ্বনিত ও অনুরণিত হল, লোকের কোলাহলে বনভূমি মুখরিত হল, পশুপক্ষীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক পালাতে সুরু করল।

একটু পরেই তারা অনধিকৃত বনভূমিতে এসে পৌছল। কোন সীমা রেখা না থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত গোষ্ঠীর লোকরা সীমান্ত সম্পর্কে ভালভাবেই জ্ঞান ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা মিথ্যা বলতে পারত না। মিথ্যা কথা তখনো মানব সমাজে অপরিচিত ছিল, আর বিদ্যা (কৌশল) হিসাবে আয়ত্ত করা কঠিন হোত। অপর গোষ্ঠীর শিকারীরা আপন গোষ্ঠীতে গিয়ে খবর দিল, এবং উষা জনের যোদ্ধারা হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে ময়দানে এলো। উষা গোষ্ঠী বস্তুত ন্যায় চেয়েছিল—তারা চেয়েছিল আপন মৃগয়াক্ষেত্র রক্ষা করতে। আর আপন ভূমি রক্ষার জন্যই তাদের সংগ্রাম। কিন্তু নিশা গোষ্ঠী এই ন্যায়-অন্যায় বিচার

করতে প্রস্তুত ছিল না। উষা গোষ্ঠীর মৃগয়াক্ষেত্রে দুই গোষ্ঠীর লোকেদের যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয় পক্ষ থেকেই পাথরের ফলাযুক্ত বাণ শন শন করে বর্ষিত হতে লাগল, কুঠারে-কুঠার, বল্লমে-বল্লম আর মুদ্গরে-মুদ্গর যুদ্ধ হতে থাকল, উভয় পক্ষের লোকই আহত হল। হাতিয়ার ভেঙ্গে বা হাত থেকে পড়ে গেলে হাতে হাতে, দাঁতে বা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেওয়া পাথরের সাহায্যে লড়াই চলতে লাগল।

নিশা গোষ্ঠীর জনসংখ্যা উষা গোষ্ঠীর দ্বিগুণ, কাজেই উষা গোষ্ঠীর পক্ষে জয়লাভ ছিল অসম্ভব। কিন্তু একটি বালকও জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এক প্রহর দিন অর্থাৎ সূর্য ওঠার তিন ঘণ্টা পর যুদ্ধ স্বরু হয়েছিল—উষা গোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক বনের মধ্যেই নিহত হোল—আহত নয়—তারা নিহত হয়েছে। গোষ্ঠী যুদ্ধে আহত শত্রুকে ছেড়ে যাওয়া নিতান্ত অধর্মের কাজ। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ভোল্‌গাতটে তাদের শেষ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করল ও সংগ্রামে প্রাণ দিল। কয়েকজন জননী শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে আবাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল—কিন্তু তখন আর সময় ছিল না, প্রতিহিংসা-পরায়ণ শত্রুরা তাদের অনুসরণ করে ধরে ফেলল—স্তন্যপায়ী শিশুদের ধরে ধরে তারা পাহাড়ের ওপর আছড়ে গুঁড়িয়ে দিল, বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষদের গলায় পাথর বেঁধে ভোল্‌গার জলে ডুবিয়ে দিল। তাদের বাসগৃহে রক্ষিত মাংস, ফল, মধু ও সুরা এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার বাইরে এনে অবশিষ্ট জীবিত শিশু ও স্ত্রীলোককে ঘরে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় লেলিহান আভার মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন্ত মানুষের আর্তনাদ বিজয়ী নিশা গোষ্ঠীর লোকেদের উল্লসিত করে তুলল। তারা অগ্নি দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাল। শত্রুর সঞ্চিত মদ ও মাংসে দেবতা ও নিজেদের উদর পরিতৃপ্ত করল।

দিবা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। তিন তিনটি মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে আনা শিশুকে পাথরে আছড়ে মেরেছে—আর তাদের মাথার খুলি ফাটার সময় যে আওয়াজ হয়েছে সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অট্টহাসি হেসেছে। আজ পানাহারের পর স্বরু হল নৃত্য। ঐ আগুনের সামনেই দিবা তার তরুণ ছেলে বাসুকে নিয়ে নাচতে স্বরু করে দিল। নাচের তালে তালে দুই উলঙ্গ নরনারী পরস্পরকে আলিঙ্গন আর চুম্বন করতে লাগল—কখনও বা ছাড়াছাড়ি হয়ে নিজেদের নিজস্ব নাচের ভঙ্গিমা দেখাতে লাগল। সকলেই বুঝল আজ রাতে বাসুই হবে নেত্রী দিবার ক্রীড়া ও শয্যাসঙ্গী। বাসু তায় জয়োন্মত্তা মায়ের কামনাকে অবহেলা করতে চাইল না।

এই গোষ্ঠীর মৃগয়াভূমি এখন চার গুণ বেড়ে গেল আর শীতকালে তারা কোথায় থাকবে সে চিন্তাও দূর হল। তবু একটা দুশ্চিন্তা তাদের রয়ে গেল—উষা গোষ্ঠী জীবিত অবস্থায় যে ক্ষতি করতে পারে নি এখন মৃত্যুর পর প্রেতযোনী পেয়ে তাদের প্রতিশোধ নেবে। যে ঘরে জীবিতদের পোড়ান হয়েছিল—সেই ঘরটা তো ভূতের আড্ডা হল—নিশা গোষ্ঠীর কেউ একা এখান দিয়ে যেতে সাহস পাবে না। বহুবার শিকারীরা নাকি দেখেছে শত শত উলঙ্গ নরনারী জ্বলন্ত আগুনের সামনে নাচছে। বাসভূমির পরিবর্তন

যে প্রয়োজন হল সেদিন তো এই পোড়া ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়েছে—সংখ্যায় তারা বেশী ছিল আর দিনের বেলা ছিল বলে রক্ষে। দিবা তো কয়েকবারই দেখেছে যে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু মাটি থেকে উঠে এসে তার হাত ধরে ঝুলছে—ভয়ে সে চীৎকার করে উঠেছে।

৪

দিবার বয়স এখন সত্তরের ওপর হল। এখন সে আর নিশা জনের কর্ত্রী নয়—তবু গোষ্ঠীর সকলেই তাকে সম্মান করে। তার বিশ বছরের নেতৃত্বে সে বংশের বৃদ্ধি এবং কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করেছে। এই বিশ বছরে জনকে অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে অনেকবার লড়তে হয়েছে; তাতে ক্ষয় ক্ষতি ও জন হানি হয়েছে—যদিও শেষ পর্যন্ত নিশা গোষ্ঠী সর্বদা বিজয়ী রয়ে গেছে, এখন তাদের দখলে পর্যাপ্ত মৃগয়াভূমি—তাতে কয়েক মাস স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। দিবার কাছে এ সবই ভগবানের কৃপা বলে মনে হয়, দিবার ভয় এখনো কাটেনি—হাতে ঝোলা মৃত স্তন্যপায়ী শিশুরা এখনো মাঝে মাঝে তার রাতের ঘুম ঘুচিয়ে দেয়।

শীতকাল এসে পড়েছে। ভোল্‌গার স্রোত জমাট হয়ে গেছে—তার ওপর কয়েক মাসের সঞ্চিত তুষার স্তূপের দিকে দূর থেকে তাকালে মনে হয়—রৌপ্য চূর্ণের অথবা পেঁজা তূলোর একটা আঁকা বাঁকা রেখা চলে গেছে। অপরদিকে বনভূমিতে হিমশীতল নির্জীবতা ও স্তব্ধতা বিরাজ করছে। নিশা গোষ্ঠীর লোক সংখ্যা আরো বেড়েছে। তাই তাদের আরো বেশী খাদ্যেরও প্রয়োজন বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে কাজ করার লোকও বেড়েছে—কাজের দিনে তাদের খাদ্য ভাণ্ডারে প্রভূত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। এমন কি শীতকালের দিনেও পোষা কুকুর নিয়ে নিশা পরিবারের ছেলে মেয়েরা শিকারে বেরুলে কিছু না কিছু পেয়েই থাকে। শিকারের নতুন উপায় তারা বার করেছে—হরিণ, গরু, বুনো ঘোড়া নিজেদের খাবারের খোঁজে এ-বন ও-বন ঘুরে বেড়ায়। বনের মধ্যে থাকতে থাকেতে শিকারীরা লক্ষ্য করেছে যে মাটিতে বীজ পড়লে তাতে অঙ্কুর জন্মায়—তাই তারা ভিজে মাটির ওপরে ঘাসের বীজ বসাতে সুরু করল। তার ফলে সেখানে ঘাস জন্মাল, তৃণভোজী পশুরাও আসতে আরম্ভ করল—ক্রমে তারা এই অঞ্চলে বেশী দিন থাকতে লাগল।

একদিন ঋক্ষশ্রবার শিকারী কুকুরটা একটা খরগোসের পেছনে তাড়া করল—ঋক্ষশ্রবাও ছুটল তার পেছন পেছন। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল—তাই সে আপন চামড়ার আবরণ খুলে কাঁধের ওপরে ঝুলিয়ে নিল। ইতিমধ্যে কুকুরটা কখন দৃষ্টির বাইরে চলে-

গেছে। তুষারের ওপর পায়ের ছাপ পড়েছে—তাই পদচিহ্ন দেখা গেল। ঋক্ষ হাঁপাতে হাঁপাতে এক গাছের গুঁড়িতে বিশ্রামের আশায় বসে পড়ল। পূর্ণ বিশ্রামের আগেই কুকুরটার ডাক শুনতে পেয়ে—ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আবার দৌড়তে লাগল। ক্রমেই সে শব্দটার কাছে এসে পড়ল আরও কাছে এসে দেখতে পেল যে একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। সাদা চামড়ার একটি পোষাক তার পরনে—সাদা শিরস্ত্রাণের নীচে গুচ্ছ গুচ্ছ আলুলায়িত কেশ দেখা যাচ্ছে—আর তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা খরগোস। ঋক্ষ এসে পৌছলে কুকুরটা আরো জোরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে তার কাছে এল। ঋক্ষ মেয়েটির মুখের দিকে চাইল। মেয়েটি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল,—

"বন্ধু! এ কুকুরটি কি তোমার?"

"হাঁ আমার! কিন্তু তোমাকে তো এর আগে আর কখনো দেখিনি।"

"আমি কুরুবংশের মেয়ে। এই এলাকাটা—আমাদেরই।"

"কুরুবংশ!"

কুরু গোষ্ঠীর নাম শুনে ঋক্ষর মনে কিছুটা দ্বেষ জাগিয়ে উঠল। কুরুরা তাদের প্রতিবেশী এবং কয়েক বছর ধরে বিরোধ চলছে। বিরোধ কয়েক বার যুদ্ধের পর্যায়ে উঠেছে। কুরুরা অবশ্য উষা গোষ্ঠীর চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। তারা বুঝেছিল যে যুদ্ধে জেতবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই পালানই শ্রেয় ও কার্যকরী বলে স্থির করেছে। অস্ত্রের জোরে রক্ষা না পেলেও—পালিয়ে বেঁচেছে। নিশা বংশের যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল যে তারা কুরুবংশ ধ্বংস করবে—কিন্তু এখনো সে প্রতিজ্ঞা পালিত হয় নি।

তরুণী বলল, "তোমার কুকুর এই খরগোসটি মেরেছে—এটা তুমি নিয়ে যাও।"

"কিন্তু কুরুদের মৃগয়াক্ষেত্রে যে মরেছে।"

"হাঁ, তাই মরেছে। আমি কিন্তু কুকুরের মালিকের প্রতীক্ষায় ছিলাম!"

"প্রতীক্ষায়!"

"হাঁ, মালিকের হাতে খরগোস দিয়ে দেব বলে!"

কুরুকুলের নাম শুনে ঋক্ষর মনে যে দ্বেষ সঞ্চার হয়েছিল তা সুন্দরীর নম্র আলাপে বিদূরিত হল। প্রত্যুপকারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলল, "শুধু শিকার নয়, তুমি আমার কুকুরকে ফিরিয়ে দিয়েছ। এই কুকুর আমার খুবই প্রিয়।"

"কুকুরটা সত্যই খুব সুন্দর।"

"সারা গোষ্ঠীর মাঝে থাকলেও আমার ডাক শুনতে পেলে ছুটে আসে।"

"এর নাম!"

"শম্ভু!"

"তোমার নাম, বন্ধুবর!"

"ঋক্ষশ্রবা, রোচনা পুত্র!"

"রোচনা পুত্র? আমার মার নামও রোচনা ছিল। ঋক্ষ তাড়া না থাকলে একটু বস!"

ধনুক ও পরিধান বরফের ওপর রেখে সুন্দরীর পায়ের কাছে বসতে বসতে ঋক্ষ বলল, "তোমার মা বেঁচে নেই।"

"না! নিশা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে। আমাকে ভালবাসত; বলতে বলতে তরুণীর চক্ষু আর্দ্র হয়ে এল।"

ঋক্ষ নিজের হাত দিয়ে তরুণীর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল,* "কি বিচ্ছিরি এই যুদ্ধ।"

"হাঁ, কত প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এতে সইতে হয়।"

"কিন্তু, এখনো তো থামল না।"

"একের বিচ্ছেদ ছাড়া কি করে থামবে? তরুণী বলল, শুনছি নিশা পুত্রেরা আবার আক্রমণ করবে। আমি ভাবছি ঋক্ষ! তোমার মতই তো ওরাও তরুণ।"

"তোমার মত সুন্দরী মেয়েও তো কুরু গোষ্ঠীতে আছে।"

"তবু আমাদের একের অন্যকে মারতে হবে ঋক্ষ, এ কোন্ ধারা।"

ঋক্ষের মনে পড়ল তিন দিন পর তাদের গোষ্ঠী কুরুগণের ওপর আক্রমণ করবে। ঋক্ষ কিছু বলার আগেই তরুণী বলল, "কিন্তু আমরা আর লড়াই করব না।"

"লড়বে না? কুরুরা আর লড়বে না?"

"ঠিকই! আর লড়বে না। আমাদের লোক এত কমে গেছে যে আমাদের জেতবার আর কোন আশাই নেই।"

"কুরুরা তবে কি করবে?"

"ভোল্গাতট ছেড়ে চলে যাবে। ভোল্গা মায়ের ধারা আমাদের কত প্রিয়। একে আর দেখতে পাব না—তাই আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এখানে বসে বসে এর স্বপ্ন ধারাকে দেখছি।"

"তুমি তাহলে আর ভোল্গাকে দেখবে না।"

"সাঁতারও কাটতে পাব না। এই শান্ত জলস্রোতে সাঁতার কেটে কি আনন্দই না পেতাম।"—সুন্দরীর কপোলে চোখের জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

"কত ক্রূর, কত নিষ্ঠুর!" উদাস স্বরে ঋক্ষ বলল।

"কিন্তু এই তো 'জনে'র ধর্ম!" রোচনা বলল।

"আর বর্বর ধর্মও বটে!" ঋক্ষ জবাব দিল।

আজ থেকে সোয়া দুইশত পুরুষ আগের এক আর্য গোষ্ঠীর কাহিনী। এদের হিন্দি স্লাভ ভাষী বা শতমবংশ বলা হত।

অমৃতাশ্ব

দেশ ঃ মধ্য এশিয়া, পামীর (উত্তর কুরু),
জাতি ঃ ইন্দো-ইরাণী ভাষাভাষী
কাল ঃ ৩০০ খৃঃ পূঃ

১

ফরগানার সবুজ শ্যামল পাহাড়, স্থানে স্থানে প্রবাহিত নদী বা ঝরণাধারা,—তা যে কত সুন্দর সে শুধু তারাই জানে যারা দেখেছে কাশ্মীবেব সুষমা। হেমন্তেব অবসানের পর বসন্ত এসেছে, আব বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য এই পার্বত্য উপত্যকাকে ক'রে তুলেছে মর্তের স্বর্গ, পশুর পাল গিরিগুহার হেমন্ত আবাস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বিস্তৃত গে'চা ণ ভূমিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার লোমেব তৈরী তাঁবু—তার মধ্যে যেগুলি খুব লাল সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। একটি তাঁবু থেকে মশক (জলভরার চামডাব থলি বিশেষ) কাঁধে ক'রে একটি তরুণী বেরিয়ে এল, সে পাথরের ওপব দিয়ে নদীর তীরের দিকে এগোতে লাগল অট্টহাসির হাসি হাসতে হাসতে। তাঁবু থেকে বেশী দূরে সে যায় নি এমন সময় কে একটি পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল। তরুণীর মতই তার শরীর একটি পাতলা সাদা পশমের কম্বলে ঢাকা। কম্বলের দুটি প্রান্ত এমনভাবে ডান কাঁধেব ওপবে গেরো দিয়ে বাঁধা যে শুধু ডান হাত, কাঁধ আর বুকের অর্ধাংশ অনাবৃত। পুরুষটির চুলগুলি পীংগল (পাংসুটে) গোফটি সুন্দরভাবে পাকান। পুরুষটিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। মুচকি হেসে পুরুষটি বলল—"সোমা, আজ দেরি ক'রে জল ভরতে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, ঋত্রাশ্ব। কিন্তু, পথ ভুলে তুমি এদিকে কোথায়?"

"ভুলিনি সখি! আমি তোমার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে! অনেক দিন পরে।"

"আজ সোমার কথা মনে পড়ল!"

"তা বেশ ভালই, আমার জল ভবে ঘরে ফিবতে হ'বে, অমৃতাশ্ব খেতে বসেছে।"

দুজনেই কথা বলতে বলতে নদীতীর পর্যন্ত গিয়ে ঘরে ফিবল। ঋত্রাশ্ব বলল।

"অমৃতাশ্ব বেশ বড় হ'য়ে গেছে;"

"হ্যাঁ, তুমি তো অনেক দিন দেখনি।"

"তার চার বছর বয়স থেকে।"

"এখন তার বয়স হ'ল বার। সত্যি বলছি ঋত্রাশ্ব, রূপে সে তোমারই মত।"

"কি জানি, সে সময় আমি ছিলাম তোমার কৃপার পাত্র। অমৃতাশ্ব এতোদিন ছিল কোথায়?"

"বাহ্লীকে দাদা মহাশয়ের কাছে।"

তরুণী জল ভর্তি মশকটি নামিয়ে রেখে নিজের স্বামী কৃচ্ছ্রাশ্বকে ঋত্রাশ্বের আসার খবর দিল। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে এবং পেছনে অমৃতাশ্ব তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ঋত্রাশ্ব সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে বলল,

"বল বন্ধু কৃচ্ছ্রাশ্ব, কেমন ছিলে তুমি?"

"অগ্নিদেবতার কৃপায় ভালই আছি ঋত্রাশ্ব। এসো, খাওয়া যাক! এক্ষুনি সোম (সিদ্ধি) বেটে মধু এবং অশ্বিনী-ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরী হয়েছে।"

"মধু সোম? কিন্তু এতো সকালে কি ক'রে?"

"আমি ঘোড়ার চারণ ভূমিতে যাচ্ছি। বাইরে দেখছ না ঘোড়া তৈরী?"

"তা হলে আজকের সন্ধ্যায় ফিরবার ইচ্ছা নেই?"

"নাও ফিরতে পারি। তাই এ সোমের মশক আর সুস্বাদু অশ্ব-মাংস সংগে নেব।"

"অশ্ব-মাংস!"

"হ্যাঁ, আমার পশুগুলির ওপর অগ্নিদেবতার কৃপা আছে। আমি তো ঘোড়াই বেশী পালন করি।"

"হ্যাঁ, কৃচ্ছ্রাশ্ব! তোমার নামটা কিন্তু উলটো।"

"মা বাবার সময় আমাদের ধর্মে অশ্বের কৃচ্ছ্রতা ছিল, তার জন্যই তারা আমার এই নাম রেখে ছিলেন।"

"কিন্তু এখন তো ঋদ্ধাশ্ব হওয়া উচিত।"

"আচ্ছা, ভিতরে চল।"

"এই পাইন গাছের নীচে সবুজ ঘাসের ওপরই বসি না কেন, বন্ধু!"

"ঠিকই! সোমা, তুমি তাহলে নিয়ে এসো সোম আর মাংস। এখানেই বন্ধুকে তৃপ্ত করি।"

"কিন্তু কৃচ্ছ্র! তুমি তো ঘোড়ার পালের দিকে যাচ্ছিলে যে।"

"আজ না হয় কাল যাব। বস ঋত্রাশ্ব!"

সোমা ভাংঙের মশক এবং চষক (পেয়ালা) নিয়ে এল। দু বন্ধুর মাঝে অমৃতাশ্বও বসে পড়ল।

সোমা ভাংঙ এবং চষক মাটির ওপর রেখে দিয়ে বলল, "একটু অপেক্ষা কর, বিছানা এনে দিচ্ছি।"

"না গো সোমা! এই নরম সবুজ ঘাস বিছানার চেয়েও ভাল।"—ঋত্রাশ্ব বলল।

"আচ্ছা, বল তো ঋত্র! লবণ দিয়ে সিদ্ধ করা মাংস খাবে, না পোড়ামাংস খাবে? আট মাসের বাছুর-মাংস খুবই নরম।"

"আমি তো সোমা, বাছুরের পোড়ান মাংসই পছন্দ করি। আমি কখন কখনও গোটা বাছুর আগুনে পোড়াই। পোড়াতে দেরি হ'লেও কিন্তু মাংস খুব সুস্বাদু হয়।

"তোমাকে কিন্তু সোমা! ঠোঁটের স্পর্শে আমার চষক মিষ্টি ক'রে দিতে হ'বে।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, সোমা ! ঋত্র দীর্ঘ দিন পরে এসেছে।"—কৃচ্ছ্রাশ্ব বলল।

"আমি এক্ষুনি আসছি, জোর আগুন আছে মাংস পোড়াতে দেরি হবে না।"

কৃচ্ছ্রাশ্বকে চষকের পর চষক নিঃশেষ করতে দেখে ঋত্রাশ্ব বলল।—"তাড়া কিসের ?"

"সিদ্ধি হচ্ছে অপূর্ব ! সোমার হাতের সিদ্ধি আরও অপূর্ব ! যেন অমৃত। এ সিদ্ধি লোককে অমর করে। সিদ্ধি পান কর এবং অমর হও।"

"তুমি কি অমর হ'তে চাও ? যে রকম চষকের পর চষক নিঃশেষ ক'রে চলেছ, তাতে অচিরেই মরার মত হয়ে যাবে।"

"কিন্তু তুমি জান ঋত্র ! সিদ্ধি আমি কত ভালবাসি ?"

এই সময় সোমা চামড়ায় ক'রে পোড়ান তিন টুকরা মাংস নিয়ে এসে বলল, "কিন্তু কৃচ্ছ্র ! সোমাকে কি তুমি ভালবাস না ?"

কৃচ্ছ্র কণ্ঠের স্বর পরিবর্তন ক'রে বলল, "সোমা ও সোম দুটিকেই আমি ভালবাসি।"

তার চোখ লাল হয়ে উঠেছিল, সে বলল, "সোমা ! আজ তোমার কিসেব চিন্তা ?"

"হ্যাঁ, আজকে তো আমি ঋত্রের।"

"অতিথি না পুরানো বন্ধু ?"—কৃচ্ছ্র হাসতে চেষ্টা ক'রে বলল।

ঋত্রাশ্ব সোমার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে সোমপূর্ণ চষক তার মুখের কাছে ধবল সোমা দু ঢোক পান ক'রে বলল,

"এখন তুমি খাও ঋত্র ! অনেক দিন পবে আজ আবার সুদিন ফিরেছে।"

ঋত্রাশ্ব পুরো-চষকটি এক নিঃশ্বাসে পান ক'রে পাত্রটি মাটিতে রেখে বলল,—"তোমার ঠোঁটের পরশেই সোমে না জানি কতই মিষ্টি হয়।"

কৃচ্ছ্রাশ্বের ভেতর সোমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নিজেব চষকটি ভর্তি ক'রে নিয়ে সেই পেয়ালা সোমার দিকে এগিযে দিয়ে আড়ষ্ট গলায় বলল,

তা- হ- লে সো- ও- ও- মে- ে- ে, এ- টা- া- ও ম- ধু- উ- র বাঁ- া- নি- য়ে- যে দা- া- ও !

সোমা তার ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ ক'রে ফিরিয়ে দিল। অমৃতাশ্ব বুড়োদের প্রেমালাপে রস পেতনা, তাই সমবয়স্ক বালক বালিকাদের সংগে খেলতে চলে গেল। কৃচ্ছ্রাশ্বের মাথা ঝুকে পড়েছিল, সে ঢুলু ঢুলু চোখে বলল, "সো-ও-ও-মে-ে গা-আ-ন গা-আ-ব !"

"হ্যাঁ, তোমার মত গায়ক কুরুদের মধ্যে আর কেউ আছে ?"

"ঠি-ই-ক ব-লে-এ-ছ, আ-মা-র জু-উ-ড়ি-ই নে-ই। বেশ তা-া-হো-লে শো-ও-ন !"

"প্-পি-র-ও-র-বে-ে-ে-ম-ম সো-ম—"

"থাক্ কৃচ্ছ্র ! দেখ্‌ছ না তোমার গান শুনে সমস্ত পশু-পক্ষী জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।"

"হ্-হু-ম্-ম"

এটা সোম (সিদ্ধি) খাওয়ার সময় নয়। সাধারণত তার সময় হ'ল সূর্যাস্তের পরে; কিন্তু কৃচ্ছ্রাশ্বের তো কোন একটি বাহানার দরকার। সে বেহুস হয়ে পড়ায় সোমা ও ঋত্রাশ্ব চষক রেখে দিল এবং দুজনই নদীর ধারে একটি টিলার ওপর গিয়ে বসল। পাহাড়ের মধ্যে যেখানটায় কিছুটা সমতল সেখান থেকে এই নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু নদী ছিল ছোট বড় পাথর টুকরায় ভরা। তার ওপর জলের আঘাত এসে লাগায় শব্দ হচ্ছিল। পাথরের আড়ালে মাছগুলিকে যেখানে সেখানে নিজ নিজ পক্ষ তুলিয়ে চলতে ফিরতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। তীরস্থিত শুকনো জমিতে বিশাল শাল, দেবদারু বৃক্ষাদি বিরাজ করছিল। পাখীর সুমিষ্ট সঙ্গীত আর ফুলের সুগন্ধি মৃদুমন্দ বাতাসের শ্বাস এবং স্পর্শ অত্যন্ত আনন্দদায়ক বস্তু। অনেক দিন পরে তারা দুজনে এই স্বর্গীয় ভূমিতে নিজেদের অতীত দিনের প্রেমালাপের পুনারাবৃত্তি করছিল। আজকের এই সময় তাদের মনে পড়ছে সে দিনগুলির কথা, যখন কিনা সোমা ছিল ষোড়শী পিঙ্গলা (পিঙ্গল কেশী) বসন্ত উৎসবের সময় ঋত্রাশ্বও বাহ্লীকে আপন মামার ঘরে গিয়েছিল। সোমা ছিল তার মাতুল কন্যা। ঋত্রাশ্বও ছিল তার প্রেমিকদের মধ্যে একজন। তখন সোমার প্রণয় অভিলাষীদের ভেতর বেশ প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু জয়মাল্য জুটল কৃচ্ছ্রাশ্বের অদৃষ্টে। অন্যান্য সকলের মত ঋত্রাশ্বকেও পরাজয় স্বীকার করে নিতে হ'ল। আজ সোমা কৃচ্ছ্রাশ্বের স্ত্রী কিন্তু সেই প্রাণপূর্ণ যুগে স্ত্রীলোক পুরুষের একচেটে জঙ্গম সম্পত্তি হ'তে স্বীকার করেনি, এর জন্য তার অস্থায়ী প্রেমিক গ্রহণ করবার অধিকার ছিল। অতিথি এবং বন্ধুর নিকট নিজের স্ত্রীকে সেবা করতে পাঠান তখনকার দিনে সর্বমান্য সদাচার বলে গণ্য হ'ত। আজ বস্তুতঃ সোমা ঋত্রাশ্বের।

সন্ধ্যায় গ্রামের নবনারী মহাপিতরের বিস্তৃত আঙ্গিনায় জড়ো হ'ল। সোমা মধু সুরা এবং সুস্বাদু গো-অশ্ব মাংস নিয়ে যাচ্ছিল। মহাপিতরের পুত্রের জন্ম উৎসব হচ্ছিল। কৃচ্ছ্র নিজে বেসামাল অবস্থায় ছিল। আর তার স্থলে গিয়ে সোমা এবং ঋত্রাশ্ব পৌঁছল। অনেক রাত পর্যন্ত পান, গীত, নৃত্য ক'রে মহোৎসব শেষ হ'ল। সোমার গান এবং ঋত্রাশ্বের নৃত্য কুরুর্জন সর্বদাই ভালবাসত।

২

"মধুরা! তুমি ক্লান্ত হওনি তো?

"না, আমি ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করি।"

"কিন্তু, সেই দস্যুরা তোমাকে কি খুব খারাপ ভাবে গ্রেপ্তার ক'রে রেখে ছিল?"

"হ্যাঁ, বাহ্লীক পক্‌থোদের শুধু গরু এবং ঘোড়াই নয় পরন্তু তারা মেয়েদেরও লুঠ করতে এসেছিল।"

"হ্যাঁ, পশু লুঠে দুটি 'জনে'র মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কন্যা লুঠ করলে শত্রুতা ক্ষণস্থায়ী হয়—কারণ শেষ পর্যন্ত শ্বশুরকেই জামাতার সৎকার করতে হয়।"

"কিন্তু তোমার নাম আমার মনে নেই।"

"অমৃতাশ্ব; কৃচ্ছ্রাশ্ব-পুত্র, কৌরব।"

"কৌরব! কুরু আমার মামার কুল।"

"মধুরা এখন তুমি নিরাপদ, বল—কোথায় যাবে?"

মধুরার মুখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠল, কিন্তু অচিরেই তা বিলীন হয়ে গেল। অমৃতাশ্ব তা বুঝতে পেরে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল।—"অতীতে পক্‌থোর কন্যারা আমাদের গাঁয়েও এসেছে।"

"সমস্তই লুঠ ক'রে তো?"

"না, তাদের ভেতর অধিক সংখ্যক মাতুল কন্যা ছিল।"

"তাহলেও মেয়েদের লুঠ-পাট করা আমার খুব খারাপ লাগে।"

"আর আমিও এটা খারাপ মনে করি, মধুরা! বিশেষ করে যেখানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেমের সম্ভাবনা আছে কিনা—তা জানা নেই।"

"মাতুল কন্যা বিয়ে করা এর চেয়ে ভাল। কেননা তাহলে প্রথম হ'তেই পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে।"

"তোমার এরকম কোন প্রেমিক ছিল না কি, মধুরা?"

"না, আমার কোন পিসীমা নেই।"

"অন্য কোন লোক?"

"স্থায়ীভাবে নয়।"

"তুমি কি আমাকে ভাগ্যবান করতে পার?"

"মধুরার সলজ্জ দৃষ্টি নত হয়ে গেল।" অমৃতাশ্ব বলল,—

"মধুরা! এরকম 'জনপদ'ও আছে যেখানে স্ত্রী অন্যের নয়, নিজের।"

"তোমার কথা বুঝলাম না, অমৃতাশ্ব!"

"স্ত্রীলোককে কেউ লুঠ করে না কিংবা স্থায়ী পত্নী করে রাখতে পারে না, সেখানে স্ত্রী পুরুষ সব সমান।"

"পুরুষের মত মেয়েরাও সমানে অস্ত্র ছুঁড়তে পারে?"

"হ্যাঁ, স্ত্রীর স্বতন্ত্রতা আছে।"

"কোথায় সে 'জনপদ' অমৃতাশ্ব—অঃ অমৃতাশ্ব!"

"তুমি আমায় অমৃত বল মধুরা! সে 'জনপদ' এখান থেকে পশ্চিমে, অনেক দূরে!"

"অমৃত, তুমি কি সেখানে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ, সেখানে স্ত্রী আজীবন স্বতন্ত্রভাবে থাকে, যেরকম জঙ্গলে মৃগ স্বতন্ত্র বিচরণ ক'রে, পক্ষী গাছের ওপর স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায়।"

"ওটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর 'জনপদ'? সেখানে কেউ স্ত্রীলোককে লুঠ করে না তো?"

"স্বাধীনা বাঘিনীকে জীবন্ত কে লুঠ করতে পারে ?"

"আর পুরুষ, অমৃত ?"

"পুরুষও স্বতন্ত্র।"

"ছেলেমেয়েরা ?"

"মধুরা! সেখানকার সংসার অন্যরকমের এবং সমস্ত গ্রাম নিয়ে একটি পরিবার।"

"সেখানে পিতার কর্তব্য কি ?"

"পিতা বলা যায় না মধুরা! সেখানে স্ত্রী কারুরই পত্নী নয়, স্বচ্ছন্দ তার প্রেম।"

"তাহলে সেখানে কেউ পিতাকে জানে না ?"

"ঘরের সমস্ত পুরুষই পিতা।"

"এ কেমন প্রথা ?"

"এই জন্যই সেখানে স্ত্রী স্বতন্ত্র, তারা যোদ্ধা, শিকারী।"

"আর গরু ঘোড়া পালন পোষণের কি ব্যবস্থা ?"

"গরু ঘোড়া জঙ্গলে পালা হয়, যেভাবে এখানে হরিণ পালা হয়।"

"আর ছাগল, ভেড়া ?"

"সেখানকার মানুষ পশুপালন জানে না। শিকার, মাছ এবং জঙ্গলের ফলমূল দিয়ে দিন কাটায়।"

"শুধু শিকার! তাহলে কি তাদের দুধ জোটে না ?"

"জোটে মানুষের দুধ, তাও আবার বাল্যকালেই।"

"ঘোড়াও চড়ে না ?"

"না। আর চামড়া ছাড়া তারা অন্য কিছু পরিধেয়ও জানে না।"

"তারা নিশ্চয় খুব কষ্ট পায় ?"

"তাহলেও সেখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বতন্ত্র। পুরুষের মতই স্বতন্ত্র। তারা ফল সংগ্রহ ক'রে, শিকার ক'রে, যুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে পাথরের কুঠার এবং তীর ছোড়ে।"

"আমিও এ পছন্দ করি। আমি অস্ত্র চালাতে শিখেছি কিন্তু যুদ্ধে পুরুষের মত যাওয়ার সুযোগ কোথায় ?"

"পুরুষরা একাজ নিজ হস্তে গ্রহণ করেছে। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া তারা পালন ক'রে। তারা স্ত্রীকে পশু-পত্নী নয়, গৃহপত্নী করেছে।"

"আর মেয়েদের লুঠবার উপযুক্ত করে তৈরী করেছে। সেখানে মেয়েদের লুঠ করা হয় না তো, অমৃত!"

"একটি 'জনে'র ছেলেমেয়ে সর্বদাই সেই 'জনে'র ভেতর থাকে। 'জনে'র বাইরে দেওয়াও হয় না, গ্রহণ করাও হয় না।"

"এ কি রকম প্রথা ?"

"সে সব এখানে চলতে পারে না।"

"তাই বলে মেয়ে লুঠ চলতে থাকবে ?"

"হ্যাঁ, মধুরা! কি বলছিলে?"

"কোন বিষয়?"

"আমার প্রেম সম্বন্ধে।"

"আমি তোমার বশীভূত, অমৃত!"

"কিন্তু আমি লুঠ ক'রে নিয়ে যেতে চাই না।"

"তুমি কি আমাকে যুদ্ধ করতে দেবে?"

"যতদূর পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভবপর।"

"আর শিকার করতে?"

"যতদূর আমার ক্ষমতা আছে।"

"বাস্?"

"কেননা আমাকে মহাপিতরের আদেশ পালন করতে হ'বে। নিজের দিক থেকে যদি বল মধুরা—তা আমি তোমাকে স্বাধীন মনে করব।"

"প্রেম করা না করার জন্যও।"

"প্রেম আমার সম্বন্ধ স্থাপন করছে। আচ্ছা তার জন্যেও।"

"তবে অমৃত! আমি তোমার প্রেম গ্রহণ করছি।"

"তাহলে আমি কুরু 'জনে' চলে যাব কি পক্‌থো 'জনে'?"

"যেখানে তোমার খুশী।"

অমৃত ঘোড়া ফিরিয়ে দিল এবং মধুরার নির্দেশিত পথে পক্‌থো গ্রামে পৌছল। গ্রামে কোন তাঁবুতে কেউবা মারা গিয়েছে। কেউ কোন কিছুতে জখম হ'য়েছে কারুর কন্যা লুণ্ঠিত হয়েছ। চারদিকে হল্লা হচ্ছিল। মধুরার মা কাঁদছিল এবং বাবা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। এসময় মধুরার ঘোড়া গিয়ে তাদের কেশ নির্মিত তাঁবুর বাইরে দাঁড়াল।

অমৃতাশ্ব নীচে নামার পর মধুরা লাফিয়ে পড়ল এবং অমৃতাশ্বকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল। হঠাৎ একাকী কন্যাকে সম্মুখে দাঁড়ান দেখে বাপ মা প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারল না। মা তাকে কোলে নিল, তার অশ্রুজলে মেয়ের মুখ ভেসে যেতে লাগল। সে শান্ত হলে পর বাবার প্রশ্নের উত্তরে মধুরা বলল, "বাহ্লীক পক্‌থো কন্যাদের লুঠ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে লুণ্ঠন করে যে নিয়ে যাচ্ছিল সে একটু পেছিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ি। ঠিক সে সময় একটি তরুণ অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হল, সে বাহ্লীককে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে জখম ক'রে মাটিতে ফেলে দিল। সেই কুরুতরুণ আমাকে এখানে পৌছিয়ে দিতে এসেছে।"

পিতা বলল, "সেই কুরুতরুণ তোমাকে নিয়ে যেতে চাইল না?"

"বলপূর্বক নয়।"

"কিন্তু আমাদের 'জনপদের' নিয়ম অনুসারে তুমি তার।"

"বাবা, আমি তাকে ভালবাসি !"

মধুরার পিতা বাইরে এসে অমৃতাশ্বকে অভ্যর্থনা করল এবং তাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেল। গ্রামবাসী এই কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করল কিন্তু সকলে সম্মান ও সহানুভূতির মধ্যে অমৃতাশ্ব মধুরাকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে বিদায় নিল।

৩

অমৃতাশ্ব তখন নিজ কুরু-গ্রামের মহাপিতর। তার পঞ্চাশাধিক অশ্ব, গরু ও অনেকগুলি ছাগল আর ভেড়া ছিল। তার চার ছেলে ও মধুরা ঘোড়ার পালন এবং গৃহকাজ দেখত। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর কিছু লোকও তার ওখানে কাজ করত। তবে তা ভৃত্যের মত নয়, ঘরের আপন লোকের ন্যায়। একজন কুরুকে আর একজন কুরুর সমতা স্বীকার করতে হত। অমৃতাশ্ব যে সব গ্রামে চলাফেরা করত সে সব গ্রামে পঞ্চাশটির অধিক পরিবার বাস করত। তাকে তাদের ঝগড়ার আপোষ এবং মামলার বিচার কবতে হ'ত। আবার জল, রাস্তা ঘাট এবং অন্যান্য সার্বজনিক কাজও তাকেই পরিচালনা করতে হ'ত। যুদ্ধ যা প্রায়ই ঘটত—তাতে মহাপিতরকে সৈন্যদলের প্রধানের কাজ করতে হ'ত। বস্তুত, যুদ্ধে সফলতা লাভ করলেই সে সময় মানুষ মহাপিতরের পদ লাভ করত।

অমৃতাশ্ব একজন বড় যোদ্ধা ছিল। পক্‌থো, বাহ্লীক ও অন্যান্য 'জনে'র যুদ্ধে সে পরিচয় দিয়েছিল নিজের বীরত্বের। মধুরাকে যে কথা সে দিয়েছিল সে তা পালন করেছিল। মধুরা অমৃতাশ্বের সঙ্গে শূয়োর, ভেড়া এবং বাঘ শিকারই শুধু করত না, পরন্তু যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করত। যদিও 'জনে'র লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এসব পছন্দ করত না—তারা বলত স্ত্রীলোকের কাজ হল ঘরে।

অমৃতাশ্বকে প্রথম যখন মহাপিতর নির্বাচন করা হ'ল সেদিন কুরু-পুরে মহোৎসব পালন করা হয়। সেদিন তরুণ-তরুণীরা অস্থায়ী প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। গ্রীষ্মের দিনে নদীর উপত্যকায় এবং পাহাড়ের ওপরে গরু ঘোড়ার পাল মনের সুখে বিচরণ করছিল। গ্রামবাসীরা ভুলেই গেল যে তাদেরও শত্রু আছে। পশু-ধন হ'তেই তাদের শত্রু সংখ্যা বেড়ে গেল। কুরুজন ভোল্‌গার তীরে যে যুগে বাস করত তখন তাদের নিকট পশু-ধন ছিল না। তাদের জঙ্গল থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে হ'ত। শিকার, মধু কিংবা ফল না পেলে তাদের অনাহারে থাকতে হ'ত। আর এখন! কুরুগণ আহারের জন্য কিছু পশু—গরু, ঘোড়া, ছাগল, গাধা ইত্যাদি স্থায়ীভাবে রাখে। তাদের শুধু মাংস, দুধ, চামড়াই নয় এই পশুগুলো পশমের বস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে। কুরু স্ত্রীগণ সুতো কাটতে আর কম্বল বুনতে কুশলী। তাদের এ কুশলতা সমাজে বেশী দিন পূর্ব সম্মান

অধিকার ক'রে থাকতে পারল না। এখন স্ত্রীর নয় পুরুষের রাজ্য। জন-নায়িকা জন-সমিতির নয়। পরন্তু বাহ্লীক মহাপিতরের শাসন, যাকে জনগণের প্রতি দৃষ্টি রেখে অনেক কিছু নিজের মন থেকে নির্ণয় করতে হ'ত। আর সম্পত্তি? স্ত্রীর রাজ্যে যেখানে একাধিক পরিবার একত্রে বাস করত, এক সাথে কাজ করত, সেখানে আজকের ভিন্ন ভিন্ন পরিবার, ভিন্ন ভিন্ন পশু-ধন এবং ভিন্ন ভিন্ন লাভ লোকসান। হ্যাঁ, সকলের বিপদের সময় জন আর একবার পুরানো 'জনে'র রূপ নিতে চাইত।

অমৃতাশ্ব মহাপিতর নির্বাচিত হ'ল। মহাপিতরের মহোৎসবে মত্ত 'জনে'র লোকেরা নিজেদের পশু-ধনের প্রতি কোন নজর রাখল না। বাদ্যের শব্দে নৃত্যপর তরুণরা কেবল সোম-সুরা এবং সুন্দরী তরুণীদের কথাই মনে করতে পারত। এক প্রহর রাত আর বাকি। কিন্তু, নৃত্য তখনও বন্ধ হওয়ার কোন উপক্রম নেই। ঠিক এই সময় চারদিক থেকে কুকুরগুলি জোরে চীৎকার করতে করতে উপত্যকার ওপরের দিকে ছুটছে দেখা গেল।

অমৃতাশ্ব সেই পুরুষদের ভেতর ছিল, যারা পরিমিত সোম পান করত, তারা ততটুকু পান করে আনন্দ পেত। তাদের চোখে লাল রং ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁস হয়ে পড়ে না। কুকুরগুলির শব্দ শুনে সে চুপ করে উঠে দাঁড়াল। কাঠের হাতলওয়ালা নিজের পাষাণ মুদ্গর বাগিয়ে নিল এবং নদীর তীর ধরে যেদিক হতে শব্দ আসছিল সেদিকে চলতে সুরু করল। সামান্য কিছুটা দূর অগ্রসর হওয়ার পর অস্তগামী চাঁদের আলোতে একটি স্ত্রীলোককে আসতে দেখা গেল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মূর্তি নিকটবর্তী হ'লে দেখা গেল—সে মধুরা। মধুরা তখনও ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিল, সে উত্তেজিত স্বরে বলল, "পুরু আমাদের পশুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

"তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আর আমাদের ছেলেরা নেশায় চুর! তুমি, কতদূর গিয়েছিলে, মধুরা?"

"গিয়েছিলাম ওদের পেছনে, অবশ্য একেবারে কাছে নয়—যতদূর থেকে দেখা যায় সেই পর্যন্ত!"

"আমাদের সমস্ত জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে যাচ্ছে?"

"ওদের বিলম্ব দেখে মনে হয়—চারদিকে ছড়ানো সমস্ত পশুদের একত্র করে নিয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি কি মনে করছ, মধুরা?"

"দেরি করবার তো আর সময় নেই।"

"আর আমাদের সব ছেলেরা নেশায় মত্ত!"

"যারা চলতে সক্ষম তাদের নিয়ে আক্রমণ করা চাই।"

"হ্যাঁ, এ কথা ঠিক্; কিন্তু, একটি কথা মধুরা! আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া উচিত নয়। এই খবরেই তো অর্দ্ধেক লোকের নেশা কেটে যাবে এবং বাকি লোকদের দই খাওয়াতে হবে। যখনই যার নেশা কেটে যাবে তখনই তাকে পাঠান চাই।"

"আর কুরু মেয়েরা ?"

"আমি কুরুদের মহাপিতর হিসাবে এই আদেশ দিচ্ছি, তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাক্ ! সেই প্রাচীন প্রথাকে আবার আমাদের জাগিয়ে তুলতে হ'বে।"

"আমি সামনে যাবার চেষ্টা করব না ; তবে আমাদের তাড়াতাড়িই করতে হবে।"

মহাপিতরের আদেশে বাজনা এক্‌দম বন্ধ হ'ল। নর-নারী মহাপিতরের চারদিকে জড়ো হ'ল। সত্যি সত্যিই গো-অশ্ব চুরির কথা শুনে তাদের মধ্যে অনেকেরই নেশা কেটে গেল। তাদের চেহারায় প্রণয়ের কোমলভাব কেটে গিয়ে বীরভাব প্রকাশ পেল, মহাপিতর মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল,—

"কুরু নর-নারীগণ! পুরু শত্রুর কাছ থেকে আমাদের ধন ছিনিয়ে নিতে হ'বে। যুদ্ধ হ'বে। তোমাদের মধ্যে যাদের চেতনা আছে, নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে ঘোড়-সোয়ার হও এবং আমাকে অনুসরণ কর, যারা নেশায় এখনো নিঝুম আছ, তারা মধুরার কাছ থেকে দই নিয়ে খাও আর নেশা কাটার সাথে সাথেই দৌড়ে এসো। কুরুনারীগণ! আজ তোমাদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে নির্দেশ দিচ্ছি। প্রাচীনকালের কুরু রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করত। একথা আমরা বৃদ্ধদের কাছে শুনে আসছি। আজ তোমাদেরই মহাপিতর অমৃতাশ্ব তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছে।"

মুহূর্তমধ্যেই চল্লিশটি ঘোড়া জড়ো করা হ'ল! পুরুরা যতগুলি পশু জড়ো করতে পেরেছিল তা তারা উপত্যকার অপর পারে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পুরো দু'ঘণ্টা ছোটবার পর উষার প্রথম আলো ফোটার সময় কুরুগণ তাদের দেখতে পেল। ঘোড়া আর গরুর দলগুলিকে একত্রিত ক'রে ওই পাহাড়ের ওপর হাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়াটা সহজ কাজ ছিল না। পুরু অশ্বারোহীগণ তাদের চামড়ার চাবুক বাতাস এবং পাথরের ওপর আঘাত করে পশুগুলিকে ভয়াতুর করছিল। অমৃতাশ্ব দেখল যে, পুরুরা সংখ্যায় প্রায় শ'খানেক হবে। মাত্র চল্লিশটি ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা উচিত কি অনুচিত তা নিয়ে বেশীক্ষণ অযথা মাথা ঘামাতে চাইল না।

শিংয়ের লম্বা ভল্ল বাগিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিল।

কুরু বীর এবং বীরাঙ্গনাগণ—হ্যাঁ, বীরাঙ্গনারা অর্ধেকের কম ছিল না—তারা নির্ভীক হ'য়ে সম্মুখে ঘোড়া ছুটাল। তাদের দেখা মাত্রই কিছু লোককে পশুগুলি আটকিয়ে রাখবার জন্য ছেড়ে দিল। পুরুগণ নীচের দিকে ছুটতে লাগল এবং ঘোড়ার পুরো সুযোগ গ্রহণের জন্য নদী তীরের একটি উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়িয়ে কুরুদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অমৃতাশ্বের সে মূর্তি তখন সত্যই দেখবার মত। অমৃতাশ্বের ঘোড়া অমৃত, এখন দু'জনকেই অভিন্ন বলে মনে হচ্ছিল। তার হরিণের সুতীক্ষ্ণ ভল্ল একবার যার শরীরে লাগত, দুবারের জন্য আর তাকে ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে হ'ত না। পুরুগণ ধনুর্বাণ ও পাষাণ-পরশুর ওপর বেশী নির্ভর করে ভুল করেছিল। যদি তাদের কাছে অত শিংয়ের ভল্ল থাকত তাহলে নিশ্চয়ই কুরুরা তাদের মোকাবিলা করতে পারত না। যুদ্ধ এক ঘণ্টা চলছে, কুরুগণ তখনও সংগ্রাম করছিল। কিন্তু তাদের এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা হতাহত হয়েছে।

এটাই হ'ল ভয়ের কারণ। ঠিক এই সময় ত্রিশজন কুরু অশ্বারোহী ছুটতে ছুটতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হ'ল। কুরুদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। পুরুগণ ভয়ানক ভাবে প্রাণ হারাতে লাগল। তাদের খারাপ অবস্থা দেখে যে অশ্বারোহীদের রুখবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারাও এসে হাজির হ'ল কিন্তু ঠিক্ এ সময় চল্লিশ জনের একটি কুরু নারীর দল নিয়ে মধুরা এসে হাজির হ'ল; দেড় ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হ'ল। অধিকাংশ পুরু হতাহত হ'ল আর কিছু পালিয়ে গেল।

আহতদের শেষ করে কুরুবাহিনী পুরুদের গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল। গ্রাম চার ক্রোশের ওপর। সমস্ত গ্রাম জনশূন্য। লোকজন তাঁবু ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের পশুগুলো এখানে-ওখানে বিচরণ করছে। সর্বপ্রথম কুরুদের বোঝাপড়া করতে হবে পুরুদের সাথে। পুরুগণ বিপন্ন হ'ল চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে। উত্তরের দিকে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধেও ছিল না। উপত্যকা ক্রমশঃই সংকীর্ণ হয়েছে আর চড়াইও ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু তবুও প্রাণের দায়ে নরনারী ঘোড়ায় ক'রে পালাচ্ছিল। অবশেষে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যে ঘোড়া আর সামনের দিকে চলতে পারে না। লোকজন পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। কুরুগণ তাদের খুব কাছে এসে পৌঁছল। বৃদ্ধ, স্ত্রী ও শিশুরা তাড়াতাড়ি এগুতে পাচ্ছিল না, তাই তাদেব পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিবার জন্য কিছু কুরু যোদ্ধা একটি সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড়াল। কুরু তাদের পুরা সংখ্যা কাজে লাগাতে পারছিল না। এজন্যই তাদের এই পুরুদের হাত থেকে রাস্তা উন্মুক্ত করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগল। পুরু এবং কুরু উভয় দলই পায় হেঁটে আসছিল। কিন্তু পুরুদের ভেতব পুরুষের সংখ্যা দশ বার জনের বেশী ছিল না। তাই তারা মাত্র অল্প দিনই পুরু পরিবারকে রক্ষা করতে পারে। তারা একদিন কিছু সাহসী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে একটি দুরূহ পথ ধরে ওই উপত্যকা ত্যাগ করল এবং পাহাড় পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। পুরুদের শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল—কুরুরা শেষ পর্যন্ত তাদের পাকড়াও করল। বন্দী করে রাখা তখনকার দিনে পিতৃ-যুগের আইন-বিরুদ্ধ কাজ ছিল। তাই শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত পুরুকুলকে তারা মেরে ফেলল এবং স্ত্রীগণকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পুরুদের সমস্ত পশুধনও তারা করায়ত্ত করল। এখন সেই হরিৎ নদীর উপত্যকার নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত কুরুদের চারণভূমি। এক-পুরুষ পর্যন্ত মহাপিতর একাধিক পত্নী গ্রহণ করবার বিধান দিলেন এবং এই সময় কুরুদের ভেতর সর্বপ্রথম সপত্নী দেখা গেল। *

* আজ থেকে দুশো পুরুষ আগেকার একটি আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর কাহিনী। তখন পশু-পালনই তাদের প্রধান জীবিকা ছিল।

পুরুহূত

দেশঃ বক্ষু উপত্যকা (তাজিকিস্তান)
জাতিঃ হিন্দি—ইরাণী ভাষাভাষী
কালঃ ২৫০০ খৃঃ পূঃ

বক্ষুর কলকল ধ্বনি মুখরিত ধারা মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। এর দক্ষিণতটে জলধারা থেকেই পাহাড় সুরু হয়েছে, কিন্তু বামদিক বেশী ঢালু হওয়ার দরুণ উপত্যকা প্রশস্ত ব'লে মনে হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে গাঢ়-সবুজ উত্তুঙ্গ—পাইন-বৃক্ষরাজির কালো ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় এদের সূচ্যগ্র পত্রবিশিষ্ট শাখাসমূহ, নীচে থেকে যা ক্রমশ ছোট হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে।—পাইন বৃক্ষ শ্রেণীর নীচে অন্যান্য রকমারি বৃক্ষরাজি বিরাজিত রয়েছে। গ্রীষ্মের শেষ, বর্ষা এখনও সুরু হয়নি।

বক্ষুর বাম-তট ধরে হেঁটে চলছিল একটি তরুণ, পরনে তার পশমের এক গাত্রাবরণ—তার উপর দিয়ে কয়েক ভাঁজে জড়ানো কোমরবন্ধনী। নীচে পশমের পাজামা এবং পায়ে বহুবিনুনী যুক্ত চপ্পল। মাথা থেকে টুপীটা খুলে পিঠের উপরকার ঝুড়ির ওপর রাখল সে, আর দীর্ঘ উজ্জ্বল পিঙ্গল কেশরাশি তার পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ে হাল্কা হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়তে লাগল। তরুণের কোমর থেকে চামড়ার খাপে মোড়া তাঁমার তরবারি ঝুলছিল পিঠের ওপর। পিঠের ওপর বৃক্ষ-শাখা-নির্মিত চোঙার আকারের ঝুড়ি, তার ভিতর অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে খোলা ধনুক এবং বাণ-পূর্ণ তূণীর রেখে দিয়েছিল। তরুণের হাতে একটি দণ্ড, সেটাকে ঝুড়ির নীচে ঠেকিয়ে দাঁড়ান অবস্থায়ই মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে নিচ্ছিল। অধিকতর চড়াই আরম্ভ হয়েছে এখন। তার সামনে দিয়ে ছ'টি মোটা মোটা ভেড়া চলেছিল, এদের পিঠের উপর ঘোড়ার লোমে তৈরী ছাতুভরা বড় বড় থলি। তরুণের পিছনে পিছনে আসছিল এক লাল রংএর লোমশ কুকুর। বিহগকুলের মধুর স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল পর্বত, তরুণের ওপরও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল এবং মুখ দিয়ে শিস্ দিতে আরম্ভ করেছিল সে।

একটি খাড়াইর ওপর থেকে এক সূক্ষ্ম রূপালী ঝর্ণার ধারা ঝরতে লাগল। খাড়াইর প্রান্তদেশ কেটে কে যেন কাঠের নালা তৈরী করে রেখেছিল। শ্রান্ত ভেড়ার পাল নীচে জল খেতে লাগল। তরুণ দেখল কাছেই আঙুর লতায় আঙুরের গুচ্ছ ঝুলছে। সেখানে বসে মাটিতে ঝুড়ি নামিয়ে আঙুর ছিঁড়ে খেতে লাগল—এখনও কাঁচা থাকার ফলে টক একটু বেশী ছিল। পাকতে এখনও মাসখানেক দেরি, তবু তরুণ পথিকের কাছে এই-ই ভাল লাগছিল। কাজেই এক একটি করে দানা সে মুখের ভেতর পূরেই চলেছিল।

সম্ভবতঃ সে অত্যন্ত পিপাসার্ত ছিল এবং তাড়াতাড়ি এসেই শীতল জল পান করা ক্ষতিকর মনে করে কিছুটা সময় অপেক্ষা করছিল সে।

জল খেয়ে ভেড়াগুলো চারদিককার সবুজ ঘাসের ওপর চরে বেড়াতে লাগল। লোমশ কুকুরটা অতিরিক্ত গরম বোধ করছিল, কাজেই সে তার প্রভু বা ভেড়ার পাল, কারও অনুকরণ না করে ঝর্ণার নীচে জলের মধ্যে বসে পড়ল। তার পেট এখনও জলভরা থলির মত ফুলে ফুলে উঠছিল এবং তার লম্বা লাল জিহ্বা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে থর থর করে কাঁপছিল। ঝরণার নিচে মুখ রেখে এক নিঃশ্বাসে তরুণ তার পিপাসাকে শান্ত করল, তারপর চোখে জল দিয়ে সামনের চুল গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। তার অরুণাভ গাল এবং লাল ঠোঁট দুটো ঢেকে ফেলবার জন্য সবেমাত্র পিঙ্গল রোমরাজি উদ্‌গম হতে আরম্ভ করেছে। খুশী মনে ভেড়াগুলোকে চরতে দেখে ঝুড়ির পাশে বসে পড়ল তরুণ, এবং কান খাড়া করে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা কুকুরের চোখের ভাব পরখ করে ঝুড়ির এক পাশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল সে, তারপর একখণ্ড ভেড়ার মাংস বের করে কোমরবন্ধনী থেকে প্রলম্বিত চামড়ার খাপে মোড়া ধারালো তামার ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কিছুটা নিজে খেল এবং কিছু কুকুরকে খাওয়াতে লাগল। এই সময় কাঠের ঘণ্টার খট্ খট্ আওয়াজ শোনা গেল! তরুণ দূর থেকে দেখল—ঝোপের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা অবস্থায় এক গাধাকে আসতে। তার পিছনে পিছনে এক ষোড়শী তরুণীকেও তারই মত পোষাক পরে এবং পিঠে ঝুড়ি নিয়ে আসতে দেখল সে। হাল্কাভাবে শিস্ দিতে লাগল তরুণ। যখনই কিছু ভাবতে থাকে সে, তার মুখ থেকে নিঃশ্বাসের মতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমনি শিসের আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে। ষোড়শীর কানে একবার অন্ততঃ শিসের আওয়াজ পৌঁছল, এবং সেইদিক লক্ষ্য করে তাকালও সে, কিন্তু তরুণের দেহ লতাগুল্মে আচ্ছাদিত ছিল। তরুণ যদিও পঞ্চাশ হাত দূর থেকে দেখেছিল, তবু ষোড়শীর মুখের হাল্কা অথচ সুন্দর এক ছাপ তার অন্তস্তলে রেখাপাত করেছিল, তাই উন্মুখ আগ্রহে এই কথা জানবার প্রতীক্ষায় বসে রইল সে, যে কোথায় চলেছে এই তরুণী। এধারে বক্ষুর উপরে আর কোনো বসতি নেই এ কথা তরুণ জানত, কাজেই সেও যে তারই মত পথচারিণী তাও বুঝতে পারল।

অপরিচিত ষোড়শীর সুন্দর রূপ দেখে কুকুরটা ভেউ ভেউ করতে সুরু করল, তরুণ "চুপ" বলতেই সেখানে চুপ করে বসে গেল সে। ষোড়শীর গাধা জল খেতে লাগল, তরুণী তার ঝুড়ি খুলতেই তরুণ এগিয়ে এসে শক্তহাতে সেটাকে নামিয়ে নিচে রেখে দিল। মৃদু হেসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তরুণী বলল,—

"বড্ড গরম আজ।"

"গরম নয়, চড়াই পেরিয়ে আসবার জন্য এ রকম মনে হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিলেই ঘাম শুকিয়ে যাবে।"

"এই সময়টাতে দিনগুলো বেশ ভাল থাকে।"

"এখন আর দশ-পনের দিনের মধ্যে বৃষ্টি হবার ভয় নেই।"

"বৃষ্টিকে আমার সত্যিই বড় ভয়। নালার জলে আর পিছল কাদায় রাস্তাগুলো এত বিশ্রী হয়ে যায়!"

"গাধাগুলোর পক্ষে পথ চলা আরও মুশকিল হ'য়ে পড়ে।"

"বাড়ীতে আমাদের ভেড়া নেই ব'লে আমি গাধাই নিয়ে বেরিয়েছি। আচ্ছা, বন্ধু, তুমি কোথায় যাবে?"

"পাহাড়ের ওপর, আজ কাল আমাদের ঘোড়া, গরু, ভেড়া সব ওখানেই আছে।"

"আমিও ঐখানেই যাচ্ছি। আমি ছাতু,…ফল, নুন—এই সব পৌছোতে যাচ্ছি।"

"তোমার পশুদের কে দেখছে সেখানে?"

"আমার বাবার ঠাকুর্দা, আর ভাইবোনেরাও আছে।"

"বাবার ঠাকুর্দা! তিনি তো খুবই বুড়ো হবেন?"

"খুবই বুড়ো। এত বুড়ো মানুষ বোধ হয় কোথাও দেখা যায় না।"

"তবে তিনি পশুদের কি ক'রে দেখবেন?"

"তিনি এখনও খুব শক্ত সমর্থ আছেন। তাঁর চুল, ভ্রূ সব সাদা হ'য়ে গেছে, কিন্তু দাঁত এখনও প্রায় নতুনের মত রয়েছে। দেখলে বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ব'লে মনে হয়।"

"তাহলে ত তাঁকে ঘরেই বসিয়ে রাখা উচিত।"

"তিনি রাজীই হন না। আমার জন্মের আগে থেকে তিনি গাঁয়ে যাননি কখনো।"

"গাঁয়ে যান নি!"

"যেতে চান না। গাঁ-কে তিনি ঘৃণা করেন। বলেন, মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্য জন্মায়নি। অনেক প্রাচীন কাহিনী আমাদের শোনান তিনি। আচ্ছা, তোমার নাম কী বন্ধু?"

"পুরুহূত মাদ্রীপুত্র পৌরব। আর তোমার নাম বোন?"

"রোচনা মাদ্রী।"

"তাহলে ত তুমি আমার মাতুল কুলের লোক, বোন! তোমরা উত্তরমদ্র না নিম্ন?"

"উত্তরমদ্র।"

বক্ষু নদীর বামতটে পুরুদের গ্রাম, কিন্তু তার নিম্নভাগ—যা নীচের সমতলভূমির সঙ্গে গিয়ে মিলেছে—মদ্রদের অধিকারে ছিল। দক্ষিণতটে উপরিভাগ মদ্র এবং নিম্নভাগ পরশুদের অধিকারে ছিল। ভূমি এবং জনসংখ্যার বিচারে পুরুরা মদ্রদের চেয়ে ছোট ছিল না। পুরুদের নিম্নে অবস্থিত মদ্রদের নীচমদ্র বলা হত! রোচনা উচ্চমদ্রের অংশ। পুরুহূতের মামার গ্রামও উপরের মদ্রে অবস্থিত।

এই সব কথা জানবার পর দুজনেই আরও অধিক আত্মীয়তা অনুভব করল। পুরুহূত আবার কথা সুরু করে বলল—

"রোচনা, আজ কিন্তু আমরা পাহাড়ের ওপর পৌছতে পারব না। একলা আসবার সাহস তুমি কোত্থেকে পেলে?"

"হ্যাঁ, আমি জানতাম যে রাতের বেলায় চিতাবাঘের হাত থেকে গাধাগুলোকে বাঁচানো মুশকিল. কিন্তু বুড়ো মানুষটির জন্য খাওয়ার জিনিস আনবার দরকার ছিল পুরুহূত। আমার উপর তিনি অনেকখানি ভরসা করেন। আমি ভেবেছিলাম যে রাস্তায় আরও কেউ হয়ত জুটে যাবে, আজকাল ত ওপরে যাবার লোক বহু থাকে। আর এও মনে করেছিলাম যে আগুন জ্বালিয়ে নিলেই কাজ চলে যাবে।"

"রাস্তায় চলতে চলতে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। চকমকি আছে কি তোমার কাছে, রোচনা?"

"আছে।"

"থাকলেও চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানো সহজ কাজ নয়। যাহোক, আমার কাছে এক পবিত্র চকমকি আছে, পিতামহের আমল থেকে আমাদের ঘরে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে। এই চকমকির আগুনে বহু যজ্ঞ, বহু দেবপূজার অনুষ্ঠান হয়েছে। অগ্নিদেবতার মন্ত্রও আমার জানা আছে, কাজেই এ দিয়ে তাড়াতাড়িই আগুন জ্বলে যায়।"

"তা ছাড়া আমরা এখন দুজন, পুরুহূত, কাজেই আমাদের সামনে আসবার মত সাহস চিতাবাঘের হবে না।"

"আর আমার কুকুরও ত রয়েছে, রোচনা।"

"কুকুর!"

"হ্যাঁ, আমার এই লাল শিকারী কুকুর।"

কুকুরটাকে ডাকতেই সে দাঁড়িয়ে তার প্রভুর হাত চাটতে লাগল। রোচনাও আদর করে ডাকল তাকে। সে এসে তার গা শুঁকতে লাগল, তারপর রোচনা যখন তার পিঠে হাত দিল তখন লেজ নাড়তে নাড়তে সে তার পায়ের ওপর বসে পড়ল, পুরুহূত বলল, "ও খুব বুদ্ধিমান কুকুর, রোচনা।"

"খুব বলিষ্ঠও বটে।"

"হ্যাঁ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা কাউকেই ভয় করে না।"

ভেড়া এবং গাধাগুলো এতক্ষণে প্রচুর ঘাস খেয়ে নিয়েছে, ক্লান্তিও দূর হয়ে গেছে, তাই তরুণ দুই পথিক আবার পথ চলা সুরু করল। কুকুরটা তাদের পিছনে পিছনে চলল। চলার পথ যদিও এঁকে-বেঁকে তেরছাভাবে ওপরে উঠেছে, তবুও চড়াই অত্যন্ত কঠিন ছিল, এজন্য অত্যন্ত সাবধানে এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে চলেছিল তারা। পুরুহূত কখনও মাটির উপর গজানো সরস লাল স্ট্রবেরী ফল, কখনও বা করমচা ফল ছিঁড়ছিল এবং রোচনাকেও তার ভাগ দিচ্ছিল। ভাল ভাল ফলগুলো এখনও তেমন পাকেনি, পুরুহূতকে কিছুটা নিরাশ হতে হল তাই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনি আলাপ করতে করতে ওপরে উঠল। ঘন গুল্মরাজির নীচ দিয়ে কল-কল স্বরে ধাবিত এক ঝর্ণাধারা তাদের নজরে এল, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাশেই একটুখানি খোলা জায়গা, সেখানে পড়ে রয়েছে আধপোড়া কাঠের

টুকরো, ছাই আর ঘোড়ার নাদ। পুরুহূত ঝুঁকে পড়ে ছাইগুলো নাড়া দিল, ওর ভিতর আগুন চাপা ছিল। খুব খুশী হয়ে সে বলল,—

"রোচনা, রাতের বিশ্রামের জন্য এর থেকে ভাল জায়গা সামনে আর পাওয়া যাবে না, কাছেই জল রয়েছে, আর আছে প্রচুর ঘাস এবং শুকনো কাঠ, এ ছাড়াও সকালে এখান থেকে যে সব পথিক রওনা হয়েছে, তারা ছাই চাপা দিয়ে আগুনও রেখে গেছে।"

"হ্যাঁ পুরুহূত, এর চেয়ে ভাল জায়গা পাওয়া যাবে না। আজ এখানেই থাকব। পরের ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

পুরুহূত বসে পড়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঝুড়িটা নীচে নামিয়ে পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল, তারপর রোচনার ঝুড়িটা নামাল। দু'জনে মিলে গাধাগুলোর পিঠ থেকে বোঝা নামাল এবং তাদের জিন্ খুলে দিল। গাধাগুলো দু-তিনবার গড়াগড়ি খেয়ে ঘাসে চরতে চলে গেল। ভেড়ার বোঝা নামাতে কিছুটা দেরি হল, কারণ তাদের জোর করে ধরে আনতে হয়েছিল। মশক (জল ভরবার চামড়ার থলি) হাতে রোচনা ঝর্ণায় জল ভরতে গেল। পুরুহূত পাতা এবং কাঠের টুকরো দিয়ে আগুন জ্বালাল, তারপর বড় বড় কাঠের খণ্ড দিয়ে বড় রকমের অগ্নিকুণ্ড তৈরী করল। রোচনা যখন জল নিয়ে ফিরল, তখন পুরুহূত এক তামার পাত্র সামনে রেখে গরুর একখণ্ড পা ছুরী দিয়ে কাটছে। রোচনাকে দেখে সে বলল,—

"কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমরা ওপরে পৌঁছে যাবো রোচনা। তোমার বাথান ত তবে আর বেশী দূর হবে না?"

"পাহাড়ের মাথায় আমরা যেখানে পৌঁছাই, সেখান থেকে তিন ক্রোশ পূবে।"

"আর আমার দু'ক্রোশ পূবে। তাহলে ত তোমার বাবার ঠাকুর্দার বাথান আমার যাবার পথেই পড়বে।"

"তুমিও তবে তাঁকে দেখতে পাবে। তাঁর সঙ্গে কী করে তোমার দেখা হবে এইটেই ভাবছিলাম।"

"আর ত মাত্র এক দিন আছে, একটা ঠ্যাং-ই যথেষ্ট একদিনের জন্য। এটা পিছনের ঠ্যাং রোচনা, এটা বাঁজা গরুর।"

"আমার কাছেও বাছুরের আধখানা ঠ্যাং আছে, আজকাল মাংস বেশীদিন রেখে দিলে দুর্গন্ধ হয়।"

"নুন দিয়ে মাংস রাঁধলে কী রকম হবে?"

"খুব ভালো হবে। আর আমার কাছে গুড়ের রসও রয়েছে, পুরুহূত। মাংস, গুড়ের রস আর শেষে কিছুটা ছাতু মিশিয়ে দিলেই চমৎকার সুপ তৈরী হয়ে যাবে। শুতে যাবার আগেই তৈরী সুপ খেয়ে যাবো আমরা।"

"আমি একলা হলে সুপ বানাতাম না রোচনা, বড় সময় লাগে ওতে। কিন্তু এখন সেই সময়টা আমরা পশুগুলোকে বাঁধতে এবং কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দেব।"

"বাবার ঠাকুর্দা আমার স্যুপ বড়ই পছন্দ করেন পুরুহূত। আর এই তামার কড়াই, কী সুন্দর এটা!"

"হ্যাঁ, তামার অনেক দাম রোচনা। এই কড়াইর পিছনে একটা ঘোড়ার দাম খরচ হয়েছে; কিন্তু রাস্তায় বেশ কাজে আসে এগুলো।"

"তোমার ঘরে নিশ্চয়ই তাহলে অনেক পশু আছে পুরুহূত?"

"হ্যাঁ, আর অনেক ধানও আছে রোচনা। এইজন্যই ত এক ঘোড়ার মূল্যের এই কড়াই। আচ্ছা নাও এইবারে মাংস কাটা আমার শেষ হয়ে গেছে। জল আর নুন দিয়ে মাংস আগুনে চড়িয়ে দাও, আর আমি ওই দিকটাতেও কাঠের আগুন তৈরী করি। তারপর কিছু ঘাস কেটে গাধা আর ভেড়াগুলোকে এর মাঝখানে বাঁধতে হবে আমাদের। জানো ত আমাদের কাছে বাছুরের মাংস যেমন লাগে, চিতার কাছে গাধার মাংস তার চেয়েও মিষ্টি লাগে।—আর তুইও ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে চাটতে থাক"—কুকুরের দিকে তাকিয়ে বলল সে, আর কিছুটা মাংসসমেত একটা হাড় কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দিলো পুরুহূত। কুকুরটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে পায়ের নীচে হাড়ের টুকরো চেপে দাঁত দিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল।

পুরুহূত ওপরের গাত্রবাস এবং কোমরবন্ধনী খুলে ফেলল। হাতাবিহীন জামার নীচে তার প্রশস্ত বক্ষ এবং পেশীপূর্ণ বাহুযুগল জানিয়ে দিতে চায় এই বিশ বছর বয়স্ক তরুণের দেহে অপরিসীম শক্তি আছে। কাজ করবার সময় পুরুহূতের রোমরাজি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ঝুড়ির ভিতর থেকে কোদাল বের ক'রে এক লহমার ভিতরে একগাদা ঘাস জমা ক'রে ফেলল সে। তারপর কান ধ'রে গাধাগুলোকে নিয়ে এসে খুঁটো গেড়ে বাঁধল এবং তাদের সামনে ঘাস ছড়িয়ে দিল। ভেড়াগুলোরও এই ব্যবস্থাই করল।

কাজ শেষ ক'রে পুরুহূতও এখন আগুনের কাছে এসে বসল। কড়াই থেকে সিদ্ধ মাংসখণ্ড তুলে চামড়ার ওপরে রাখতে যাচ্ছিল রোচনা। পুরুহূত ঝুড়ির ভিতর থেকে একটুকরো চামড়া বের ক'রে বিছিয়ে দিল। তারপর কাঠের এক সুন্দর চষক (পেয়ালা) এবং জন্তুর পেটের চামড়ায় তৈরী বোতল বের ক'রে রাখলো, সেই সঙ্গে বাঁশীটাও বেরিয়ে মাটিতে প'ড়ে গেল। যেন কোন কোমল শিশু মাটিতে প'ড়ে গেছে এবং ব্যথা লাগবার ভয়ে তার মা কেঁপে উঠছে—এমনিভাবে তাড়াতাড়ি বাঁশীটাকে তুলে কাপড়ে মুছল সে। তারপর তাকে চুমু খেয়ে ঝুড়ির ভিতর রাখতে গেল। রোচনা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। সে বলে উঠল, "পুরুহূত, তুমি বাঁশী বাজাতে পার?"

"এই বাঁশী আমার বড়ই প্রিয়, রোচনা, আমার প্রাণটাই যেন এই বাঁশীর সঙ্গে বাঁধা।"

"আমাকে বাঁশী শোনাও পুরুহূত।"

"এখন না, খাওয়ার পরে।"

"এখন একটু শোনাও, খাওয়ার পরে আবার শুনব।"

"আচ্ছা—" ব'লে পুরুহূত বাঁশীতে ঠোঁট লাগিয়ে আটটি আঙুল যখন তার ছিদ্রগুলোর ওপর দিয়ে চালাতে সুরু করল, তখন বিশাল বৃক্ষরাজির ছায়া থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দ পদ-

সঞ্চারী সন্ধ্যার অন্ধকার আর স্তব্ধতার মাঝে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করা সেই মধুর ধ্বনি চারদিকে মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল। রোচনা সমস্ত কিছু ভুলে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সেই ধ্বনি। কোন্ উর্বশীর বিয়োগব্যথায় ব্যাকুল পুরূরবার বেদনাপূর্ণ গান বাঁশীতে বাজিয়ে চলেছিলো পুরুহূত। গান শেষ হ'য়ে গেলে রোচনার মনে হ'লো যেন স্বর্গ থেকে সোজা ধরণীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। আনন্দাশ্রু পূর্ণ চোখে সে বলল—

"তোমার বাঁশীর গান বড় মধুর পুরুহূত, বড়ই মধুর। আমি এমন বাঁশী কখনও শুনি নি। কি সুন্দর এই সুর!"

"লোকে এই কথাই বলে রোচনা, কিন্তু আমি তা' বুঝতে পারি না। বাঁশীতে ঠোঁট লাগানোমাত্রই আমি সব কিছু ভুলে যাই। এই বাঁশী যতক্ষণ আমার কাছে থাকে, ততক্ষণ পৃথিবীর কোন কিছুই আমি চাই না।"

"আচ্ছা—এস পুরু, নইলে মাংস জুড়িয়ে যাবে।"

"আর রোচনা, আমি যখন রওনা হই, তখন মা এই দ্রাক্ষাসুরা দিয়েছিলেন, অল্পই আছে, কিন্তু মাংসের সাথে পান করলে বেশ লাগবে।"

"সুরা তোমার খুব প্রিয়, পুরু?"

"প্রিয় বলা যায় না, রোচনা। প্রিয় জিনিসে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমার চোখদুটো একটু লাল হ'য়ে উঠলেই আমি আর এক ঢোকও পান ক'রতে পারি না।"

"আমারও ঠিক্ এমনিই মনে হয় পুরু। নেশায় চুর হওয়া লোক দেখলে আমার বড় ঘৃণা হয়।"—বলতে বলতে রোচনা নিজের কাঠের পেয়ালা বের ক'রে নীচে রাখল।

তিনভাগের একভাগ মাংস কুকুরকে দেওয়া হয়েছিল। ওরা দুজন অনেক দেরীতে পানাহার শেষ করল। চারদিকে ঘন অন্ধকারের আস্তরণ ছড়িয়ে পড়েছে। মোটা কাঠের গনগনে আগুনের লাল আভা আর তার আশ-পাশের কিছুটা জায়গা ছাড়া আর কিছুই সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। তবে কিছু আওয়াজ সে সময়ে শোনা যাচ্ছিল,—মনে হয়, ছোট পোকামাকড়ের ডাক। গল্প-গুজব এবং মাঝে মাঝে বাঁশী বাজানো চলতে লাগল। শেষে ছাতু দিয়ে কয়েকঘণ্টার ভিতরে পুরোপুরি সুপও তৈরী হয়ে গেল। দু'জনেই নিজ নিজ পেয়ালা থেকে গরম গরম সুপ পান ক'রল। অনেক রাত হয়ে গেলে ওরা ঠিক করল ঘুমোবে। চামড়ার বিছানা তৈরী ক'রে রোচনা নিজের পরিচ্ছদ খুলতে লাগল। পুরুহূত আগুনের উপর আরও কাঠ সাজিয়ে দিল, পশুগুলোর সামনে ঘাস এগিয়ে দিল, তারপর বনদেবতাদের কাছে প্রার্থনা শেষ ক'রে পরিচ্ছদ খুলে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠে দুজনেই অনুভব করল যেন একরাত্রির ভিতরেই দুজনের মধ্যে সহোদর ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। রোচনা উঠবার পর পুরুহূত নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, এবং বলল,—

"তোমার মুখে আমার চুমু দিতে ইচ্ছা করছে, রোচনা বোন!"

"আমারও, পুরু! এ জগতে আমরা পরস্পর ভাইবোন।"

রোচনার বিস্রস্ত এলো চুলের রাশি পিছনের দিকে সরিয়ে এনে পুরুহূত তার গালদুটোতে চুমু দিয়ে দিল, দুজনের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং চোখ জলে ভরে এল।

এর পর মুখ ধুয়ে সামান্য ছাতু এবং শুকনো মাংস খেয়ে পশুগুলোর পিঠে বোঝা চাপিয়ে যাত্রা করল তারা। মাঝে মাঝে দু' তিন জায়গায় তারা বসেছিল, কিন্তু কথায়-বার্তায় সময় এত তাড়াতাড়ি কেটে গিয়েছিল যে, তাদের মনেই পড়েনি কবে ওপরে গিয়ে পৌছবে, আর কবেই বা মাদ্র-প্রপিতামহের কাছে!

রোচনা পুরুহূতের পরিচয় দিলে তিনি পুরুদের বীরত্বের প্রশংসা করতে করতে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।

২

এই পাহাড় চূড়ায় মদ্রদের এক ছোটখাট গ্রাম রয়েছে—যার সমস্ত ঘরই তাঁবু অথবা খড়ের ছাউনি। যেখানে নীচের দিকে ঢালু এবং খাড়া পাহাড়ের ওপর কেবল ঘন পাইনের জঙ্গল দেখা যায়, সেখানে এই পর্বত চূড়ায় বৃক্ষের লেশমাত্র নেই। এখানে ভূমি অধিকতর সমতল, যার ওপরে সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা বিস্তৃত রয়েছে। এই সবুজ ভূমিব কোথাও ভেড়া, কোথাও গরু, কোথাও বা ঘোড়ার দল চরে বেড়াচ্ছিল। এদেরই মধ্যে কোথাও কোথাও এদেরই ছোট ছোট বাচ্চারাও লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছিল। এই সমতল ভূমিকে দেখেই মাদ্রবাবা বলেছিলেন—"মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্য জন্মলাভ করে নি।" মাদ্রবাবার তাঁবু এখানেই পড়েছে এ মাসে। ঘাস কমে গেলে তিনিও অন্য জয়েগায় চলে যাবেন। এখানে দুধ, দই, মাখন এবং মাংসের প্রাচুর্য রয়েছে। তাঁবুর ভিতরে এই সব জিনিসই বোঝাই হয়ে রয়েছে। পনেরো বিশ দিন অন্তর গ্রাম থেকে লোক এসে এখান থেকে মাখন এবং মাংস নিয়ে যায়। শীতের দিনে এই পাহাড় চূড়ায় বরফ পড়তে থাকে। প্রপিতামহ তখন যেখানকার সেখানেই থেকে যান। কিন্তু পশুরা বরফ খেয়ে থাকতে পারে না, এজন্য তিনি আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে কিছুটা নীচে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে চলে আসেন। আর পশুরা চলে যায় নীচের গ্রামে। বৃদ্ধকে কিন্তু গ্রামে যাওয়ার কথা বললেই তেড়ে মারতে আসেন।

বেলা থাকতে থাকতেই দুই পথিক তাঁর তাঁবুতে পৌছে গেল। জিনিসপত্র নামিয়ে নেবার পর বৃদ্ধ সফেন ঘোড়ার দুধে ভরা কাষ্ঠ পেয়ালা তাদের সামনে রাখলেন, তিন-চার পেয়ালাতেই পথের সকল ক্লান্তি দূর হল। সন্ধ্যার সময় রোচনার ভাই-বোন এবং গাঁয়ের অন্যান্য তরুণ রাখালেরা ঘোড়া, গরুর বাছুর নিয়ে এসে পড়ল। এদিকে রোচনা

তার সেই বুড়ো প্রপিতামহের কাছে পুরুহূতের বাঁশীর প্রশংসা করছিল। তাঁর মত গম্ভীর লোকও পুরুহূতকে ছাড়তে রাজী নন। তিনি এবং গোষ্ঠীর সমস্ত তরুণই বাঁশী অত্যন্ত ভালবাসে। রাত্রে যখন নৃত্যানুষ্ঠান চলল, পুরুহূতও তখন তার বাঁশীর যাদু দেখিয়ে দিল।

সকালে উঠে পুরুহূত যাবার কথা বল্ল, কিন্তু তিনি তাকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দেবেন কেন। দুপুরের খাওয়ার পরে তিনি নিজের কথা আরম্ভ করলেন এবং কথারম্ভ হল ঝুড়ির পাশে পড়ে থাকা তামার কড়াইকে কেন্দ্র করে। বৃদ্ধ বললেন,—

"এই তামা এবং ক্ষেতগুলোকে দেখলে আমার সারা অন্তর জ্বলে ওঠে। যখন থেকে বক্ষু তটে এই সব জিনিসের আমদানী হয়েছে, তখন থেকে চারদিকে পাপ-অধর্ম ছেয়ে গেছে, দেবতারাও রুষ্ট হয়েছেন, অধিক মহামারী বেড়ে গিয়েছে,—প্রবল হয়ে উঠেছে হানাহানি।"

"তাহলে কি আগে এসব জিনিস ছিল না বাবা ?"—পুরুহূত প্রশ্ন করল।

"না বাবা, এই সব জিনিস আমার ছোটবেলাতেই সুরু হয়েছে একটু একটু করে। আমার ঠাকুর্দা তো এ সবের নাম পর্যন্ত শোনে নি, সে সময় সমস্ত কিছুই পাথর, হাড়, শিং কিম্বা কাঠ থেকে তৈরী হত।"

"কাঠ কী করে কাটতো বাবা ?"

"পাথরের কুড়ুল দিয়ে।"

"তাহলে ত' অনেক সময় লাগত, আর এত সুন্দর করেও ত কাটা যেত না নিশ্চয়ই ?"

"এই তাড়াহুড়োর তাগিদই ত সমস্ত কাজ মাটি করেছে, এখন তোমরা ছ' মাসের খাবার অথবা অর্ধেক জীবন কাটাবার মত একটা ঘোড়া দিয়ে একখানা তামার কুড়ুল নাও, তারপর জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে উজাড় কর অথবা গাঁ-এর পর গাঁ-কে নিশ্চিহ্ন করে ফেল! কিন্তু গাঁগুলো জঙ্গলের গাছ-গাছালির মত নিরস্ত্র নয়। তাদের কাছেও অমনি শক্তিশালী কুড়ুল রয়েছে। এ তাম্র-কুঠার যুদ্ধকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে। এঁর আঘাতে বিষাক্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়। আগে তীরের ফলা পাথরে তৈরী হত, তা এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না ঠিকই; কিন্তু কুশলী হাতে পড়লে ওতেই অনেক বেশী কাজ হত। এই তামার ফলা দিয়ে দুধের ছেলেরা, বাঘ শিকার করতে চায়। এখন আর লোকে কুশলী ধনুর্ধর হতে চাইবে কেন ?"

"তোমার একটা কথার সঙ্গে আমি একমত বাবা,—মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্য জন্মায়নি।"

"হ্যাঁ, বাছা, প্রথম দিনের ময়লার উপর রোজ রোজ ময়লা ফেলা খুবই খারাপ। আমাদের তাঁবু আজ এখানে রয়েছে। পশুরা এখানকার ঘাস খেয়ে ফেলবে। এর আশে পাশে মানুষ এবং পশুর মলমূত্র জমে উঠতে থাকবে, আর সেই সময় আমরা এই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাব। সেখানে নতুন নতুন সবুজ ঘাস প্রচুর মিলবে, সেখানকার মাটি, জল হাওয়া অনেক বেশী নির্মল হবে।"

"হ্যাঁ বাবা, আমিও এমনি ভালবাসি—এই মাটিতেই আমার বাঁশীর স্বর আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে।"

"ঠিক্ বলেছো বাছা! আগে আমরা এই তাঁবুর মেলাকেই গাঁ বলতাম, আর এইসব মেলা এক জায়গায় একবছর কেন তিনমাসও থাকত না, কিন্তু এখনকার গাঁ পুত্র-পৌত্র এমন কি একশ' পুরুষের বসতি হিসেবে তৈরী হচ্ছে। পাথর, কাঠ আর মাটির দেওয়াল তোলা হয়, যার ফলে ভিতরে হাওয়া ঢুকতে পারে না। পাথর, কাঠ আর খড়ের চাল বিছানো হয়, এর ভিতর দিয়ে হাওয়া ঢুকতে পারে কখনো? অগ্নিকে দেবতা বলা, বায়ুকে দেবতা বলা আজ শুধু মুখের কথায় দাঁড়িয়ে গেছে, আজ আর আমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য সেই শ্রদ্ধা-সম্মান সঞ্চিত নেই। এই জন্যই এখন বহু নতুন নতুন রোগের উৎপত্তি হয়। হে মিত্র, হে আদিত্য, হে অগ্নি! তুমি যে এই মানবকুলের ওপর ক্রোধ বর্ষণ করছ, সে ঠিকই করছ।"

"কিন্তু বাবা, এই তামার কুড়ুল, তামার খাঁড়া, তামার শল্য ছাড়া আমরা কী করে বেঁচে থাকব? এসব ত্যাগ করলে শত্রুরা আমাদের একদিনেই খেয়ে ফেলবে।"

"আমি স্বীকার করি বাছা, দু' মাসের আহার অথবা আজীবন কাটবার মত ঘোড়া খুশী মনে বেচে লোকে তামার খাঁড়া কেনেনি। ঐ নীচমদ্র এবং পরশুরাও বক্ষু মাতার গায়ে কলংকের দাগ লাগিয়েছে। বক্ষু নদী কতদূর পযন্ত বয়ে চলে, আমি তা জানিনা, কেউ-ই জানেনা। মিথ্যাবাদীরা অবশ্য বলে যে পৃথিবীর প্রান্তে যে অপার জলরাশি রয়েছে সেখানেই যায় এ। একথা আমরাও জানি যে, মদ্র আর পরশুদের ভূমি-দেশ শেষ হতেই বক্ষু নদী পাহাড় ছেড়ে সমতলভূমিতে চলে যায়, আর তারপরেই হলো মিথ্যাবাদী দেবশত্রুদের দেশ। তারা বলে সেখানে নাকি বড় বড় ঠ্যাংওয়ালা ছোটো-খাটো পাহাড়সদৃশ জন্তু আছে, কী যেন তাদের নাম বাবা? স্মৃতিশক্তি এখন ক্ষীণ হয়ে আসছে আমার।"

"উট বলে বাবা। কিন্তু সে পাহাড়ের মত উঁচু হয় না। এক দিন এক নীচমাদ্র উটের বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। বললো ছমাসের বাচ্চা আকারে সে ত আমাদের ঘোড়ার মতই ছিল।"

"হ্যাঁ বাছা, বাইরের দেশ থেকে যারা ঘুরে আসে, তারা বড় বেশী মিথ্যা বলতে শেখে। তারা বলত—কী যেন ওর নাম?"

"উট?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ উট, বলত উটের গলা এত লম্বা হয় যে, সে বক্ষুর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের ঘাস খেতে পারে। এও ত মিথ্যা কথা, না বাবা?"

"হ্যাঁ বাবা, সেই বাচ্চার গলাও ঘোড়ার থেকে সত্যিই লম্বা ছিল; কিন্তু ঘাস খাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

"এই মিথ্যাবাদী মাদ্র এবং পরশুরাই তামার কুড়ুল, তামার খাঁড়ার জিগীর তুলেছে। পরশুরা আমাদের উত্তর-মদ্রের উপর এইসব অস্ত্র নিয়েই হামলা করেছিল। এ ঘটনা ঘটে

আমার আমলে। আমাদের লোকেরাও নীচমদ্রের কাছ থেকে তুটো করে ঘোড়ার বিনিময়ে তামার কুড়ুল কিনেছিল।"

"তামার কুড়ুল-এর সামনে পাষাণ-কুঠার ত কিছুই কাজের নয়, তাই না বাবা ?"

"হ্যাঁ একেবারে কিছুই নয় বাছা! এই জন্যই ত বাধ্য হয়ে আমাদের তাম্র-অস্ত্র নিতে হয়েছিল। আর যখন পুরুদের উপর নীচমদ্ররা আক্রমণ চালাল, তখন তোমাদের লোকেরা আমাদের এই মদ্রদের কাছ থেকে তাম্র-অস্ত্র খরিদ করল। উত্তর মদ্র এবং পুরুদের মধ্যে কখনো ঝগড়ার খবর শোনা যায়নি বাছা। কিন্তু পরশু এবং নীচমদ্ররা সব সময়েই দস্যুবৃত্তি চালিয়ে এসেছে সর্বদাই পুরানো ধর্মকে ছেড়ে নতুন নতুন কথা বলেছে, আর তারই ফলে আমাদের লোকদেরও প্রাণ রক্ষার জন্য সেই একই ব্যাপার করতে হয়েছে। আমি বুঝি যে যতক্ষণ পর্যন্ত নীচমদ্র এবং পরশুগণ তামার অস্ত্রপাতি ত্যাগ না করে, ততক্ষণের মধ্যে আমাদের উপরের অধিবাসীদের পক্ষে সে সব ত্যাগ করা আত্মহত্যারই সামিল। কিন্তু তামার এতটা প্রসার যে খুবই খারাপ, তাতে ত সন্দেহ নাই বাছা! আর এই পাপের প্রসারে সাহায্য করছে এই তুটো দল, দেবতার আশীর্বাদ এরা কোনো দিনই পাবে না। ঘোর অন্ধকারময় পাতালে প্রবেশ করতে হবে, এদের নিশ্চয়ই হবে। এদের দেখাদেখি এদেরই ভয়ে আমাদের মাটি-পাথরের গ্রাম তৈরী হয়েছে আগে—আজ এখানে কাল ওখানে সরিয়ে নেওয়ার মত এইসব তাঁবুর গ্রাম ছিল বক্ষু উপত্যকার গায়ে। কিন্তু এই মদ্র আর পরশুরা এই ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়ে এইসব তামার অস্ত্র দিয়ে মাটি মায়ের বুক চিরে দেবার বুদ্ধি এরা কোত্থেকে পেল! এমন পাপ কেউ কখনো করেনি। মাটিকে আমরা না, মা বলি বাছা।"

"হ্যাঁ বাবা, মাটিকে মা বলি, দেবী বলি, তাকে পূজাও করি।"

"আর সেই মাটি মায়ের বুক নিজ হাতে চিরে দিয়েছে এই সব পাপীরা। আরও কী করেছে—নাম ভুলে যাচ্ছি, স্মৃতিশক্তি ঠিক কাজ করছে না বাছা।"

"কৃষি, চাষ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কৃষি আর চাষ চালু করেছে ওরা, গম বোনা, ধান বোনা এ সব আজ পর্যন্ত শোনাই যায়নি আগে। আমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো মাটি মায়ের বুক চেরেনি, কখনো দেবীর অপমান করেনি। মাটি মা আমাদের পশুকুলের আহারের জন্য ঘাস দিত। তার জঙ্গলে রকমারী মিষ্টি ফল ছিল, আমরা খেলেও সেসব ফুরাতো না। কিন্তু এই মদ্রদের পাপ আর তার দেখাদেখি আমাদের কৃত পাপের ফলে সেই একমানুষ উঁচু ঘাস আজ কোথায়? আগেকার মত সেই বড় বড় গরু, যা দিয়ে একটা গোটা মদ্র-গোষ্ঠীর একদিনের পর্যাপ্ত আহার হয়ে যেত, তা এখন কোথায়, সেই গরু, সেই ঘোড়া, সেই ভেড়া কিছুই নেই। জঙ্গলের হরিণ আর ভালুকও এখন আর অত বড় হয় না। মানুষ আর আগের মত অত দিন বাঁচে না। এই সবই ধরিত্রী দেবীর কোপের ফল বাছা! তাছাড়া আর কিছুই নয়।"

"বাবা, আপনি কতগুলো শীত দেখেছেন ?"

"একশ'র উপরে বাছা! একসময়ে আমাদের গাঁয়ে দশটি তাঁবু ছিল, আর এখন মাটি-পাথরের দেয়ালে তৈরী একশ' ঘর হয়ে গেছে সেখানে।—যখন ক্ষেত ছিল না, তখন আমাদের চলতি-ফিরতি ঘর, চলতি-ফিরতি গাঁ হত, কিন্তু যখন ক্ষেত চালু হল, তখন হরিণের মুখ থেকে, অন্যান্য পশুর মুখ থেকে তারা গমকে রক্ষা করে বসে! ক্ষেত যে মানুষকে বেঁধে রাখবার খুঁটিতে পরিণত হল। কিন্তু বাছা, মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্য জন্ম নেয়নি। দেবতারা যা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে নি, মদ্র আর পরশুরা সে সব তৈরী করেছে বসে।"

"কিন্তু বাবা, আমরা কি এখন ইচ্ছা করলেও এই সব চাষ-আবাদ ছেড়ে দিতে পারি? ধানই যে আমাদের অর্ধেক খাদ্য আজ।"

"সে কথা স্বীকার করি বাছা। কিন্তু ধান আমাদের পূর্বপুরুষেরা খেত না। এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে গমের বন আছে, সেখানে আপনাআপনিই গমের গাছ জন্মে, ফসল ধরে তারপর ঝরে যায়, সেগুলো সব গরুরা খায়, তাদের দুধ বেড়ে যায়; ঘোড়ারা খেয়ে মোটাসোটা হয়ে ওঠে। প্রতি বছর আমাদের পশুরা সব সেখানে যায়। মাটি মা মানুষের জন্য ধান সৃষ্টি করেন নি—তার দানা আমাদের ক্ষেতের গম থেকে ছোট হয়—পশুকুলের জন্যই এগুলো দিয়েছেন মাটি মা। আমার ভয় হয় যে কোনোরকমে না এই জংলী গম নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের খাওয়ার জন্য বৎস এই সব গরু রয়েছে; ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল রয়েছে; জঙ্গলের ভেতর ভালুক, হরিণ, শূয়োর, নানারকমের শিকার রয়েছে, আঙুর প্রভৃতি কত রকমের ফল রয়েছে। এই সব আহার মাটি মা আমাদের খুশী মনেই দিতেন; কিন্তু এই মদ্র আর পরশুরা—এরা পুরোনো সেতু ভেঙে ফেলে নতুন সড়ক তৈরী করেছে—আর তাদের এই পাঁপ কাজের ফলে মানুষের উপর দেবতার কোপ দৃষ্টি পড়েছে। জানিনা বাছা, এখন বক্ষুবাসীদের ভাগ্যে কী কী দুর্দশা লেখা রয়েছে। আমি ত পঁচিশ বছর থেকে পাহাড় চূড়ো ছেড়ে গাঁয়ে যাইনি কখনো। শীতের সময় নীচের দিকে এক ছাউনিতে চলে যাই আমি। যে সব লোক পূর্বপুরুষের বাঁধা সেতুকে ভেঙে ফেলতে চাইছে তাদের মধ্যে কেন যাব। পূর্বপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণীও আমি এতদিন গোপন রেখেছিলাম, এখনও যার শিখবার দরকার, সে-ই আমার কাছে চলে আসে। কিন্তু সেই সব বাধা অমান্য করে চলবার লোক বেড়েই চলেছে। এখন শুনতে পাচ্ছি মদ্র-পরশুদের ক্ষেত থেকেও পেট ভরছে না। এখন এরা বক্ষুবাসীদের আহার-পরিধান বয়ে নিয়ে কোথায় দিয়ে আসছে, আর তার জায়গায় কী পাওয়া যাচ্ছে?—দ্যাখো একটা ঘোড়ার বিনিময়ে কেনা এই কড়াই। ক্ষুধায় মরতে থাকলে কি এই কড়াইতে পেট ভরবে? এখন পুরুদের পেটের আহার এবং দেহের পোষাকের বদলে তাদের ঘরে দেখতে পাবে এই সব কড়াই।"

"এ ছাড়া আর একটা কথা শুনেছি বাবা, নীচ মদ্রদের স্ত্রীলোকেরা নাকি কানে এবং গলায় হলদে আর শাদা গয়না পরতে সুরু করেছে। একটা কানের গয়নার দাম-নাকি একটা ঘোড়া, ওগুলো, তামা নয়, সোনা বলে, আর শাদাগুলোকে বলে রূপা।"

"কেউ মার দেয় না এই সব অধর্মীদের! সারা বন্ধুজনমণ্ডলের সর্বনাশ করে ছাড়বে এরা, আমাদের খাওয়া-পরার জন্য যা কিছু সঞ্চিত হচ্ছে তাও এরা ছাড়বে না। আমাদের স্ত্রীরাও ওদের দেখাদেখি দুই ঘোড়ার বিনিময়ে কর্ণকুণ্ডল পরবে। হে দয়ালু অগ্নি, আর বেশী দিন আমাকে মানুষের মধ্যে রেখ না, পিতৃলোকে নিয়ে চল আমাকে।"

"আরও একটা গুরুতর পাপ রয়েছে বাবা! মদ্র আর পরশুরা কোনোখান থেকে মানুষ ধরে নিয়ে আসে, আর তাদের দিয়ে তামার খাঁড়া, তামার কুড়ুল তৈরী করায়। এরা অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী বাবা। কিন্তু মদ্র আর পরশুরা এদেরকে যখন খুশী পশুর মত বেচে দেয়, যখন খুশী নিজেদের কাছে রাখে। ক্ষেতের কাজ, কম্বল বোনার কাজ, আরও অন্যান্য নানারকমের কাজ এই সব ধ'রে আনা লোকদের দিয়ে করায়, এদের দাস বলা হয়।"

"মানুষকে কেনা-বেচা! কিন্তু আমরা ত খাবার, পোষাক বেচাও অন্যায় মনে করতাম, আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাবতেও পারেনি যে এই মদ্র-কলঙ্ক এতদূর নীচে নেমে যাবে। আঙুলে যদি পচ ধরে ত তার ওষুধ হল তাকে কেটে ফেলা; না হলে সমস্ত শরীরটাই পচে যাবে। এই মদ্র-পরশুদের বক্ষুতটে থাকতে দেওয়াও পাপ বাছা। আমি আর বেশী দিন এসব দেখবার জন্য বসে থাকব না।"

মাদ্র বাবার কথাবার্তা বড়ই মনোরঞ্জক ছিল, কিন্তু পুরুহূতের এও বোঝবার ক্ষমতা ছিল যে, যে নতুন হাতিয়ার সৃষ্ট হয়েছে, তাকে ছেড়ে মানব এবং পশু শত্রুর মাঝে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

তৃতীয় দিন যখন পুরুহূত বিদায় নিতে গেল তখন বৃদ্ধ তার ললাট এবং ভ্রূ চুম্বন করে তাকে আশীর্বাদ করল। রোচনা বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল তাকে, এবং বিদায়ের মুহূর্তে একে অপরের দুই গণ্ডকে অশ্রুসিক্ত করে দিল।

৩

মাদ্র বাবার কথাই সত্যি প্রমাণিত হল, যদিও তা পঁচিশ বছর পর—নিম্ন মদ্র এবং পরশুরা দিনের পর দিন উপরের বাসিন্দা পুরু আর মদ্রদের দাবিয়েই চলল। এই উপরের বাসিন্দা জনগণের মধ্যে কাপড়, কম্বল বোনা স্ত্রী-পুরুষরা স্বাধীন রয়ে গেছে, এদের খাওয়া-পরায় বেশী খরচ লাগে, এবং তার ফলে তাদের হাতে বোনা দ্রব্য সূক্ষ্ম হলেও বেশী দামের হয়;—কিন্তু নীচের মদ্র আর পরশুদের আছে ক্রীতদাস; যাদের তৈরী জিনিস অত ভাল না হলেও আরও সস্তা হয়। সেখানকার ব্যবসায়ীরা যখন এই সব জিনিস উট অথবা ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করে দেশে দেশে নিয়ে যেত, তখন সেগুলো যথেষ্টই বিক্রী হত। উপরের বাসিন্দাদের কাছেও এখন তামার জিনিস অধিকতর

সংখ্যায় প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। একে ত ওগুলো বছর বছরই সস্তা হয়ে পড়ছিল, দ্বিতীয়ত মাটি-কাঠের জিনিস থেকে ওগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়। পঁচিশ বছর আগে যেখানে মাত্র দু এক ঘরে তামার কড়াই দেখা যেত, সেখানে আজ মাত্র দু একটা ঘরই দেখা যায় যেখানে তামার কড়াই ব্যবহৃত হয় না। সোনা-রূপোর ব্যবহারও বেড়ে চলেছিল। আর এই সবের বিনিময়ে জনসাধারণকে তার আহার্য, কম্বল, চামড়া, ঘোড়া অথবা গরু বেচতে হত, এর ফলে তাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ছিল। উপরের বাসিন্দা কিছু লোকও নিজেরাই ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিল, কেননা তাদের সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছিল যে নীচের পড়শীরা তাদের ঠকিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বক্ষুর নীচে যাবার রাস্তা নীচের অধিবাসীদের জন্মভূমির ভিতর দিয়েই গিয়েছে এবং তারা এ রাস্তায় যাতায়াত করতে দিতে চায়নি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কয়েকবার ছোটো-খাটো ঝগড়াও হয়ে গেছে। অনেকবারই উত্তর মদ্র এবং পুরুরা বাইরের দেশসমূহে যাবার অন্য-অন্য রাস্তা বের করতে চেয়েছে, কিন্তু তাতেও তারা সফল হয়নি।

উপরের আর নীচের উপত্যকার জনতার মধ্যে এই সংঘর্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছিল যে, নীচের লোকেরা নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় একতা বজায় রাখতে পারত না; উপরের জনতা একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ চালাতে পারত। এই সব যুদ্ধে আপন বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার জন্যে পুরুহূত নিজ গোষ্ঠীর প্রিয়পাত্র হয়ে গিয়েছিল, আর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই সে পুরু গোষ্ঠী কর্তৃক গোষ্ঠী-নেতা নির্বাচিত হয়েছিল।

পুরুহূত এ কথা পরিষ্কার বুঝেছিল যে মদ্রদের এই অন্যায় ব্যবসায় যদি বন্ধ না করা যায় ত উপরবাসীদের কোনো কিছুই আশা নেই আর। তামার ব্যবহার কমে যাবার বদলে দিন দিন বেড়েই চলেছিল। হাতিয়ার, বাসনপত্র বা গয়নাতেই শুধু নয়, লোকে এখন বিনিময়ের কাজেও মাংস বা কম্বল বয়ে নিয়ে যাবার বদলে তামার তলোয়ার বা ছুরি নিয়ে যাওয়াই বেশী পছন্দ করতে লাগল। নিজ গোষ্ঠীর বৈঠকে পুরুহূত তাদের দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখাল যে তার মূলে রয়েছে ওই নিম্ন মদ্রদের অন্যায় ব্যবসায়। সকলেই এ বিষয়ে একমত হল যে পথের কাঁটা এই মদ্রদের না সরিয়ে দিলে তাদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে থাকতে হবে। হয় ত বা এমন দিনই আসবে যখন তাদের দাস হয়েই থাকতে হবে। পুরু এবং উত্তরমদ্রের নেতৃবৃন্দের মিলিত বৈঠকে ও লোকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হল। দুই গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরুহূতকে সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচিত করল এবং তাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করল। এইভাবে পুরুহূতই প্রথম রাজা হল।

প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে পুরুহূত সেনাবাহিনী সংগঠন করতে লাগল। রাজা হয়েই সে অস্ত্র নির্মাণ-ব্যবস্থার জন্য দুজন দাস লৌহ-কারিগরকে আপনার আশ্রয়ে এনে রাখল। উপরের বাসিন্দারা তাদের সাথে খুব ভালভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল, আর তাদের সহায়তায় লৌহ-শিল্পে নিপুণতা অর্জন করে ফেলল। এইভাবে মদ্র আর পুরুদের ভিতরে বহু লৌহ-শিল্পী তৈরী হয়ে উঠল। তাদের প্রতিবেশীরা নিজেদের লোহার দাসদের ফিরিয়ে

দেবার কথাই শুধু বলল না, সংগ্রামও করবে বলল। কিন্তু নীচের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাসুলভ পরাক্রম কমে এসেছিল। লড়াইতে সফল না হতে পেরে তামা দেওয়া বন্ধ করে দিল তারা। কিন্তু শীগ্‌গিরই তারা বুঝতে পারল যে এতে করে তাদেরই ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে। এদিকে মদ্র আর পুরুরা আগের কেনা কড়াই এবং অন্যান্য বাসনপত্র থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র একপুরুষ ধরে সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল।

অবশেষে রাজা এবং তার দুই গোষ্ঠী মদ্র-পরশুদের ধ্বংস করে ফেলতে সংকল্প করল, পুরুহূত স্বয়ং লোহারের কাজ শিখেছিল, এবং তার উপদেশ মত খড়্গ, ভল্ল এবং বাণ-ফলকের কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তার বলিষ্ঠ এবং কুশলী যোদ্ধাদের আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য বহু তামার ঢাল (বক্ষ ত্রাণ) তৈরী করিয়েছিল সে।

রাজা ঠিক করল যে প্রথমে শুধু এক শত্রুকে আক্রমণ করা হবে, আর এই আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে পরশুদেরই বেছে নিল সে। শীতের দিনে পরশুরা অধিক সংখ্যায় ব্যবসার কাজে বাইরে চলে যেত। রাজা এই সময়টাকেই সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে করল। উত্তর মদ্র এবং পুরুগণের যোদ্ধবৃন্দকে রণকৌশল শিখাল সে। যদিও পরশু আর উত্তর মদ্রদের সঙ্গে শত্রুতা বহু দিন ধরেই চলে আসছিল, কিন্তু তারা বুঝতেই পারেনি যে এমনি আচম্‌কা তাদের উপর শত্রুর এমন এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ আরম্ভ হবে যে বক্ষু উপত্যকা থেকে তাদের নাম পর্যন্ত মুছে যাবে। রাজা স্বয়ং তার নেতৃত্বে বাছাই করা মদ্র আর পুরু যোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করল। যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝতে দেরী হল না, এবং তা বুঝবার পর পরশুরা প্রাণপণ করে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল। কিন্তু সেই দ্রুত আক্রমণের মুখে তারা সমস্ত পরশু গ্রামকে একত্র করতে সক্ষম হল না। রাজার সৈন্যরা একের পর এক গ্রাম অধিকার করে হাজার হাজার পরশুকে হত্যা করল—কাউকেই বন্দী করে রাখল না। এদিকে নীচের মদ্ররা যখন সঙ্কটকে উপলব্ধি করতে পারল, তখন আর সময় নেই। পরিশেষে কয়েকটিমাত্র গ্রাম অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। যাদের জন্য অনেক সৈন্য রেখে রাজা পুরুহূত কুরু-ভূমিতে চলে এল। নিম্ন মদ্ররা আক্রমণ করল, কিন্তু তাদেরও পরশুদের দশা হল। নীচ মদ্র এবং পরশুদের যে কোনো লোক—শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ—হাতের কাছে এল তাকেই ওরা মেরে ফেলল। স্ত্রীলোকদের আপন স্ত্রীদের সাথে সামিল করে নিল। অধিকৃত দাসদের মধ্যে যারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইল, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিছু নিম্ন মদ্র এবং পরশু স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ বাঁচিয়ে বক্ষু-উপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমের দিকে চলে গেল। তাদের বংশধরেরাই পরে পরশু (পার্সিয়ান) এবং মদ্র (মিডিয়ান) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এদের পূর্বপুরুষের উপর রাজার নেতৃত্বে যে অত্যাচার হয়েছিল, তা এরা ভুলতে পারে নি। এইজন্য ইরাণীরা রাজাকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করতে লাগল। সমগ্র বক্ষু-উপত্যকা এবং উত্তর-মদ্র পুরুদের হাতে এসেছিল। দক্ষিণ এবং বাম তট আপোষে ভাগ করে নিল এই দুই দল।

বক্ষুবাসীগণ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল নতুনকে সরিয়ে পুরানো ব্যবস্থাই পুনঃস্থাপন করবার,

কিন্তু এরা তামা ছেড়ে পাথরের হাতিয়ারের প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারে নি। তামার জন্য বক্ষুর পাহাড়ী উপত্যকার বাইরে ব্যবসাসম্বন্ধ বিস্তাব কবা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

কিন্তু দাসত্বকে তারা কখনোই মেনে নেয় নি, এবং বাইরের লোককেও কখনো বক্ষু-উপত্যকার স্থায়ী অধিবাসী হতে দেয়নি। বহুশতাব্দী পরে যখন রাজা পুরুহূতকেও লোকে ভুলতে আরম্ভ করল অথবা তাকে দেবতার রূপে কল্পনা করতে লাগল, তখন এতটা বংশবৃদ্ধি হয়ে গেছে যে সকলের ভরণ-পোষণ করতে আর বক্ষু সক্ষম নয়। এজন্য তাব বহু অধিবাসীকেই বাধ্য হয়ে দক্ষিণের দিকে চলে যেতে হল।

আগে এক গোষ্ঠী অপরের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকত, নেতার প্রাধান্য থাকলেও তার সব কিছুই জনতাব উপব নির্ভর করত। কিন্তু বক্ষুতটের শেষ-সংঘর্ষ একাধিক গোষ্ঠীব এক সেনাপতি—রাজার জন্ম দিয়েছিল। *

---

* আজ থেকে একশ আশী পুরুষ আগেকার আর্যগোষ্ঠীর কাহিনী এটা। এই সব গোষ্ঠীর কারও কারও সন্তানেরা এইসময় ভারতের দিকে প্রস্থানরত ছিল। এই সময় কৃষি এবং তামার প্রসার হতে আরম্ভ করেছিল। আর্য দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তার থেকে আবার মুক্তি চেয়ে ছিল।

পুরুধান

দেশ : উপরিস্বাত ;
জাতি : হিন্দি-আর্য ভাষাভাষী
কাল : ২০০০ খৃঃ পূঃ

১

নদীর নাম সুবাস্তু ; তার বাম তটে সবুজে ঢাকা পর্বতমালা, পাহাড় থেকে আছড়ে পড়া ঝর্ণার ধারা, আর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে আন্দোলিত গমের সারি দ্বারা সুশোভিত এই অঞ্চল গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে ; কিন্তু এই অঞ্চলের আর্যভাষাভাষীদের সবচেয়ে বেশী গর্ব ছিল পাথরের দেওয়াল ও পাইন শাখায় আচ্ছাদিত গৃহচূড়া নির্মিত নিজেদের বাসস্থান সম্পর্কে। আর এই জন্যেই এই প্রদেশের নামও তারা দিয়েছিল সুবাস্তু (অর্থাৎ স্বাত—সুন্দর গৃহসজ্জিত প্রদেশ)। বক্ষুতট পরিত্যাগ করে আর্যভাষাভাষীগণ পামীর ও হিন্দুকুশের দুর্গম গিরিশ্রেণী এবং কুনার ও পাঞ্জ-কোরার মত নদী সমূহ অতিক্রম করে এসেছিল। অতীতের সেই স্মৃতি সম্ভবত অনেক দিন বেঁচেছিল—মঙ্গলপুরের (মা, লোরের) ইন্দ্র উৎসব হতে চলেছে আজ—উৎসবের এই বিরাট প্রস্তুতির কারণও বোধহয় ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—কারণ আপন ইন্দ্রের পরিচালনায় দুর্গম পার্বত্যপথ তারা একদিন নিরাপদেই অতিক্রম করেছিল।

মঙ্গলপুরে পুরুরা তাদের সুন্দর ঘরগুলি পাইন শাখায় ও নানা রং বেরঙের পতাকায় সাজিয়েছিল। পুরুধান তার ঘর সাজাচ্ছিল এক বিশেষ ধরনের রক্ত পতাকা দিয়ে—তা দেখে প্রতিবেশী সুমেধ বলল, "মিত্র পুরু ! তোমার পতাকাগুলো বেশ হালকা ও চিকন দেখছি। আমাদের এখানে তো এরকম কাপড় বোনা হয় না, এতে বোধহয় অন্য কোন ধরনের ভেড়ার লোম ব্যবহার করা হয়েছে ?"

"না, এতো কোন ভেড়ার লোমে বোনা হয় নি, সুমেধ !"

"তা হলে ?"

"এ এক রকমের পশম—আর এ গাছে জন্মায়। আমরা ভেড়ার গা থেকে পশম নিয়ে কাপড় বুনি, আর এই পশম জন্মায় জংলী গাছে।"

"এই রকম শোনা যায় বটে মিত্র, কিন্তু নিজের চোখে এ ধরনের গাছ কখনো দেখিনি।"

উরুর উপর তকলী ঘষে সেটা ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন এক (ভেড়ার) পশমের ফেটি লাগাতে লাগাতে সুমেধ বলল,—"কী ভাগ্যবান তারা ! যাদের গাছে এই পশম জন্মায় তারা কতই না ভাগ্যবান। আচ্ছা, আমাদের এখানে ঐ গাছ লাগানো যায় না ?"

"তা বলতে পারি না। কতটা শীততাপ সে গাছ সহ্য করতে পারে তাও জানি না। কিন্তু সুমেধ! খাবার মাংস তো আর গাছে জন্মাতে পারে না।"

"কোন দেশে যদি গাছের ওপর পশম জন্মাতে পারে—কে জানে হয়তো এমন দেশ আছে যেখানে গাছেই খাবার মাংস পাওয়া যায়। যাক্, এ কাপড়ের দাম কত।"

"পশমী কাপড়ের চেয়ে অনেক কম, তবে টেঁকে না বেশী দিন।"

"কোথায় খরিদ করলে।"

"অসুরদের কাছ থেকে। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে তাদের দেশ, সেখানকার লোকেরা গাছের পশমের কাপড় পরে।"

"এত সস্তা যখন, তখন আমরাই বা পরি না কেন?"

"কিন্তু ঐ কাপড়ে শীত কাটে না।"

"তবে অসুররা পরে কি করে?"

"ওদের দেশে ঠাণ্ডা কম, বরফ পড়েই না।"

"পূব, পশ্চিম, উত্তর কোথাও না গিয়ে—তুমি কেবল দক্ষিণ দিকেই ব্যবসা করতে যাও কেন?"

"লাভ বেশী হয়—সেইজন্যেই আর কি! আর বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। তবে খুব কষ্টও হয়—ওদিকে গরম পড়ে প্রচণ্ড, একটু ঠাণ্ডা জলের জন্যে প্রাণ যেন ছট্‌ফটাতে থাকে।"

"ওখানকার লোকেরা সব কেমন, পুরুধান?"

"লোকগুলো বেঁটে বেঁটে, রং তামাটে। বড়ই কুৎসিত। আর নাক আছে কি নেই—সেটা বোঝা যায় না—খুব চেপ্টা ও ভোঁতা। আর এত কদর্য রেওয়াজ আছে সেখানে মানুষ কেনা-বেচা চলে।"

"কি বললে? কেনা-বেচা?"

"হাঁ, ওরা এই ব্যবসায়কে বলে দাস ব্যবসায়।"

"দাস ও তাদের প্রভুদের মধ্যে কি চেহারার কোন পার্থক্য আছে?"

"না। তবে দাসরা হচ্ছে খুব গরীব ও পরাধীন—তাদের দেহ মন প্রভুদের অধীনে।"

"ইন্দ্র রক্ষা করুন, এমন লোকের মুখ যেন দেখতে না হয়!"

"মিত্র সুমেধ! তোমার তকলী তো ঘুরছেই—যজ্ঞে যাবে না?"

"যাব না কেন, ইন্দ্রের দয়াতেই আমরা নধর পশু আর মধুর সোমরস পাচ্ছি। এমন কোন্ হতভাগা আছে যে এই ইন্দ্র পূজায় মিলিত হবে না?"

"তোমার ঘরের বউটির খবর কি? তাকে তো আজকাল মজলিশে দেখা-ই যায় না!"

"কেন, তুমি তার প্রেমে পড়েছ নাকি পুরুধান?"

"প্রেমে পড়ার কথা হচ্ছে না। তুমি তো সুমেধ জেনে শুনেই বুড়ো বয়সে তরুণীর সাথে প্রণয়ের জিদ্ ধরেছ!"

"পঞ্চাশে লোকে বুড়ো হয় না।"

"কিন্তু, পঞ্চাশ আর বিশ বছর বয়সের পার্থক্য কত, জানো?"

"বেশ তো সে তাহলে তখনই আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেই পারত!"

"তুমি তখন গোঁফ দাড়ি মুড়িয়ে চেহারা করেছিলে যেন ১৮ বছরের ছোকরা। আর উষার মা-বাপের নজর তোমার পঞ্চাশ বছরের ওপর ছিল না, ছিল তোমার পশুদের ওপর।"

"এসব কথা বন্ধ কর, পুরু! তোমরা ছেলেছোকরারা তো খালি···।"

"বেশ, একথা না হয় বলব না আর। ওদিকে কিন্তু বাজনা আরম্ভ হয়ে গেছে—উৎসব এবার শুরু হবে।"

"দিলে তো এখানে দেরী করিয়ে—এখন বেচারা সুমেধ গাল খাক্ আর কি!"

"বেশ তো চলো, উষাকেও সঙ্গে নেওয়া যাক্।"

"সে কি এখনো বাড়ী বসে আছে না কি!"

"যাক্, এই পশম আর তকলীটা রেখে চলো এখন।"

"আরে, এগুলো সঙ্গে থাকলে যজ্ঞের কিছু অঙ্গহানি হবে না।"

"এই জন্যেই তো উষা তোমায় পছন্দ করে না।"

"পছন্দ ঠিকই করে—অবশ্য তোমরা মঙ্গলপুরের তরুণরা যদি পছন্দ করতে দাও—তবে না?"

কথা বলতে বলতে দুই সঙ্গী শহরের সীমা ছাড়িয়ে এগুতে লাগল যজ্ঞ-বেদীর দিকে। পথে যে কোন যুবক বা যুবতীর সঙ্গে পুরুধানের চোখোচোখি হয়—সে-ই মুচকি হেসে চলে যায়—পুরুধানও চোখ ঠেরে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। এই অবস্থায় একজন তরুণকে সুমেধ পাকড়াও করল—আপন মনে বিড় বিড় করে বকে উঠল—"এই তরুণরাই হচ্ছে মঙ্গলপুরের কলঙ্ক।"•

"কি ব্যাপার, মিত্র।"

"মিত্র-টিত্র নয়, ওরা আমাকে দেখে হাসছে।"

"আরে মিত্র, ও তো বদমাস—তুমিও তো জানো। ওর কথা তুমি ভাবছ কেন?"

"আমি তো মঙ্গলপুরে কোন ভাল মানুষই দেখি না।"

যজ্ঞ-বেদীর পাশে বিস্তৃত ময়দান—তাতে এখানে-ওখানে মঞ্চ এবং পাইন পাতায় সজ্জিত তোরণ গড়া হয়েছিল অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য। গ্রামের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ বেদীর আশেপাশে জমায়েত হয়েছিল—কিন্তু আসল বড় সমাবেশটা সন্ধ্যার পরই হওয়ার কথা, তখন সারা পুরুজনের সকল স্ত্রী-পুরুষ এই উৎসবে যোগ দেবে—স্বাত নদীর অপর পারের মদ্র-জনের স্ত্রী-পুরুষরাও আসবে।

উষা দুই বন্ধুকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে সুমেধের হাত দুটো

নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে তরুণী প্রেমিকার মত ভঙ্গী করে বলল, "প্রিয় স্থমেধ! সারা সকাল থেকে তোমায় খুঁজে খুঁজে আমি প্রায় শেষ হয়ে গেলাম, তবু তোমার পাত্তাই নেই কোনোখানে।"

"কেন, আমি কি মরে ভূত হয়েছিলাম।"

"এমন কথা বোলো না স্থমেধ!"

"এমন কথা মুখেও এনো না স্থমেধ! বেঁচে থাকতে আমাকে বিধবা বানিয়ো না।"

"পুরুজনে বিধবাদের ভাবনা কি, দেবরের অভাব নেই।"

"কেন, সধবাদের কাছে দেবররা কি বিষতুল্য"—পুরুধান প্রশ্ন করল।

স্থমেধ বলল, "ঠিক বলেছ পুরু! ও আমাকে শেখাতে এসেছে। কোন ভোরে বেরিয়েছে—না জানি এর মধ্যে কত ঘর ঘুরে এসেছে—সন্ধ্যার পর এ বলবে আমার সাথে নাচো, ও বলবে—না আমার সাথে। এই নিয়ে বেধে যাবে ঝগড়া, রক্তারক্তি। এই বউ-এর জন্যে বদনাম হবে বেচারা স্থমেধের।"

উষা স্থমেধের হাত ছেড়ে দিয়ে চোখের চাউনি ও কণ্ঠের স্বর বদলে চীৎকার করে বলল—"তুমি কি আমাকে বাক্সে বন্ধ করে রাখতে চাও নাকি? যাও না—রান্না ভাঁড়ারের ভার নাওগে—আমিও নিজের পথ দেখে নি।"

যাবার সময় পুরুধানকে একান্তে মুচকি হাসির ইসারা দিয়ে বেদী সংলগ্ন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল

বছরের একটা দিন বলে এই দিনটা গণ্য হত। বক্ষুতটের (অক্সাসের তীরের) স্বাতের উপত্যকায় অতীতের পুরু-জনের প্রথা অনুসারে পশুপালের মধ্যে থেকে বেছে সেরা ঘোড়াটি বলি দেওয়া হত। সারা স্বাত উপত্যকায় এই সময় ঘোড়া খাওয়াব রেওয়াজ ছিল না—তবু ইন্দ্র পূজার বলি হিসাবে সকলেই ভক্তিভরে প্রসাদ নিত। জনের মহাপিতর—যাকে এখানে জনপতি বলা হয়—আজ আপন জনপরিষদের সাথে সাথে ইন্দ্রপূজার প্রিয় অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দিত। এই বলিদানের সব বিধি-বিধান প্রত্যেকেরই জানা ছিল। বক্ষু উপত্যকার অধিবাসীরা যে মন্ত্র পড়ে ইন্দ্রের কাছে উৎসর্গ দিত—তা তাদের সবটাই মুখস্থ ছিল। বাদ্য ও মন্ত্রস্তুতির সঙ্গে অশ্বকে স্পর্শ এবং প্রক্ষালন থেকে বলি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হল। তারপরে ঘোড়াটির চামড়া ছাড়িয়ে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটা হোল—পরে কয়েক খণ্ড মাংস ঐ অবস্থায় আর কিছু অংশে মশলা মাখিয়ে আহুতি হিসাবে আগুনের মধ্যে দেওয়া হল।

যজ্ঞের বলি প্রসাদ বাটতে বাটতে সন্ধ্যা হয়ে এল। ইতিমধ্যে যজ্ঞভূমি নরনারীতে ভরে গেল—এইদিন সকলেই আপন আপন শ্রেষ্ঠ বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। মেয়েদের দেহে ছিল সূক্ষ্ম রঙিন কম্বল—কোমরের কাছে বাঁধা ছিল কারুকার্যখচিত বিভিন্ন রঙের কোমরবন্ধনী, আর নীচে ছিল সুন্দর লোমবস্ত্রের আবরণ। প্রায় প্রত্যেকের কানেই ছিল সোনার কুন্তল। বসন্ত শেষ হয়ে আসছিল—সারা উপত্যকায় ভরা ফুটন্ত ফুল যেন আজকের দিনটিকে লক্ষ্য করে বিকশিত হয়েছে। তরুণ-তরুণীরা আপন আপন সুদীর্ঘ

কেশগুচ্ছ ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। আজ রাতে নর-নারীর স্বচ্ছন্দ বিহারের রাত—ইচ্ছামত প্রণয় ও কামনা-ভোগের রাত। রাত্রে যখন উৎসবের সজ্জায় সুসজ্জিতা উষা পুরুধানের হাতে হাত মিলিয়ে ঘুরছিল—তখন সুমেধের নজরে পড়ল—কিন্তু কিই বা করতে পারে সে?—মুখ ঘুরিয়ে নিল। ইন্দ্রের উৎসবের দিনে নরনারীর যথেচ্ছ মিলনে রাগ করার পর্যন্ত অধিকার কারুর নেই ' আর বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র গত বছরেই সে এইজন্য কুলপতির রোষভাজন হয়েছিল।

আজকের রাতে মধু ও ভাংএর নদী বয়ে যাচ্ছিল। সারা গাঁয়ের মানুষ জড়ো করেছে ভোগ দেওয়ার জন্য সুস্বাদু গোমাংস আর সোমরস।

সর্বত্রই অভিনব প্রেমের মাদকতাপূর্ণ জড়ানো কণ্ঠের সম্ভাষণ আর যুগ্ম তরুণ-তরুণীর পদচারণ নজরে পড়ছে। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে এক পেয়ালা সোমরসে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। ইঙ্গিতেই বাজনা বেজে উঠছে—আর বাজনার তালে তালে নাচছে তারা—শ্রান্ত হলে বিশ্রামের পর অপর গ্রামের আগন্তুকদের গিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সারা গোষ্ঠীর লোকদের উদ্যোগে উৎসবের আয়োজনও হয়েছিল বিরাট—আর নাচের জন্য আসরও ছিল বিরাট বিস্তৃত।

ইন্দ্র উৎসব ছিল যুবজনের মহোৎসব। এদিন সারা দিন রাত তাদের কোন কিছু করতেই বাধা-নিষেধ ছিল না।

২

উপরি স্বাতের এই অংশ পশু এবং শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—এজন্য এখানকার লোকেরা অত্যন্ত সুখী এবং সমৃদ্ধ। এদের যে সব জিনিসের অভাব—তার মধ্যে তামা এবং সংের জিনিষ যেমন সোনা-রূপো ও কয়েকটি রত্ন যার অভাব দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। এই সব জিনিসের জন্য প্রতি বছর স্বাত এবং কুভা (কাবুল) নদীর সঙ্গমস্থলে অসুর-নগর রয়েছে। মনে হয়—এই অসুর-নগরের আর্য লোকেরা পুষ্কলাবতী (চার সাদা) নামে ডাকে আর আমরাও এখানে এই নামকে স্বীকার করে নিচ্ছি। শীতের মাঝামাঝি স্বাত, পঞ্জকোরা এবং অন্যান্য উপত্যকাবাসী পাহাড়ী গোষ্ঠীসমূহ, যথা—পুরু, কুরু, গান্ধার, মদ্র, মল্ল, শিবি, উশীনর ইত্যাদি—নিজ নিজ ঘোড়া, কম্বল এবং অপরাপর বস্তু নিয়ে পুষ্কলাবতীর বহির্ভাগে অবস্থিত ময়দানে ডেরা (তাঁবু) বেঁধে বসত। বহু শতাব্দী ধরে এই নিয়ম ভালভাবেই চলে আসছিল, এ বছর পুরুদের যে সার্থ (ক্যারাভ্যান) বা বণিক-দল পুষ্কলাবতী গেল। পুরুধান ছিল তাদের নেতা। এধারে কয়েক বছর থেকে পাহাড়ী লোকদের ধারণা হয়েছিল যে অসুর তাদের ভয়ানক ঠকাচ্ছে। অসুর নাগরিকেরা এই পাহাড়ী লোকদের চেয়ে অনেক বেশী চতুর, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা এদের নিরেট উজবক্ জংলী বলে মনে করে। এতে কিছুটা সত্যতাও ছিল।

তবে নীল চোখ বিশিষ্ট আর্য ঘোড়সওয়ার কখনই নিজেকে অসুর নাগরিকদের চেয়ে নীচ বলে মানতে রাজী ছিল না। ধীরে ধীরে যখন আর্যদের মধ্য থেকে পুরুধানের মত বহু লোক অসুরদের ভাষা বুঝতে আরম্ভ করল, এবং তাদের সমাজে চলাফেরা করবার সুযোগ পেল তখন তারা জানতে পেল যে অসুর আর্যদের পশু-মানব বলে মনে করে।

অসুরদের নগর সুন্দর ছিল, সেখানে পাকা ইঁটের বাড়ী, স্নানাগার, সড়ক ইত্যাদি তৈরী হত। আর্যরাও পুষ্কলাবতীর সৌন্দর্যকে অস্বীকার করত না। কোনো কোনো অসুর তরুণীর সৌন্দর্যকে (নাক, চুল,)···মানতে রাজী ছিল তারা। কিন্তু একথা কখনই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না তারা যে দেবদারু-সমাচ্ছাদিত পর্বত-মেখলার মাঝে অবস্থিত চিত্র-বিচিত্র কাঠের অট্টালিকা থেকে সুসজ্জিত, স্বচ্ছগৃহ-পংক্তি যুক্ত মঙ্গলপুর পুষ্কলাবতী থেকে কোনো অংশেই কম। পুষ্কলাবতীতে মাস ভরে কাটানও তাদের পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়ত এবং বার বার আপন জনভূমির কথা স্মরণে আসত। যদিও ঐ স্বাত নদী পুষ্কলাবতীর ধার বেয়েও বয়ে চলেছে, কিন্তু তারা দেখত তার জলে সেই স্বাদ নেই। তাদের বক্তব্য ছিল, অসুরদের হাত লাগামাত্রই এই পবিত্র জল কলুষিত হয়ে গেছে। যাই হোক না কেন আর্যরা কোনোরকমেই অসুরদের আপন সমকক্ষ বলে মানতে রাজী ছিল না। বিশেষ করে যখন তারা তাদের হাজার হাজার দাস-দাসী এবং ঘরে বসে আপন দেহ বিক্রয় করা বেশ্যাদের দেখল।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আর্যদের অসুরের মধ্যে এবং অসুরদের আর্যের মধ্যে বহু মিত্র জন্মেছিল। অসুরগণের রাজা পুষ্কলাবতী থেকে দূরে সিন্ধুতটের কোনো নগরে বাস করত। এজন্য পুরুধান তাকে কোনোদিন দেখেনি। হ্যাঁ, রাজার স্থানীয় অমাত্যকে দেখেছিল সে। সে ছিল বেঁটে, মোটা আর অত্যন্ত অলস। সুরার প্রভাবে তার পুরু চোখের পাতা সর্বদাই মুদিত থাকত। তার সারাদেহ ডজন ডজন সোনা-রূপোর অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল। কানদুটোকে চিরে কাঁধ পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে নিয়েছিল সে। এই রাজামাত্য পুরুধানের চোখে কুরূপতা এবং বুদ্ধিহীনতার নমুনা স্বরূপ ছিল। যে রাজ্যের এমন প্রতিনিধি হয়, তার প্রতি পুরুধানের মত লোকের উঁচু ধারণা থাকতে পারে না। পুরুধান শুনেছিল যে সে অসুর রাজের শালা হয়, এবং এই একটিমাত্র গুণের জোরে সে এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

কয়েক বছরের সাময়িক সংস্পর্শ হেতু অসুর সমাজের ভিতরকার বহু দুর্বলতা পুরুধানের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। উচ্চ বর্গের অসুর তারা আপন অধীনস্থ ভট এবং দাসদের শক্তির জোরে শত্রুর মুকাবিলা করতে চায়। দুর্বল শত্রুকে জয় করতে এরা ভালভাবেই সফল হয়, কিন্তু বলবান শত্রুর সামনে এ রকম সৈন্য দাঁড়াতেই পারে না। অসুরদের শাসক—রাজা, সামন্ত—ভোগ-বিলাসকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করত। প্রত্যেক সামন্তেরই শত স্ত্রী এবং দাসী থাকত। স্ত্রীদের তারা দাসীর মত করেই রাখত। হালে কিছু পাহাড়ী স্ত্রীকেও বলপূর্বক অসুর রাজা আপন অন্তঃপুরে এনে রেখেছিল। এর ফলে আর্য-জনের ভিতরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

অসুবিধা এই ছিল যে অসুর রাজধানী সীমান্ত থেকে বহুদূরে অবস্থিত, আর্যগণের পক্ষে সখানে উপস্থিত হওয়া মুখের কথা নয়। এজন্য লোকেরা আর্য স্ত্রীদের কথাকে…… মনে করত।

পুষ্কলাবতীর রাজার কাছ থেকে রকম-বেরকমের অলঙ্কার, কার্পাস-বস্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অপরাপর দ্রব্যসম্ভার, সুবাস্তু কুনারের উপরিভাগে কাঁটার ছাউনি পৌঁছাতে আরম্ভ করেছিল। সুবাস্তুর স্বর্ণকেশী সুন্দরীগণ চতুর অসুর শিল্পীদের হাতে গড়া অলঙ্কারে মুগ্ধ ছিল। এজন্য সার্থের প্রতিবছর অধিকতর আর্য-স্ত্রী পুষ্কলাবতী আসতে আরম্ভ করল। সুমেধ বেচারা সত্যিসত্যিই ঊষাকে বিধবা বানিয়ে চলে গিয়েছিল, এবং সে এখন তার খুড়তুতো দেবর পুরুধানের পত্নী হয়ে দাঁড়াল। এ বছর সেও পুষ্কলাবতীতে এসেছিল। পুষ্কলাবতীর নগরাধিপতির লোকজনেরা পীত-কেশের তাঁবুর ভিতর বহু সুন্দরী দেখে এর খবর আপন প্রভুর কাছে পৌঁছে দিল। তারা ঠিক করল, সার্থ যখন ফিরে যেতে থাকবে তখন পাহাড়ে ঢুকতেই হামলা করে তাকে লুটে নিয়ে যাবে। যদিও এই কাজ বুদ্ধি-হীনতার লক্ষণ, কারণ পীত-কেশেরা অত্যন্ত লড়ায়ে হয় এখবর তাদের জানা ছিল। কিন্তু নগরাধিপতির মগজে বুদ্ধির লেশমাত্র ছিল না। নগরের বড় বড় শেঠ-সাহুকরেরা তাকে ঘৃণা করত। যে ব্যাপারীর সঙ্গে পুরুধানের মিত্রতা ছিল, তার সুন্দরী কন্যাকে হালে নগরাধিপতি জবরদস্তি নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল, এজন্য সে তার সারা জীবনের দুশমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঊষাও এই অসুর সওদাগরের বাড়ী কয়েকবার গিয়েছে। যদিও ঐ সওদাগর পত্নীর একটি কথাও বুঝতে পারতো না, পুরুধানের দোভাষীর কাজে এবং শেঠনীর ব্যবহারে দুই আর্য-অসুর নারীর ভিতর সখিত্ব সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। বিদায় নেবার দুদিন আগে সওদাগর তার বড় গ্রাহক পুরুধানকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করল। সেই সময় সে পুরুধানের কানে নগরাধিপতির ঘৃণ্য মতলবের কথা তুলে দিল। সমস্ত আর্য-সার্থ নায়ককে ডেকে সারারাত পরামর্শ করল পুরুধান।

যাদের হাতে ভাল অস্ত্র কম ছিল, তারা নতুন অস্ত্র কিনল। বিক্রী করবার জন্য আনীত ঘোড়া এবং অন্যান্য ভারী মোট তারা বেচে দিল। শুধু নিজেদের চড়বার ঘোড়া এবং অন্যান্য কেনা জিনিসপত্র—অলঙ্কার অন্যান্য ধাতব দ্রব্য—কিছুটা হালকা হল, এজন্য এদিক থেকে এদের তেমন চিন্তা রইল না। স্বাতবাসী আর্য-স্ত্রীগণের মধ্যে অলঙ্কার-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু এই সময় পর্যন্ত তাদের তারুণ্যের শিক্ষায় নৃত্য-গীতের সঙ্গে শস্ত্র-শিক্ষাও চলে আসছিল, এজন্য সংকটের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও আপন আপন খড়্গ এবং চর্ম ঢাল তুলে নিল।

পুরুধানের একথা জানা ছিল যে অসুর সৈন্য সীমান্তের পাহাড়ী ঘাটে আগে থেকে রাস্তা আটকে হামলা করবে এবং সেই সময় তাদের এক বড় অংশ পিছে থেকেও ঘিরে ফেলতে চাইবে। এজন্য পুরুধান পুরোদস্তুর তৈরী হয়ে গেল যা প্রথমে খবর পাওয়া-মাত্রই সম্ভব হল। এমনি হলে পঞ্চকোরা, কুণার এবং স্বাতের সার্থ ভিন্ন ভিন্ন চলার বদলে একে অন্যের অপেক্ষা রেখে চলার ব্যবস্থা করত, কিন্তু এখন সব প্রস্তুত হয়ে

গেছে। যদিও শত্রুকে জানতে না দেবার জন্য তারা পুষ্কলাবতী থেকে দু-একদিন আগে পিছে রওনা দিল, কিন্তু ঠিক হল যে অস্তার (অবাজই) দ্বারে সকলেই একসময়ে পৌঁছুবে। দ্বার যখন এক ক্রোশ দু-ক্রোশ বাকি, পুরুধান তখন পঁচিশ জন সওয়ারীকে আগে পাঠাল। যে সময় সওয়ারীরা দ্বাবের ভিতরে এগুতে লাগল, ঠিক সেই সময়ে অসুবগণ তাদের উপর বাণ ছুঁড়তে আবস্ত করল। আক্রমণের সংবাদ সত্যে পবিণত হল, সওয়ারীরা পিছু হটে এল এবং আপন সার্থনায়ককে সংবাদ দিল। পুরুধান প্রথমে পিছে থেকে এগিয়ে আসা শত্রু কবল থেকে মুক্ত হতে চাইল। এতে সুবিধাও ছিল, কারণ যদিও অসুরেরা প্রতি বছর আযদের কাছ থেকে হাজাব হাজাব সংখ্যক ঘোড়া কিনেছিল তবু তারা এখন পর্যন্ত সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।

সার্থ আটক পড়ল, এবং তার রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক উটকে সেখানে ছেড়ে বাকি সওয়ারীর সাথে পিছে ঝুঁকল। অসুর-সেনা প্রত্যাশা করেনি যে পীত-কেশ একের পব এক তাদের উপর এসে পড়বে। পীত-কেশীদের দীর্ঘ বল্লম এবং খড়্গেব সামনে তাবা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না, কিন্তু আযবল এদের শুধু পবাজিত করেই ছাড়তে চাইল না। তারা এইসব বোঁচা নাক, কালো অসুবদের বুঝিয়ে দিতে চাইল যে পীত-কেশীদেব উপব নজর দেওয়া কি ভয়ংকর বিপদের কাজ। অসুর-সেনাদের পলায়ন করতে দেখে পুরুধান সার্থের সূচনা পাঠাল এবং নিজ সওয়ারীদেব নিয়ে পুষ্কলাবতীতে এসে পড়ল। অসুব সেনানীদের মত তাদের নগরাধিপতিও এমন আশা কবেনি। অসুবেবা তাদের পূর্ণ শক্তিকে সংগঠিত করবার সুযোগ পেল না এবং সহজেই অসুব দুর্গ এবং নগরাধিপতি, পীত-কেশীদের অধিকারে চলে এল। পীত-কেশীগণ অসুরদের বিশ্বাসঘাতকায় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিল। তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অসুর পুরুষদেব বধ করল। আব নগরাধিপতিকে নগরের চৌরাস্তায় নিয়ে এসে অসুব প্রজাদের সামনে এক একটি অঙ্গচ্ছেদ করে হত্যা করল। স্ত্রীলোক, শিশু এবং ব্যাপাবীদের মারল না তারা। ঐ সময়ে যদি দাস বানাবার ইচ্ছা থাকত তবে সম্ভবতঃ পীত-কেশীবা (আর্য) এত অধিক বধ করত না। পুষ্কলাবতীর বহুলাংশে তারা আগুন জেলে পুড়িয়ে ফেলল। অসুব দুর্গেব এই প্রথম পতন।

অসুর এবং পীত-কেশীদের মহান্‌ বিগ্রহেব—দেবাসুব সংগ্রাম—এইভাবেই সূত্রপাত হল।

পুরুধান ফিরে এসে অস্তাদ্বারে একত্রিত হওয়া অসুর সৈন্যবাহিনীকে নির্মূল কবল। তারপর সমগ্র পীত-কেশী সার্থ আপন আপন জনভূমিতে ফিরে গেল।

কয়েক বছরের জন্য পুষ্কলাবতীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। পীত-কেশীরা অসুর-পণ্য নিতে অস্বীকার করল, কিন্তু তামা, পিতলকে কতদিন বাইরে রাখতে পারবে? *

* আজ থেকে একশ বাট পুরুষ আগে আর্য (দেব) অসুর সংঘর্ষ হয়েছিল। আর্যদের এই পাহাড়ী সমাজে দাসত্ব স্বীকৃত হয়নি—তামা-পিতলের অস্ত্র এবং ব্যবসা জোরের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

অঙ্গিরা

স্থান : গান্ধার (তক্ষশিলা)
জাতি : হিন্দি-আর্য ভাষাভাষী
কাল : খৃষ্টপূর্ব ১৮০০

[প্রায় ১৫২ পুরুষ আগেকার ঘটনা অনুসরণে। এই সময়কার অধিবাসী অসুরদের সঙ্গে আর্যদের প্রথম সংঘষের বর্ণনা আছে।]

১

"এই সুতি কাপড় একেবারেই অকেজো এতে না আটকায় শীত ; না রোখে বর্ষা"—নিজের গা থেকে ভিজে কাপড়টি খুলতে খুলতে যুবকটি বলল।

দ্বিতীয় তরুণ তার আপন পরিধেয় দরজার কবাটে মেলে দিতে দিতে বলল, "কিন্তু, যাই বল—গরম কালের পক্ষে এগুলো ভালই"—সন্ধ্যা হতে তখনও দেরী ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই পান্থশালায় অগ্নিকুণ্ডলীর কিনারায় লোক জুটতে শুরু করেছিল। তরুণদ্বয় ধোঁয়াভরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে না বসে জানালার ধারে গিয়ে বসল, ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দুটো কম্বল জড়িয়ে নিল।

প্রথম তরুণটি বলল, "আমরা এখনও এক যোজন পথ হাঁটতে পারতাম, তাহলে কাল ভোরে গান্ধার নগর (তক্ষশিলায়) পৌঁছুতে পারতাম, কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এই (আট মাইল) পথ চলা বড় কষ্টকর।"

দ্বিতীয় তরুণ বলল, "শীতের আগমনকালীন ঋতুর এই পরিবর্তন খুবই খারাপ লাগে—এখন বর্ষায় চারিদিক ছেয়ে যাবে। অথচ এই বৃষ্টি না হলে কৃষকেরা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করবে—পশুপালকেরা করবে কান্নাকাটি।"

প্রথম জন উত্তর দিল, "মিত্র, ঠিকই বলেছ। একমাত্র আমাদের মতো পথিকরাই এই বৃষ্টিধারা পছন্দ করে না। আর সকলে তো সদা-সর্বদা পথে থাকে না।" এমন সময় তার সঙ্গীটির গলায় ক্ষতচিহ্নের প্রতি নজর পড়ায় সে প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি মিত্র ?"

"পাল মাদ্র। আর তোমার ?"

"বরুণ সৌবীর। তাহলে তুমি পূব দিক থেকেই আসছ ?"

"হাঁ মাদ্রদেশ থেকে।" আর তুমি দক্ষিণ থেকে তো ? আচ্ছা মিত্র বল তো, আমরা যে শুনেছি অসুররা এখনও আর্যদের সাথে লড়াই করছে।"

"একমাত্র সমুদ্রতটের পারে একটি শহরকে কেন্দ্র করে এই লড়াই চলছে। তোমরা

তা জান না, মিত্র? আমাদের মঘবা ইন্দ্র কি ভাবে অসুরদের একশো নগর তথা দুর্গ ধ্বংস করেছিল?"

"শুনেছি, অসুরদের নগর-দুর্গ লোহার (তামার) তৈরী ছিল।"

"অসুরদের অনেক লোহা আছে বটে, কিন্তু এত নেই যে তা দিয়ে তারা দুর্গ বানাতে পারে। এই গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কি করে তা জানি না। তাদের বাড়ী, ঘর ইট দিয়ে বানানো হয়, শহরের চার পাশের মোটা দেওয়ালও ইটের গাঁথুনী। মাটি আগুনে পুড়িয়ে লালচে রংএর ইট হয় বটে কিন্তু তা মাটির চেয়ে চারগুণ শক্ত—লোহার মত মজবুদ্। তবু ইট আর লোহার (তামার) তফাৎ অনেক। অনেকে ভুল করে ইটকে হয়তো লোহা মনে করে। বেওকুফী আর কি?"

"তুমি যাই বল, বরুণ, আমরা কিন্তু লৌহ দুর্গের কথাই শুনেছি।"

"আমাদের ইন্দ্রকে দুর্গ ধ্বংস করতে অনেক কষ্ট ও শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে—তাই বোধহয় এ দুর্গ লৌহনির্মিত বলে কথিত হয়েছে।"

"তা ছাড়া সম্বরের শৌর্যবীর্যের কথা—কত না কাহিনী আমাদের কানে এসেছে। সমুদ্রের মধ্যে তার নাকি ছিল ঘর, আকাশ পথে রথ উড়ে চলত।"

"রথের কথা তাহা মিথ্যা, একেবারেই আজগুবি। তাছাড়া অশ্বারোহী যোদ্ধা হিসাবে অসুররা সবচেয়ে দুর্বল। এখনও, এমন কি তাদের উৎসবের সময় অশ্বরথের জায়গায় বৃষরথ নিয়ে আসে। আমি তো বুঝতে পারছি পাল, আমরা যুদ্ধে জিতেছি এই ঘোড়ার জোরে—ভাল ঘোড়সওয়ার হতে না পারলে যুদ্ধে আমরা অসুরদের হারাতে পারতাম না। সম্বর প্রায় দু'শ বছর হল মারা গেছে। আমার তো ধারণা আকাশ পথে উড়ে যাওয়া তো দূরের কথা—তার কাছে অশ্বরথ পর্যন্ত ছিল না।"

"সম্বর যদি এত সাধারণ মানুষ ছিল, তবে ওই অসুর শত্রুকে পরাজিত করায় আমাদের (আর্য) ইন্দ্রের এত নাম ডাক কেন?"

"কারণ, সম্বর ছিল এক খুব বড় বীর!" সৌবীর নগরে আমি তার স্বর্ণখচিত তাম্র কবচ (বর্ম) দেখেছি—তা যেমন দৃঢ়, তেমনিই বিশাল। অসুররা সাধারণভাবে বেঁটে গড়নের—কিন্তু সম্বর ছিল বিরাটকায় মানুষ—দীর্ঘ, বিশাল, মেদবহুল ছিল তার দেহ। এই লম্বা-চওড়া লোকটি ছিল খুবই বলিষ্ঠ। আর আমাদের মঘবন্ ইন্দ্র ছিল পাতলা ছিপছিপে জোয়ান মানুষ। সিন্ধু নদের তীরে এখনও তুমি দেখতে পাবে পুরানো দিনের অসুর নগরীর অবশেষ। মনে কর সেই দিনের কথা, সেই দুর্গের মধ্যে থেকে কিছু তীরন্দাজ হাজার হাজার আক্রমণকারীকে হটিয়ে দিত। ঐ দুর্গগুলো ছিল দুর্ভেদ্য—আর এই অপরাজেয় পুরীকে ধ্বংস করেছিল আমাদের ইন্দ্র মাঘব—তাই তাকে অতুল পরাক্রমশালী রণনেতা ইন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়।"

"আচ্ছা বরুণ, দক্ষিণে কি অসুরদের শক্তি অটুট আছে?"

"তোমাকে কি বলিনি, সমুদ্রতটের শেষ দুর্গও অসুররা হারিয়েছে—আমরা তা ধ্বংস করেছি। এই যুদ্ধে আমিও যোগ দিয়েছিলমে।"—এই কথা বলতে বলতে বরুণের

অরুণ মুখমণ্ডলে আরো রক্তিমাভা ফুটে উঠল—আর সে তার দীর্ঘ সোনালী চুলের গোছা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল "অসুরদের সর্বশেষ দুর্গের পতন হল।"

"এই যুদ্ধে আমাদের ইন্দ্র কে ছিল।"

"ইন্দ্রের পদ আমরা বিলোপ করেছি।"

"বিলোপ করেছ ?"

"হাঁ, আমরা দক্ষিণের আর্যরা ক্রমেই আশঙ্কিত হচ্ছিলাম।"

"আশঙ্কিত হচ্ছিলে ? কেন ?"

"ইন্দ্র মানে সেনানায়ক, এই তো ?"

"হাঁ।"

"আর্যরা সেনানায়ককে সর্বেসর্বা বলে মেনে চলতে রাজী নয় ! যুদ্ধের সময় সেনানায়কের আদেশ যতই শিরোধায হক না কেন—আর্যরা সবসময় তাদের জন-পরিষদকে সব চেয়ে বড বলে স্বীকার করে—সেখানে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে নিজের চিন্তাধারা উপস্থিত করবার অধিকারী।"

"হাঁ, ঠিকই তো, এ অধিকার আছে।"

"কিন্তু আর্যদের বিরুদ্ধবাদী অসুরদের প্রথা অন্য রকম। তারা ইন্দ্রকে রাজা বলে মনে করে। আর এই রাজা নিজেকেই সব কিছু মনে করে—তার ওপরে জন-পরিষদকে স্থান দেয় না। অসুর-রাজের মুখ দিয়ে একবার যা বেরিয়ে গেল তা সমস্ত অসুরের অবশ্য পালনীয়—আর তা না করলে মৃত্যু বরণ করতে হবে।"

'না, এ ধরনের ইন্দ্রকে আমরা কখনো স্বীকার করতে পারি না।"

"কিন্তু অসুরেরা এই ধরনের ইন্দ্রকেই বরাবর মেনে এসেছে। তারা তাঁদের রাজাকে মানুষের উর্ধ্বে দেবতার আসনে বসিয়েছিল। জীবিত মানুষ রাজাকে পূজা পর্যন্ত করত এ কথা শুনলে তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য হবে। আর এই পূজার অনুষ্ঠানের কথা বললে তুমি তো বিশ্বাসই করবে না।"

"হাঁ, আমি নিজেই দেখেছি অসুর পুরুতরা তাদের লোকেদের কি রকম গাধা বানিয়ে ছাড়ে।"

"তারা জনসাধারণকে গাধার চেয়েও ছোট মনে করে। তুমি বোধ হয় শুনেছ তারা শীঠ (লিঙ্গ) ও পূজা করে ? শরীরের এই প্রত্যঙ্গ দুটি নর-নারীর সুখ-সম্ভোগের এবং ভবিষ্য বংশ সৃষ্টির কারণ বটে কিন্তু তাকে পূজা করা আহাম্মুকি নয় কি ? অনেক জায়গায় আবার মাটির লিঙ্গ প্রতিমূর্তি করে পূজা করা হয়।"

"আহাম্মুকি তো বটেই।"

"আর অসুর রাজারা এই ধরনের পূজায় বিশেষ আসক্ত। আমার কিন্তু মনে হয়, এই সমস্তর মধ্যে একটা মস্ত বড় চালাকী আছে, বিশেষতঃ অসুর রাজরা তাদের পুরোহিতরা মূর্খ হয় না, তারা আমাদের আর্যদের চেয়ে চতুর। তাদের মত নগর বা দুর্গ বানাতে আমাদের অনেক শিখতে হয়েছে। তাদের দোকান পাট, কমল শোভিত

পুষ্করিণী, তাদের বৃহদাকার প্রাসাদ শ্রেণী, তাদের রাজপথ—এ সমস্ত জিনিস তুমি আমাদের এই আর্য ভূখণ্ডে দেখতে পেতে না। আমি উত্তর সৌবীরের পরিত্যক্ত অসুর নগরী ও অধুনা বিজিত অসুর নগরটি দেখেছি। আমরা আর্যরা তাদের পুরনো নগরগুলির সংস্কার বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও সক্ষম হই নি—বিশেষ করে এই নতুন নগর—যা সম্বর নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে প্রবাদ আছে তা তো দেব-পুরীর মত।"

"বল কি, দেবপুরী?"

"সত্যি বলছি। পৃথিবীর কোন জিনিসের সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। একটি পরিবারের বাসপোযোগী থাকবার গৃহের কথাই বল না কেন? তাতে আছে—সুসজ্জিত বৈঠকখানা, চুল্লী সমেত রান্নাঘর—তার ধোঁয়া বেরোবার আলাদা চোঙার ব্যবস্থা, চত্বরে বাঁধানো কূপ, স্নানের ঘর, শোবার ঘর আর তা ছাড়া আছে আলাদা গোলাঘর। দু-তিন তলার বাড়ী দেখেছি—সেখানে সাধারণ লোকেরাই থাকত। এর সঠিক বর্ণনা দেওয়াও শক্ত, তুলনা করতে হয় দেবপুরীর সঙ্গেই।"

"পূব দেশেও অসুর নগরী আছে, সেগুলো আমাদের মদ্র দেশ থেকে অনেক দূরে।" [বর্তমান শিয়ালকোটের কাছে]

"আমি তাও দেখেছি, মিত্র! এ রকম নগর যারা নির্মাণ করেছে, যারা পরিচালনা করেছে—তারা যে আমাদের থেকে অনেক বুদ্ধিমান ও চতুর তা স্বীকার করতেই হবে। তুমি সমুদ্রের কথা শুনেছ কখনো?"

"নামে শুনেছি।"

"নাম শুনে বা বর্ণনা শুনে তুমি মহাসাগর সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারবে না। সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে যখন তুমি দেখবে তার নীল জলরাশি আকাশ স্পর্শ করেছে—তখন তোমার চেতনায় আসবে—কিছুটা অনুমান করবে।"

"আকাশ পর্যন্ত কি করে তা পৌছুতে পারে, বরুণ?"

"হাঁ, তাই হয়। তোমার দৃষ্টি যতদূর যাবে—তুমি দেখবে বিশাল জলরাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গে ক্রমেই ওপরে উঠছে—তাল তাল পরিমাণ ফেনিল জলরাশি ক্রমেই আকাশ স্পর্শ করছে। উভয়ের বর্ণও এক, কারণ সমুদ্রের নীলাকাশের মতই নীল। আর দিগন্তহীন সাগরে অসুররা তাদের বড় বড় নৌকো নির্ভয়ে ভাসিয়ে দেয়—মাস-বছর অতিক্রম করে সমুদ্র পথে ঘুরে বেড়াত—আর সমুদ্র পার থেকে রত্ন-ভাণ্ডার সংগ্রহ করে আনত। অসুরদের সাহস ও কুশলতার এও একটা নজীর। এ ছাড়াও আর একটি আছে যা তুমি কোন দিন শোন নি। অসুররা মুখ ছাড়াই কথা বলতে পারে।"

"এঁ্যা! শব্দ না করে? কি বলছ মিত্র?"

"হাঁ বিনা শব্দে। মাটি ও পাথর দিয়ে চামড়া বা কাপড়ের ওপর দাগ কেটে যাবে—অন্য অসুররা একটা শব্দ না শুনে বা মুখের দিকে না তাকিয়েই এ সঙ্কেত বুঝতে পারবে। আমরা যা দু ঘণ্টা কথা বলে বোঝাতে পারব না, তা তারা পাঁচ ঘণ্টার সঙ্কেত

দ্বারা বুঝিয়ে দেবে। আর্যরা এ বিদ্যা জানত না। এখন তারা এই সব সঙ্কেত বুঝতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে শিখেও আয়ত্ব করতে পারছে না।"

"একথা নিঃসন্দেহ যে, অসুররা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল।"

"দেখ না কেন! এখন আমরা তাদের সর্বত্রই কারিগর, মৃৎশিল্পী তন্তুবায় রথ প্রস্তুত-কারক ও কর্মকার হিসাবে দেখতে পাই। তারা যে আমাদের চেয়ে গুণী তাতে আর সন্দেহ কি?"

"আর তুমিই তো বলছ অসুররা বীরও বটে।"

"হাঁ, বীর তো বটেই! তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর্যদের মত ওদের বাচ্ছারা মায়ের পেট থেকে পড়েই তরবারি নিয়ে লড়াই করতে ছোটেনা।

"ওদের মধ্যে আছে কারিগর, বনিক্, দাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী—তেমনি সেনানী বা যোদ্ধা হচ্ছে আলাদা শ্রেণী। যোদ্ধশ্রেণীর বাইরে কেউ অস্ত্রবিদ্যা শেখে না। আর দাসেরা পশুর থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে খারাপ থাকে। তারা শুধু এদের বেচা-কেনাই করত না, তারা এদেব দেহ এবং জীবনের উপরেও প্রভুত্ব করত—যা খুশী তাই করত।"

"তাদের যোদ্ধা কত?"

"শতকরা একজনও হয়ত তাদের সৈন্য নয়, কিন্তু দাসের সংখ্যা অনেক বেশী—শতকরা চল্লিশজন, আর তাদের কারিগর কৃষকরাও অর্ধ-দাস, শতকরা দশজন হবে ব্যবসায়ী আর বাকীরা বৃত্তিধারী।"

"তাই তো অসুব আর্যদের কাছে হেরে গেল।"

"হাঁ, ওদেব হেরে যাওয়ার মধ্যে এটা একটা প্রধান কারণ বটে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তারা রাজাকে দেবতা বলে মানত—তাকে জনসাধারণের চেয়ে অনেক ওপরে স্থান দিয়েছিল।"

"আমরা—আযরা এ ব্যবস্থা কখনই মানব না।"

"এইজন্যেই তো আমাদের ইন্দ্রের পদ বিলোপ করতে হল। মাধবের পর এক ইন্দ্র অসুর-রাজার মত হ্তে চেয়েছিল।"

"অসুররাজের মত?"

"হাঁ, আর সে কি একা, তার পর আরো একজন ইন্দ্র এই চেষ্টা করতে লাগল। আর দেখা গেল কয়েকজন আর্য তার সমর্থনে ষড়্‌যন্ত্রের সহযোগিতা পর্যন্ত করছে।"

"সহযোগিতা করতে দেখা গেল!"

"তাই সমগ্র জন পরিবারের স্বার্থ বিবেচনা করে সৌবীর-জন সিদ্ধান্ত নিল যে, এর পর আর কাউকে ইন্দ্র করা হবে না। বজ্র বারণ করেন যে দেবতা তার নামের সঙ্গে মিশে এই নামের মোহ মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করেছিল—ইন্দ্রপদ তুলে দেওয়ার সেটাও কারণ বটে।"

"মিত্র, সৌবীরজন ভাল কাজই করেছে।"

"কিন্তু আর্যনামে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য কিছু লোক আবার পয়দা হয়েছে—যারা

অসুরদের সব কিছুকেই প্রশংসা করতে ক্লান্তিবোধ করে না। তাদের অনেক কিছুই প্রশংসা করার আছে মানি, আমি নিজেও তার সমাদর করি—মনে করি তার অনেক কিছু গ্রহণ করা যায়। আমরা তাদের হাতিয়ার দেখেই আমাদের অস্ত্র বানিয়েছি, তাদের গো-শকট দেখেই তো আমাদের মাঘব-রাজ তার অশ্বরথের পরিকল্পনা করেছিল। একজন তীরন্দাজের পক্ষে ঘোড়ার চেয়ে রথে বসে যুদ্ধ করা অনেক বেশী সুবিধাজনক। রথে সে কত বেশী তূণ রাখবার থাপ রাখতে পারে, শত্রুর তীর থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবরণও রাখতে পারে। আর্যরা অসুরদের কাছ থেকে তাদের বর্শা, গদা, শক্তি প্রভৃতি থেকেও অস্ত্রাদি সম্পর্কে অনেক শিক্ষা পেয়েছে। অসুরদের নগর পরিকল্পনা থেকে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি, তাদের কাছ থেকে সমুদ্রযাত্রা আমাদের শিখতে হবে কারণ, তামা ও অন্যান্য ধাতু-রত্ন এবং অন্যান্য জিনিস সাগর তীর থেকে আসে ; আর এখনো এই ব্যবসা অসুর ব্যবসায়ীদের একচেটিয়াও বটে। আমরা যদি তাদের থেকে স্বতন্ত্র হতে চাই তাহলে সাগরে নৌ-চালনা শিক্ষা করতেই হবে। তবু এমন অনেক বিষয় আছে যা অসুরদের কাছ থেকে নেওয়া বিপদ্‌জনক—যেমন লিঙ্গপূজা।"

"কিন্তু লিঙ্গপূজা কোন্ আর্য স্বীকার করে নেবে!"

"আর বলোনা মিত্র! এমন অনেক আয আছে যারা বলছে অসুরদের মতো আমাদেরও নিজেদের পুরোহিত বানানো উচিৎ। আমাদের এখানে অসুরদের মতো পুরোহিত, ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, সবাই সবকাজ খুশীমত করতে পারে কিন্তু অসুররা আলাদা আলাদা শ্রেণী বিভাগ কবেছে। এখন একবার যদি আর্যদের মধ্যে পুরোহিত সৃষ্টি করতে দাও তো দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই লিঙ্গপূজাও শুরু হয়ে যাবে। অসুর পুরোহিতরা খুব খারাপ হয়—লাভ ও লোভের জন্যে আয পুরোহিতদেরও ঐ কাজই শুরু করতে হবে।"

"এ তো অত্যন্ত খারাপ হবে, তাহলে বরুণ!"

"গত দুশো বছর ধরে অসুরদের সংস্পর্শে এসে আর্যদের মধ্যে কতই না পাপ প্রবেশ করেছে। আর তাই দেখে বৃদ্ধরা ক্রমেই হতাশ হচ্ছে। আমি অবশ্য নিরাশ হইনি। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি অতীতের মহান্ দিনগুলির কথা আয জনদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়—যদি তাদের ভালো করে বোঝান যায়—তবে তারা পথ ভ্রষ্ট হবে না, হতে পারে না। শুনেছি তক্ষশীলায় অঙ্গিরা নামে এক আর্যঋষি আছেন, তিনি আর্যদের পৌরাণিক বিশারদ। তিনি আর্যমার্গে চলবার শিক্ষা দেন। আমি আর্যদের বিজয়ের জন্য তরবারি ধরেছি। এখন আর্য রীতি-নীতি রক্ষার জন্যে কিছু করি।"

"কি আশ্চর্য মিলন! আমিও তো চলেছি ঋষি অঙ্গিরার কাছে, আমি চাই তাঁর কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে।"

"খুবই ভাল, কিন্তু পাল! তুমিতো এখনো পূবদিকের আর্যজনদের কথা কিছুই বলনি!"

"পূবদেশের আর্যজন দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ছে। গান্ধারের পরের ভূখণ্ড আমরা

মদ্ররা দখল করেছি। তার পরের অঞ্চল দখল করেছে মস্থরা, এবং ক্রমশঃ কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি জন বড় বড় প্রদেশ আপন আপন করতলগত করেছে।"

"তাহলে তো আর্যরা ওখানে সংখ্যায় অনেক বেশী।"

"না, খুব বেশী নয়। যতই তারা এগিয়ে চলছে ততই অসুর ও অন্যান্য জাতির সম্মুখীন হচ্ছে।"

"অন্যরা আবার কারা।"

'অসুরদের গায়ের রং হচ্ছে মাগুর মাছের মত তামাটে। পূব দিকে একরকম লোক —আছে তাদের কোল বলা হয়—তারা কয়লার মত কালো। এই কোলেরা গ্রামেও থাকে আবার হরিণের মত জঙ্গলেও থাকে। বন্য কোলেরা নানা রকমের পাথরের অস্ত্র এখনো তৈরী করে থাকে।"

"তাহলে তো মনে হয় এই অনার্যদের খুবই লড়াই করতে হয়।"

"বড় ধরনের সামনা-সামনি যুদ্ধ খুব কম হয়। আর্যদের ঘোড়া দেখলেই অনার্যরা পালিয়ে যায়। কিন্তু রাতের বেলা আমাদের ঘর আক্রমণ করে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমাদের অনেক সময় ক্রুর ব্যবহার করতে হয়। ফলে অসুর এবং কোলরা গ্রাম ছেড়ে জনশূণ্য হয়ে গেছে। এখন তারা ক্রমেই পূবদিকে পালিয়ে যাচ্ছে।"

"তাহলে পাল! তোমাদের ওখানে অসুরদের রীতি-নীতির প্রভাবের বড় কোন ভয় নেই?"

"মদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রভাব পড়ার ভয় নেই, ভল্লদের বেলাও একথা বলা যায়। আরো আগের কথা বলতে পারি না, আমাদের ওখানে অনার্যরা জঙ্গলের বাসিন্দা হয়েই রয়ে গেল।"

দুই বন্ধু এইভাবে রাত্রি পর্যন্ত তাদের পরস্পরের খবরাখবর ও গল্পে মশগুল ছিল। অতিথিশালায় পরিচারিকা এসে খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস না করলে তাদের কথা হয়ত শেষই হত না। এই অতিথিশালাটি নির্মিত হয়েছিল গ্রামবাসীদের খরচে—পথিকদের বিশেষ কষ্টে শ্বেত জাতির (পীতকেশী) পথিকদের বিশ্রামের জন্য নির্মিত একথা অবশ্য বলার কোন দরকার হয় না। যাদের কাছে আহার্য কিছু থাকত না—তাদের চাল ভাজা ও গো-মাংসের সুরুয়ার ব্যবস্থা করা হত। কোন পথিকের কাছে খাদ্যবস্তু থাকলে তা সে অতিথিশালার রক্ষকের কাছে দিলে সে রান্না করে খাবার তৈরী করে দিত; আর তা না থাকলে সমতুল্য কিছু দিতে হত। এই অতিথিশালাটি মদ ও সোমরসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বরুণ এবং পাল ভাজা গো-মাংস এবং মদ্য একত্রে পানাহার করে তাদের বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে নিল।

২

সিন্ধু নদের পূর্ব পারের এই জনপদশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন ঋষি অঙ্গিরা, তিনি একদা জনপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন। পুষ্কলাবতীর (চর সদ্দা) প্রথম লড়াইএর পর অসুররা পিছু হটতে সুরু করেছিল। তার পরবর্তী পুরুষে গান্ধার জনের একটি শাখা কুনার তীর থেকে এসে পশ্চিম গান্ধার জনকে পরাভূত করে অধিকার করল। তাই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য অসুরগণ খুব তাড়াতাড়ি পশ্চিম গান্ধার দেশ খালি করতে লাগল। মাত্র তিরিশ বছর যেতে না যেতেই গান্ধার ও মদ্ররা সিন্ধুনদের পূব-পারের ভূখণ্ড আক্রমণ করল। বিজিত দেশ তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল; বিতস্তা থেকে সিন্ধুর মধ্যকার ভূমি পেল গান্ধার জন আর বিতস্তা থেকে ইরাবতীর মধ্যকার ভূখণ্ড দখল করল মদ্র জন। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ দুটি অঞ্চলই দখলকারীদের নামানুসারে পূর্ব গান্ধার ও মদ্র জনপথ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। এই আরম্ভিক দেবাসুর যুদ্ধে (অর্থাৎ আর্য ও অসুরদের যুদ্ধে) উভয় জাতিই অমানুষিক নৃশংসতায় পাল্লা দিয়েছিল—যার পরিণামে গান্ধার ভূমিতে একটি অসুরও অবশিষ্ট ছিল না—বিলকুল লোপ পেয়েছিল। মদ্রদের ভূখণ্ডেও খুব অল্প সংখ্যক অসুর অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধেরও আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়তে লাগল। পীতকেশীরাও (পীতবর্ণ আর্যরাও) তাদের যুদ্ধের সময়কার নিষ্ঠুরতা কমিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং যে রকম বরুণ সৌবীর বলেছিল ঠিক তেমনি পীতকেশীদের ওপর অসুরদের নানা প্রকার প্রভাব পড়তে লাগল। ঋষি অঙ্গিরা বক্ষু উপত্যকা থেকে আগত আর্যদের অতীত ঐতিহ্যের শুধুমাত্র বড় পণ্ডিতই ছিলেন না, পরন্তু তিনি চাইতেন আর্যরা তাদের রক্ত ও আচার ব্যবহারের বিশুদ্ধতা বজায় রাখুক। এই কারণেই পূর্ব গান্ধার দেশে অশ্ব-মাংস খাওয়া এক রকম বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আবার সেখানে অশ্ব পালন প্রথা পুনরায় চালু করলেন। ঋষি অঙ্গিরার এ আর্যপ্রীতি—আর্য ঐতিহ্য ও আর্য শিক্ষায় তার অনুরক্তি এবং যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ কুশলতার খ্যাতি—তাঁকে এমনি প্রথিতযশা করে তুলেছিল যে সুদূর আর্য জনপদ থেকে আর্য কুমারগণ তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসত। কিন্তু সেদিন কে জানত যে, অঙ্গিরা রোপিত গান্ধার পুরের এই বিদ্যা-অঙ্কুর ভাবীকালে একদিন তক্ষশীলা-বিশ্ববিদ্যালয়-রূপ বিশাল মহীরুহে পরিণতি লাভ করবে—কে সেদিন জানত এই মহীরুহের ছায়ার তলায় সুমিষ্ট ফললাভের প্রয়াসে সহস্র যোজন পথ দূর থেকে আর্যগাথার ভক্তরা ছুটে আসবে।

ঋষি অঙ্গিরার বয়স তখন ৬৫ বছর। পলিত কেশ কটি-বিলম্বিত শ্বেত উজ্জ্বল শ্মশ্রু এবং শান্ত সৌম্য মুখমণ্ডল এই ঋষির আকৃতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেদিন থেকে কয়েক শতাব্দী পরে কালি কলম ও ভূর্জপত্রে লেখার রীতি মানুষের আয়ত্বে

এসেছিল। তখন ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ।—তাই সব শিক্ষাই প্রদত্ত হত মৌখিকভাবে, বিদ্যার্থীরা পুরাতন সঙ্গীত ও কাহিনী বার বার আবৃত্তি করে রাতে মুখস্ত করত—স্মরণে রাখত। দূর দেশ থেকে আগত বিদ্যার্থীরা নিজেদের খাদ্য বস্ত্র দীর্ঘদিনের জন্যে সঙ্গে আনতে পারে না—ঋষি অঙ্গিরাকেই আহার ভূষণের ব্যবস্থা করতে হত। এর জন্যে তাঁর নিজের জমি চাষ করার পরও বিদ্যার্থীদে· দিয়ে জংলা জমি সাফ করে নতুন আবাদ করেছিলেন।—তাইতেই সারা বছরের উপযোগী যথেষ্ট গম উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত পুষ্প উদ্যান করার রেওয়াজ হয়নি; কিন্তু বনের জংলী ফল মূল যখন পাকবার সময় হত তখন তিনি নিজের শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে সেখানে তা আহরণে যেতেন, তখন তার ফুলও সংগ্রহ করতেন। চাষেব কাজে, বীজ বপন, ফসল কাটা অথবা ফুল, ফল, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের সময় বিদ্যার্থীরা বক্ষুর তীরে স্বর্বাস্তর তটভূমিতে রচিত গানগুলি পরম আদরে উচ্চ রাগিনীতে সমবেতভাবে গাইত। অঙ্গিরার অশ্বশালাও ছিল গান্ধারের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দূরদূরান্তের শিষ্য বা পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ পাঠাতেন ভাল জাতের ঘোড়া ভেট আনবার জন্যে, উচ্চ শ্রেণীর ঘোটক ঘোটকী সংগ্রহ করে ভাল জাতের ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতেন। পরবর্তীকালে বহুখ্যাত সিন্ধী-ঘোটক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরই অশ্বশালা থেকে। এ ছাড়া হাজার হাজার গরু ও ভেড়া ছিল ঋষি অঙ্গিরার। তাঁর শিষ্যদের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কাজও—শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করতে হত। অঙ্গিরা নিজেও কাজ করতেন। কারণ কায়িক পরিশ্রম না করলে সকলের খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান হতে পারে না। যাতে বিদ্যাভ্যাসের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তাই কাজও করতে হত সকলকে।

তক্ষশীলার পূবদিকের অধিকাংশ পাহাড় ছিল সুজলা সুফলা সবুজে ভরা। একদিন বরুণ ও পাল একদল বিদ্যার্থীর সাথে পশুচারণ ভূমিতে কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁবু থেকে অনতিদূরে শ্বেত ও লোহিতাভ বর্ণের গো-বৎস খেলে বেড়াচ্ছিল। আর ঋষি শিষ্যদের মাঝে ঘাসের পরে বসে তকলি কাটছিলেন, তাঁর বাঁ-হাতে ছিল পশমের পাঁজা আর ডান-হাত দিয়ে ঘোরচ্ছিলেন তকলি। শিষ্যরা কেউবা তকলি কাটছিল, কেউবা পশম পরিষ্কার করছিল আর কেউবা হাত দিয়ে পশম বার করছিল। অতীত ও বর্তমানের আর্য ও অনার্যের রীতি, নীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয় আর কোনটা বর্জন করতে হবে—তা ব্যাখ্যা করছিলেন।

"বৎস! যা কিছু নতুন তা সবই পরিত্যাগ করতে হবে, অথবা প্রাচীন হলেই তা গ্রহণযোগ্য—এই ধরনের কথা খুবই ভুল—আর এই আপ্ত বাক্য কাজে লাগানো তো একেবারে অসম্ভব। বক্ষু নদীর তটভূমিতে আর্যরা যেদিন পাথরের অস্ত্রাদি ছেড়ে উন্নত ধরনের তামার অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখল—সেদিন কত লোকই না নতুন হাতিয়ারের বিরুদ্ধতা করেছিল।"

ঋষির প্রিয় শিষ্য বরুণ প্রশ্ন করল, "পাথরের অস্ত্রাদি দিয়ে কিভাবে কাজ চলত?"

"আজ বৎস, লোহা ও তামার প্রচলন হয়েছে—তাই লোহা ও তামার হাতিয়ার

খুবই তেজালো মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি এর চেয়েও তীক্ষ্ণ কোন ধাতুর হাতিয়ার গড়া হয় তখন আবার মানুষ হয়ত তোমার মত প্রশ্ন করবে লোহা দিয়ে, তামা দিয়ে হাতিয়ার বানিয়ে কিভাবে কাজ চালাত। মানুষ যখন যে হাতিয়ার সংগ্রহ করতে পারে—তখন তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়—সেই ভাবেই তারা অভ্যস্ত হয়। যখন পাথরের কুড়ুল দিয়ে যুদ্ধ করত তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদের পাথরের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু যে-ই একপক্ষ তামার তরবারি ব্যবহার শিখল—তখনি অপরপক্ষের কাছে পাথরের কুড়ুল ত্যাগ করে তামার তরবারি ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে উঠল। আর তারা যদি তা না করত এ দুনিয়াতে তাদের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকত না। তাই আমি বলছিলাম সমস্ত নতুন চিন্তাধারা পরিত্যাজ্য একথা খুবই ভুল। আমি যদি নতুনের বিরোধী হতাম তো এত সুন্দর সুন্দর ঘোড়া গরু প্রতিপালন করতে পারতাম না। আমি যেদিন জেনেছি যে ভালো ঘোড়ার বাচ্ছা পেতে হলে ভালো জাতের ঘোটক ঘোটকীর মিলন চাই। নিজে দেখে আমি ভালো ভালো ঘোটক ঘোটকী সংগ্রহ করেছিলাম, তাই আজ পঁয়ত্রিশ বছর পরে অঙ্গিরার এ জাতীয় শ্রেষ্ঠ ঘোটক-ঘোটকী দেখতে পাচ্ছ।

"অসুররা ক্ষেতের জমি ভালভাবেই দেখা শোনা করত, তাতে ভালো সার দিত। তারা পাহাড়ী নদী থেকে খাল কেটে সেচের যে ব্যবস্থা করত—তা যে খুব উঁচু ধরনের এ কথা আমরা গান্ধাররাও স্বীকার করেছি। তাদের শহর গড়ার কায়দা ও চিকিৎসার নানা রকম ভালো ব্যবস্থা—সবই আমরা গ্রহণ করেছি। একথা ভাবলে চলবে না যে, এটা নতুন না পুরানো, এটা আর্য না অনার্য —একথা বাদ দিয়েই খাওয়া, পরা ও জীবন ধারণের মানকে উন্নত ও সহজ করার জন্য যত রকম জিনিস পাওয়া যায়—তা স্বীকাব করতে হবে, কাজে প্রয়োগ করতে হবে। সুবাস্তর মানুষেরা, আর তারও আগে আর্যরা কাপাস তুলোর ব্যবহার জানত না, সূতী বস্ত্রের নাম পর্যন্ত শোনেনি। কিন্তু আমরা এখন গ্রীষ্মকালে সুতির কাপড় পরি, গরমের দিনে এই কাপড় খুবই আরামদায়ক।

"কিন্তু এইভাবে নতুন জিনিস আমরা যেমন গ্রহণ করেছি তেমনি, অনেক-কিছু বর্জনও করেছি। এমন অনেক জিনিস আছে যে-গুলো বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত। অসুরদের লিঙ্গপূজা, ধর্ম অনুসরণ করা যেমন আমাদের পক্ষে নিন্দনীয়, তেমনি তাদের জাতি বিভাগও আমাদের বর্জন করা উচিত। কেননা, এই জাতি বিভাগের জন্যে সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্র ধারণ করে নিজেদের জনকে রক্ষা করতে পারে না। এতে শুধু নিজেদের মধ্যে ছোট ও বড়, উঁচু-নীচু এই ভাবনার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তবে এ কথাও ঠিক যে অসুরদের সাথে আমাদের রক্তের মিশ্রণ হওয়া উচিত নয়, কেননা, তাতে আমাদের অসুরবৃত্তি গ্রহণেরই পথ উন্মুক্ত হবে। আর এর ফলে আর্যদের মধ্যেও নানা শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছোট বড় জাতি বিভাগ দেখা দেবে।"

পাল প্রশ্ন করল, "রক্তের সংমিশ্রণকে প্রত্যেকটি আর্য খুব খারাপ বলে মনে করে কি?"

জবাবে ঋষি বললেন, "হাঁ, তবে এর জন্যে তারা ততো বেশী মনোযোগ দিতে রাজী নয়। আর্যরা কি অসুর কিম্বা কোল স্ত্রীদের কাছে সমাগম করে না?"

বরুণ—"সীমান্তের লোকেরা তো একথা বলেই থাকে যে, আমাদের সৈন্যরা অসুর-পুরীর বারাঙ্গনাদের কাছে হামেশাই যাতায়াত করে।"

ঋষি বললেন, "কথাটা ঠিক। কিন্তু, এর পরিণাম কি? এর ফলে বাড়বে বর্ণ-সংকরতা। অসুরদের মধ্যেও পীতকেশ বালক বালিকা জন্ম নেবে। ভ্রমবশত অথবা ধোঁকায় পড়ে আর্যরা এদের নিয়ে আসবে নিজেদের পরিবার পরিজনের মধ্যে, তখন আর্য-রক্তের বিশুদ্ধতা কোথা থেকে থাকবে বল ত? আর এই রক্ত-শুদ্ধতার জন্য চাই আমাদের সমস্ত আর্য স্ত্রী-পুরুষের জাতীয় সচেতনতা। আর এর জন্য চাই, যাতে আর্যদের মধ্যে দাসপ্রথা কিছুতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা। কারণ এর মত রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্টকারী সর্বনাশা জিনিস আর কিছুই নেই। পরন্তু, আমি তো বলব, আর্য-ভূমির মধ্যে অনার্যরা যাতে কিছুতেই প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।"

"সবচেয়ে বিপদ্‌জনক ও সকল মন্দের মূলে আছে অসুরদের রাজ-প্রথা—আর এরই অপর অঙ্গ হচ্ছে পুরোহিত প্রথা। অসুর-জন সমস্ত অধিকার হারিয়ে বসে আছে। অসুর-জনের কোন স্বাধীনতা নেই, অসুর রাজা যা কিছু বলবে সেই মত কাজ করাকে অসুররা আপন ধর্ম বলে মনে করে। অসুর পুরোহিতরা শেখায় যে, জনগণের ভাল-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে ওপরে ভগবান আর নীচে তার প্রতিনিধি রাজা; এই ধর্মমত অনুসারে সাধারণের কিছু বলবার বা করবার নেই। ধরিত্রীতে স্বয়ং রাজাই হচ্ছে দেবতা। তাই আমি যখন শুনলাম যে, শিবি-সৌবীররা ইন্দ্র পদ তুলে দিয়েছে—তখন খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। যদিও একথা ঠিকই যে, আর্যদের মধ্যে ইন্দ্র কোনদিনই এই স্থান অধিকার করতে পারেনি—যে স্থান অধিকার করেছে অসুর-রাজা। আর্যদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান হচ্ছে—জন কর্তৃক নির্বাচিত একজন বড় যোদ্ধা বা সেনাপতি মাত্র। জনের ওপর শাসন করবার কোন অধিকার তার নেই। তবুও ওই পদ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল এবং কিছু লোক ওই পদের আড়ালে থেকে আর্যদের মধ্যে রাজ-প্রথা কায়েমের চেষ্টাও করে-ছিল। আর্যরা যদি নিজেদের আর্যত্ব বজায় রাখতে চায় তো কাউকেই রাজ-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, আর তা উচিতও হবে না। আর্যদের মধ্যে অসুর ধর্মের প্রতি যে ঘৃণা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেদিন অসুরদের মত রাজপদের সৃষ্টি হবে—সেইদিনই অসুরদের মতই পুরোহিতেরও আবির্ভাব ঘটবে। আর এসব হলেই বুঝবে যে, আর্যদের আর্যত্ব নষ্ট হয়েছে। সমগ্র জন পরিশ্রম করবে, আর সেই পরিশ্রমের ফল রাজা করবে ভোগ। এর ওপর আছে পুরোহিত, পুরোহিতকে উৎকোচ দিতে পারলে ভগবানের আশীর্বাণী পাওয়া যাবে। এইভাবে রাজা ও পুরোহিতে মিলে সমগ্র জনকে তাদের দাস করে ছাড়বে।"

"আমাদের আর্যদের প্রাচীন রীতি-নীতিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে থাকতে হবে এবং যেখানেই কোন আর্য-জন ব্যতিক্রম ঘটাবে—তাদের আর্য-শ্রেণী থেকে দূর করে দিতে হবে।"

৩

সৌবীরের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এখানে নানান রকমের দুঃসংবাদ আসতে থাকায় বরুণ ক্রমেই চিন্তান্বিত হয়ে পড়ছিল; এই সমস্ত খবরে সে বুঝতে পারছিল যে, অসুরদের শেষ দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের নিজেদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর আত্মকলহের ঝড় উঠছিল। বরুণ কয়েকবারই সৌবীরের সমস্যা নিয়ে গুরুর সাথে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছিল। ঋষি অঙ্গিরার বক্তব্য ছিল যে, হতে পারে এই ঝগড়ার সূত্রপাত সৌবীরের মধ্যেই শুরু হয়েছে, কিন্তু একথা ঠিকই যে এই বিরোধ একদিন সারা আর্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আর্যরা চিরকাল জনের (সমষ্টির) অধিকারকে ব্যষ্টির উপব স্থান দিয়ে এসেছে। কিন্তু পাশাপাশি অসুরদের রাজসত্তার এই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগ-বিলাসিতার নিদর্শন অনেক আর্য নেতাকে ক্ষমতালোভী ও আত্মসর্বস্ব করে তুলবার—আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই দুই মনোবৃত্তির সংঘাতও ছিল অবশ্যম্ভাবী, আর যে জনপদে অসুররা সংখ্যায় বেশী ছিল—সংঘর্ষের সম্ভাবনাও সেখানে সৃষ্টি হল বেশী; কাবণ পরাজিত অসুররা আর্যদের এই আত্মঘাতী সংঘর্ষ থেকে কায়দা কবে ওঠাবার চেষ্টা করবে—তা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

সৌবীরপুর (বর্তমান রো-রি) থেকে আরো বিষণ্ন চিন্তাজনক খবর আসতে থাকায় বরুণ আট বছরের আবাসস্থল গান্ধারপুর ছেড়ে দেশে ফিরতে মনস্থ করল। এখানে আসার পথে ঋষি শিষ্যদের মধ্যে প্রথম যাকে পথ-চলা সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিল সেই পুরাতন বন্ধু পাল মাত্র তার সহযাত্রী হল। গান্ধারপুরের সীমানা অতিক্রম করে তাবা লবণ-পাহাড়ের পথ ধরে সিন্ধু জনপদে প্রবেশ করল। লবণের খনিতে কর্মরত ব্যাপারী ও শ্রমিকের মধ্যে অসুরদের সংখ্যা বেশী, আর এদের প্রভাব পীতকেশী আর্যদের ওপর যথেষ্টই পড়েছিল। আর্যরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অলস ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠছিল। তারা নিজেদের কাজগুলো অনার্য কারিগর দিয়ে করিয়ে নিত; তারা ভাবত তরবারি নিয়ে অস্ত্রচালনা করা বা অশ্বারোহণ করাই তাদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ। অসুররাজা যেমন অন্যের ওপর নিজের প্রতিপত্তি দেখাত—তেমনি একইভাবে অনার্যদের ওপর ছোট ছোট প্রতিপত্তি খাটাতে গিয়ে আর্যদের মনে রাজসত্তার অঙ্কুর উদ্‌গমের ভূমি প্রস্তুত হতে লাগল। দুই বন্ধু ধীর পদে আস্তে আস্তে লবণ পাহাড় অতিক্রম করে এসে পৌঁছল সৌবীর সীমান্তের প্রথম স্থানে (এই প্রথম স্থানকে বর্তমানে মূলস্থান বা মূলতান বলা হয়), এখানকার অবস্থা কিছুটা উন্নত বলে মনে হল। এখানকার সমস্ত অধিবাসী ছিল আর্য, আর এই জনের পক্ষে তা ছিল খুবই গর্বের ব্যাপার—এখানকার ভীষণ গরম সহ্য করে এই জনপদকে এরা পুরোপুরি আর্য জনপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বরুণ ও পাল সিন্ধুনদের ওপর দিয়ে

* তৎকালীন সৌবীর দেশ বর্তমান করাচীর খুবই কাছে।

নৌকা বেয়ে চলেছিল—তাই সময়টা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হলেও পুরো কষ্টটা তারা পায়নি। তবু সৌবীর নগরের আবহাওয়া ছিল অত্যধিক গরম—তার প্রভাব অবশ্যই কিছুটা পড়েছে।

আর্যরা তখন পর্যন্ত অক্ষর আবিষ্কার করতে পারেনি—তখনো এদের মধ্যে লেখার সংকেত (লিপি) প্রচলিত হয় নি। তাই বরুণ মাঝে মাঝে সৌবীরের পথিকদের মারফতে তার মিত্রদের কাছে যে সমস্ত সংবাদ পাঠাতো—তা পুরোপুরি কোনদিনই পৌঁছত না। এই সমস্ত সময় অসুরদের মধ্যে প্রচলিত লিপির কথা তার মনে আসত।

সৌবীরপুরে পৌঁছে সে বুঝতে পারল যে, অবস্থা অনেকদূর গড়িয়েছে। খাস সৌবীরপুরে সুমিত্রের সমর্থক খুবই কম ছিল; কিন্তু দক্ষিণ সৌবীরপুরে অসুরদের শেষ দুর্গ ধ্বংসকারীদের মধ্যে বহু আর্য সুমিত্রের পক্ষ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই শেষ দুর্গটি পতনের সময় সেনাপতি সুমিত্র অসুর নাগরিকদের প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুকম্পা দেখিয়েছিল বলে বরুণ সেই সময় তার খুব প্রশংসা করেছিল। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল, যে সেটা ছিল সুমিত্রের একটি চাল মাত্র। সুমিত্র জানত যে, অসুররা আর কোনদিনই আর্যদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারবে না; তাই তাদের ওপর এই অনুকম্পা দেখিয়ে সাগরপারের সার্থবাহ অসুরদের সম্পত্তি ও তাদের শক্তির সাহায্যে নিজের ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করতে পারবে।

সুমিত্র তখনও সমুদ্রতীরের অসুরপুরী আপন সৈন্য দিয়ে দখল করে রেখেছিল আর কাল্পনিক যুদ্ধ পরিচালনার অজুহাত সৃষ্টি করে সেখান থেকে ফেরবার নাম পর্যন্ত করত না। বরুণ জনের সাধারণ দলপতিদের সঙ্গে দেখা করে বুঝতে পারল যে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, তারা ভাবত ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে কোন কোন জন-নায়ক সুমিত্রের বিরোধিতা করছে। তবু যখন জনের শাসন ভারপ্রাপ্ত প্রধান জন-নায়কের সঙ্গে দেখা করল তখন সে বরুণকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলল এবং একথা বলল যে, সুমিত্রের পুরো উদ্দেশ্য যদিও তার কাছে খুবই স্পষ্ট—তবু একথা ঠিকই যে জনের সাধারণ মানুষ এখনও সুমিত্রের এই মতলবের কথা জানে না—তারা তাকে অন্যভাবেই দেখে।

অসুরপুরী আক্রমণের সময় বরুণ ছিল সুমিত্রের সহকারী সেনাপতি। ইতিমধ্যে যদিও ন'টা বছর কেটে গেছে; তবু আজও তার তরবারি চালনার প্রশংসা থেমে যায়নি। জনকে বুঝাবার আগে নিজেই অসুরপুরীতে গিয়ে সুমিত্র সম্পর্কে সঠিক সংবাদ নিয়ে আসা মনস্থ করল। এই উদ্দেশ্যে দুই বন্ধু একদিন দক্ষিণ সৌবীর যাত্রী একটি নৌকায় আরোহণ করল। তারা নিজেদের গান্ধারদেশী বণিকের বেশে সুসজ্জিত করেছিল। অসুরপুরী দেখে তাকে কিছুতেই আর্যদের নগরী বলে ভ্রম হয় না—তা সত্যি সত্যি অসুরদের পুরী ছিল। তখনও তা আর্যনগরী হয় নি। শহরের পণ্য বীথিতেও প্রাসাদমালায় পূর্ণ ছিল সমুদ্রযাত্রী অসুর বণিকদের নিয়ে আসা নানা দেশের বাণিজ্য সম্ভার। বহু অসুর সামন্ত পরিবার তাদের আপন আপন মহল্লায় আগের মতই সুখে বসবাস করছিল আর তাদের গৃহে দেখতে পাওয়া গেল পূর্বের মত শৃঙ্খলিত বন্দী দাস-দাসী অপেক্ষা করছে বিক্রি

হওয়ার জন্যে। এই সব দেখতে দেখতে ওদের মনে প্রশ্ন উঠল যে, এই পরিবেশে বিজয়ী আর্যরা কোথায় থাকে? সুমিত্র অসুররাজের পুরাতন রাজপ্রাসাদে বাস করে। একদিন বরুণ পাল মাত্রকে তার কাছে পাঠাল—গান্ধার বণিকের কাছ থেকে উপঢৌকন নিয়ে যাবার ছল করে। পাল ফিরে এসে বলল পীতকেশ ও গৌরবর্ণ বাদ দিলে সুমিত্র এখন পুরোপুরি একটি অসুররাজ বনে গেছে। তার প্রাসাদ আর আর্য সেনাপতির অনাড়ম্বর গৃহ নয়—রৌপ্য অলঙ্কারে ঝলমল অসুর প্রাসাদ কক্ষের মতই সুসজ্জিত। তার পার্শ্বচর সৈনিকদের মধ্যেও অনাড়ম্বরতার কোন চিহ্ন নেই। সপ্তাহ যেতে না যেতেই তারা ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট বুঝল যে—এখন আর্যদের খবর নিতে হলে অসুর কন্যাদের নৃত্য ও সুরাপানের আড্ডাগুলিতে সন্ধান করতে হবে। বহু আর্য রমণী তাদের স্বামীদের কাছে এসে গৃহ সংসার পাততে চায়—কিন্তু, কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে তাদের আসতে মানা করা হত। সুমিত্র তার স্ত্রীর কাছ থেকে বহু অনুরোধ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে আসতে নিষেধ করেছে, এদিকে সে নিজে অসুর পুরোহিতের কন্যাকে প্রেম সমর্পণ করেছে। আর শুধু তাই নয়, এ নগরীর বহু অসুর সুন্দরী-ই তার অন্তঃপুরচারিণী ছিল। নিজের আর্য সৈনিকদের জন্যে এ ব্যাপারে তার পূর্ণ শিথিলতা ছিল। কিন্তু অন্য আর্যরা যদি এখানে যাতায়াত শুরু করত তাহলে দাসেদের দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দিত—যাতে প্রায়ই খুন-খারাবি হত, ফলে আর্যরা এখানে আসা বন্ধ করত।

বরুণ সমস্ত বিষয়ে পুরোপুরি খবরাখবর নিয়ে একদিন তার বন্ধুর সঙ্গে চুপচাপ সৌবীর-পুরের দিকে যাত্রা করল।

বরুণ সৌবীরপুরে এসে জন-নায়কদের বলল যে, সুমিত্র ইতিমধ্যে তার শক্তি যথেষ্ট দৃঢ় করেছে, অসুরপুরের শুধু আর্য শক্তিই নয়—অসুরদের বিরুদ্ধেও আমাদের যুদ্ধ করতে হবে—আর এর জন্যে তৈরী হয়েই সমস্ত কথা সাধারণ মানুষকে বলতে হবে।

বরুণ ছিল নাচের আসরের প্রিয় পাত্র। বছরের পর বছর যে সমস্ত স্ত্রীরা স্বামীদের জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করে বিরহ সহ্য করেছে—তারা যখন এই সুন্দর নর্তকের মুখে তাদের কীর্তিকলাপ নিরালায় শুনল—তখন তা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করে পারল না। ক্রমেই এক কান থেকে অপর কানে খুব জোরালো বেগে কথাটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বরুণ নিজে ছিল একজন কবি, পতি-বিরহিনী আর্য মহিলাদের জবানীতে অসুর কন্যাদের অভিশাপ বর্ষণ উপলক্ষে সুমিত্রের বিলাসপূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব জীবনের আলেখ্য নিয়ে সুন্দর সুন্দর গান রচনা করল; এই গান ক্রমেই দাবানলের মত সারা সৌবীরের আর্য গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। মুখে মুখে গীত হতে লাগল। কিছু কিছু আর্য স্ত্রীরা যাতে তাদের স্বামীদের কাছে যায় তার ব্যবস্থা করা হল, স্বামীদের কাছে তিরস্কৃত হয়ে ফিরে আসার পরিণাম আরও খারাপ হল। এবার সুমিত্রকে সৌবীরপুরে ফিরে আসতে বলা হল এবং সে ফিরে আসতে অস্বীকার করায় তার স্থলে বরুণকে সেনানায়ক নিযুক্ত করা হল, বৃহৎ আর্যবাহিনীর নেতা হিসাবে বরুণকে পুরোভাগে রেখে অসুরপুরীতে অভিযান শুরু হল। বরুণের সামনে এসেছে বুঝতে পেরে সুমিত্রের সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন ধরল

এবং অনেকেই নিজেদের অনার্য ব্যবহারের জন্যে সত্যি সত্যি অনুতপ্ত হল। অবশিষ্ট সৈন্যদের সাহায্যে সুমিত্রের জিতবার আশা ছিল না; তাই সে পরিশেষে বরুণের হাতে নগর সমর্পণ করে সৌবীরপুরে ফিরবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এইভাবে আর্যজন প্রথম-বারের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। বরুণ অসুরদের প্রতি কোন প্রকারের দয়া প্রদর্শন করল না। অসুরদের কাছে কোন অস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও এবং তারা কোন যুদ্ধ না করলেও বরুণ তাদের রেহাই দিল না। আর্যরা যাতে অসুরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে তার জন্যে এক আলাদা আর্যনগরী নির্মাণ করল এবং ঋষি অঙ্গিরা বর্ণিত শিক্ষাকে কাজে লাগানো হল, তাঁর বহু কথাই কার্যে পরিণত হতে আরম্ভ করল।

সুদাস

স্থান : কুরু পাঞ্চাল
(বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ)
পাত্র : বৈদিক—আর্য ভাষাভাষী
কাল : ১৫০০ খৃঃ পূঃ

[১৪৪ পুরুষ আগেকার আর্যদের কাহিনী। সেই সময় আদি ঋষিরা—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—ঋকবেদের শ্লোকসমূহ রচনা করছিলেন ; আর কুরু পাঞ্চাল ভূমির আর্য রাজন্যবর্গ এই সমস্ত আর্য পুরোহিতদের সাহায্যে পুরাকালের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূলে চূড়ান্তভাবে কঠোরতম আঘাত হানতে পেরেছিল।]

১

বসন্তকাল শেষ হয়ে আসছিল। চনাব (চন্দ্রভাগা) নদীর তীরে দূর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাকা সোনালী গমের শীষগুলি হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল, আর এদিক সেদিক থেকে স্ত্রী-পুরুষ গান গাইতে গাইতে ক্ষেতের ফসল কাটছিল। কাটা ক্ষেতের যে সব জমিতে নতুন ঘাসের উদ্‌গম হয়েছে সেখানে বাচ্চাসমেত ঘোটকীগুলিকে চরে খাবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রখর রোদের মধ্যে একজন ক্লান্তচরণ পথিককে আসতে দেখা গেল, তার পরনে ছিল মলিন ছিন্ন বাস, মাথায় ছিল ফাটা কাপড়ের উষ্ণীষ (পাগড়ী), একটি পুরানো চাদর দিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে ছিন্ন উষ্ণীষে ঢাকা সোনালী চুলের জট দেখা যাচ্ছিল—একটি পুরানো চাদরে শরীর আবৃত ছিল, কোমরে জড়ানো ছিল অন্তরবাস—হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড ধুতি কাপড়।

হাতের লাঠির ওপর ভর করে ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। পিপাসায় গলার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী গ্রামে পৌঁছবেই—এই পণ নিয়ে সে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু পথের ধারে একটি কুয়া ও ছোট শমীবৃক্ষ দেখে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল। প্রথমে সে তার উষ্ণীষ বস্ত্র পরে উলঙ্গ হয়ে পরনের ধুতি খুলে একত্রে বেঁধে কুয়ার দিকে একটি প্রান্ত ফেলে দিল, কিন্তু জলের নাগাল পেল না। একান্ত নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। তার মনে হতে লাগল আর কোনদিন হয়ত সে আর উঠতে পারবে না। ঠিক সেই সময়েই এক কাঁধে একটি মশক (চামড়া দিয়ে প্রস্তুত জলের থলি), অন্য কাঁধে দড়ি আর হাতে চামড়ার কলসী নিয়ে হাজির হল একটি কুমারী মেয়ে। পথিক চেয়ে দেখল, আবার যেন তার আশা ফিরে এল। তরুণীটি কুয়ার কাছে এসে জলের থলিটা যখন জলে ডোবাতে যাবে তার চোখ পড়ল পথিকের দিকে। পথিকের মুখের চেহারা হয়ে গিয়েছিল ফ্যাকাশে, ঠোঁট দুটো ফেটে গেছে চোয়াল দুটো চুপসে গেছে

কোটরে আর পা দুটো ধুলোয় জমাট হয়ে গেছে। কিন্তু এত সত্বেও তারুণ্যের ঝলক তার চেহারায় স্পষ্ট ফুটে বেরচ্ছিল।

মাথাভরা চুলে সোনার শিরস্ত্রাণ, পরনে কাঁচুলি ও অন্তরবাস (ঘাঘরা) আর শরীরের উপরাংশ উত্তরীয় দিয়ে ঘেরা—সাধারণ হলেও শালীনতা সম্পন্ন বেশভূষায় সজ্জিতা কুমারীকে পথিক দেখল। রৌদ্রের মধ্যে চলে আসার ফলে তরুণটির মুখ হয়েছিল খুব লাল, তার কপাল ও ঠোঁটের ওপর ঝলক দিচ্ছিল। তরুণীটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এই অপরিচিত পুরুষটির দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর মদ্রদেশের মেয়েদের সহজাত মৃদুহাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে যুবকের অর্ধেক তৃষ্ণা মিটিয়ে মধুরস্বরে প্রশ্ন করল, "ভাই, আমার মনে হচ্ছে তুমি খুবই তৃষ্ণার্ত।"

পথিক তার হৃদস্পন্দনকে দৃঢ় করবার সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "হাঁ, আমি খুবই তৃষ্ণার্ত।"

"বেশ, আমি তোমায় জল এনে দিচ্ছি।"

তরুণীর জলপাত্র ভর্তি হল। ততক্ষণে তরুণটিও আস্তে আস্তে উঠে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তাব দীর্ঘ দেহ ও মোটা হাড়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় যে তার শরীরে অসাধারণ পৌরুষ বিদ্যমান। মশকের সঙ্গে চামড়ার তৈয়ারী যে গেলাসটি ছিল তাতে জল ভর্তি করে তরুণী পথিকের হাতে দিল। পথিক এক চুমুক জল কোন রকমে ঢোক গিলে খেয়ে মাথা নীচু করে একটু বসে রইল। তারপর এক নিশ্বাসে গেলাসের সমস্ত জলটাই শেষ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে গেলাসটা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল আর নিজেকে সামলাবার অনেক চেষ্টা করেও পেছনে টলে পড়ল। তরুণী কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল! তারপর তরুণের চোখের দিকে চেয়ে বুঝল যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেই সে চট করে নিজের মাথায় বাঁধা শিরস্ত্রাণ খুলে কাপড়টি জলে ভিজিয়ে চক্ষু ও কপাল মুছে দিতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর যুবকটি চোখ খুলল। এইভাবে তরুণীটিকে সেবা করতে দেখে লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "হে কুমারী, তোমাকে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।"

"আমার কোন কষ্ট হয় নি, পরন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম যে, এই রকম কেন হল?"

"বিশেষ কিছু নয়, পেটটা একেবারে খালি ছিল তার ওপর অত্যধিক তৃষ্ণায় বেশী জল খেয়েছিলাম—তাই। কিন্তু এখন আর কোন কষ্ট নেই।"

"তোমার পেট একেবারে খালি?" এই কথাগুলি বলে পথিককে জবাব দেবার কোন অবসর না দিয়ে তরুণী এক দৌড়ে এক পাত্র দই, ছাতু ও মধু নিয়ে উপস্থিত হল। তরুণের চেহারায় সংকোচ ও লজ্জার ভাব দেখে কুমারী বলল, "হে পথিক, তুমি কোন সংকোচ করো না। কয়েক বছর হল আমার এক ভাই ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তোমার চেহারার সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে তাই তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে সেই হারানো ভাই-এর কথাই মনে পড়ছে।"

পথিক পাত্র নিয়ে নিল। তরুণী বালতি থেকে জল দিল। যুবকটি সেই জলে ছাতু গুলে তা পান করল। খাওয়া-দাওয়ার পর তার চেহারা থেকে শ্রান্তির চিহ্ন প্রায় অর্ধেকটা মুছে যেতে থাকল আর তার মুখে ফুটে উঠল একটা নির্বাক কৃতজ্ঞতার ভাব। কি ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় এই কথা যখন সে ভাবছিল—তরুণী তার মনের ভাব আঁচ করেই যেন বলল, "সংকোচ করার কোন দরকার নেই ভাই। বোধ হয় তুমি অনেক দূর দেশ থেকে আসছ, তাই না?"

"হাঁ, অনেক দূর, পূর্বদিক থেকে—পাঞ্চাল দেশ থেকে।"

"কোথায় যাবে?"

"এখানে ওখানে—যেখানে হোক।"

"তবু?"

"এখন ত আমি কাজ খুঁজছি, যাতে খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা চলতে পারে।"

"ক্ষেতের কাজ করবে?"

"কেন করব না? চাষের কাজ, বীজ বোনা, ফসল কাটা সব কাজই পারি। মাড়াই করতেও জানি। গরু, ঘোড়ার রাখালি—তাও করতে পারি। আমার শরীরে শক্তিও যথেষ্ট আছে, এখন একটু কাহিল হয়ে পড়েছি বটে—কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে আবার কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্য আমি ফিরে পাব। হে কুমারি, এ কথা বলতে পারি যে, আমার কাজে কোন দিনই কোন মালিক অখুশী হয় নি।"

"তাহলে আমার মনে হচ্ছে আমার বাবা তোমাকে কাজ দেবে। জলের ঘড়া ভরে নিই, চল আমার সঙ্গে চল।"

তরুণটি মশক বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করল, কিন্তু তরুণী কিছুতেই রাজী হল না। ক্ষেতের ওপর একটি লাল তাঁবু দেখা যাচ্ছিল আর তার বাইরে বসেছিল প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন স্ত্রী পুরুষ। পথিক এদের মধ্যে তরুণীর পিতা কে হতে পারে তা আন্দাজ করতে পারল না। সকলেরই পোষাকে সাদা কাপড়, হরিতাভ কেশ, গৌরবর্ণ গায়ের রং ও প্রাণবন্ত মুখ। তরুণী জলভরা মশক ও বালতিটি মাঝখানে বিছানো চামড়ার ওপর রাখল, তারপর ষাট বছরের বৃদ্ধ কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ পুরুষের কাছে গিয়ে বলল, পিতা, এই পরদেশী তরুণ কাজ চাইছে।"

"হে কন্যা, ক্ষেতের কাজ করতে চায় কি?"

"হাঁ, যেখানে হোক।"

"তাহলে এখানেই কাজ করুক। এখানে অন্য পুরুষেরা যা বেতন পায় সেও তাই পাবে।"

তরুণ কথাবার্তা সবই শুনছিল। বৃদ্ধ তাকে ডেকে নিয়ে কথাগুলি আবার বলল, যুবকটি কাজ করতে রাজী হল। পুনরায় তাকে বলল, "এস, আগন্তুক, তুমিও এস, আমরা এখন মধ্যাহ্ন ভোজন করছি—তুমিও যোগ দাও।"

"হে আর্য! আমি এখনি ছাতুর ঘোল খেয়েছি, তোমার মেয়ে আমাকে দিয়েছে।"

"আর্য টার্জ নই, আমার নাম জেতা, মাদ্র বংশের ত্রিভুপুত্র আমি। এস তুমি যা পার খাও ও পান কর। অপনা, মেরয় (কাঁচা মদ) ও অশ্বিনী শিরকা দাও তো। রৌদ্র-তাপে দগ্ধ হলে শরীরে বল এনে দেবে। হে তরুণ, এখন আর কথা নয় সন্ধ্যায় আমরা আলাপ-আলোচনা করব। এখন তোমার নাম বল ত ?"

"সুদাস পাঞ্চাল।"

"সুদাস নয় সুদা—সুন্দর দান দেয় যে অর্থাৎ ভাল ফসলের দাতা। তোমরা পূর্ব-দেশের লোকেরা ঠিকমত ভাষা বলতে পার না। তোমার দেশ পাঞ্চাল জনপদে ? ভাল কথা অপনা, এই পূর্ব দেশের লোকেরা একটু বেশী লাজুক হয়। একে ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও, যাতে সন্ধ্যার মধ্যে কিছু কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।"

অপনা'র উপরোধে সুদাস দু' তিন পাত্র মেরয় আর দু' এক টুকরো রুটি গলাধঃকরণ করল। গত দু' দিন তার পেটে কিছু পড়েনি তাই ক্ষুধাবোধও কমে গেছে।

সূর্যের তেজ যতই কমতে লাগল সুদাসের শরীরেও তত বল ফিরে আসতে লাগল আর সন্ধ্যার কাজ শেষ হবার আগে দেখা গেল ক্ষেতে গম কাটার ব্যাপারে সে কারুর পেছনে পড়ে রইল না।

রাত্রে কাজ করার লোকেরা ফসল মাড়াই ঘরের দিকে গেল। জেতা'র ক্ষেত যে খুবই বড় ছিল তা মাড়াই করার জন্য উপস্থিত দুই শতের বেশী লোক দেখে বোঝা যায়। মাড়াই ঘরের এক প্রান্তে রন্ধন কাজে ব্যাপৃত লোকেরা ব্যস্ত ছিল। একটা তাগড়া ষাঁড় আজ কাটা হয়েছে তার কিছু হাড়, নাড়িভুঁড়ি আর কিছুটা মাংস টুকরো করে বড় ডেকচিতে সন্ধ্যা হবার ঘণ্টা তিনেক আগেই চাপানো হয়েছিল। বাকীটা আধ আধ সেরি মাংসের টুকরো করে নুনের সঙ্গে জলে ফুটিয়ে রাখা হচ্ছে। এখানে এই ঘরগুলোর পাশেই ছিল বড় সমতল ভূমি—আর এখানেই মাড়াই-এর কাজ হয়। জলের জন্যে বানানো কাঁচা পাতকুয়া আর জলভর্তি কুণ্ড ছিল। স্ত্রী-পুরুষেরা এখানে হাত মুখ ধুচ্ছিল। যাদের গা ধোবার ইচ্ছে ছিল তারা তাই করল। রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারে সারি দিয়ে বসা স্ত্রী পুরুষের সমানে রুটি মাংসখণ্ড ও পাত্রভর্তি মদ দেওয়া হোল। সুদাসের লাজুকতার কথা মনে রেখে জলওয়ালী অপনা তাকে তার পাশেই বসিয়েছিল অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সুদাসকে দেখে তার নিরুদ্দিষ্ট ভাই-এর কথাই মনে পড়ছিল। খাওয়ার পর নাচ গান সুরু হোল। আজকের রাত্রের নৃত্য আসরে সুদাস যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই নৃত্য সভায় সে সর্বপ্রিয় গায়ক ও নর্তক হয়েছিল।

মাস দেড়েক ধরে ফসল কাটা, মাড়াই ও বাঁধার কাজ চলতে লাগল, কিন্তু সপ্তাহ দুই যেতে না যেতে সুদাসকে যেন আর চেনাই যায়না-একেবারে নতুন মানুষ। তার বড় বড় নীল চোখ দুটো উছলে উঠল, তার গালে স্বাভাবিক রক্তাভা দেখা দিল। হাড় আর শিরাগুলো মাংস ও চামড়ার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রথম সপ্তাহের শেষে জেতা তাকে এক প্রস্থ কাপড় উপহার দিয়েছে।

ফসল মাড়াই-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাপ-বেটি ও সুদাস সমেত মোট জন ছয়েক তখনো কাজ করছিল—বাকী সকলে নিজ নিজ ফসলের ভাগ নিয়ে চলে গেছে। এই সব লোকদের নিজেদের জমির পরিমাণ খুবই কম, তাই তারা নিজেদের ফসল কাটার পর জেতার জমিতে এসে কাজ করত। এই দেড়মাস কাজের মধ্যে জেতা ও তার কন্যা এই নবাগত তরুণ কর্মীটির সরল প্রফুল্ল স্বভাবের ঘনিষ্ঠ পবিচয় পেয়েছিল। একদিন সন্ধ্যাসুরার পর জেতা সুদাসেব সামনে পূর্ব দেশ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু কবল। অপনা পাশে বসে শুনতে লাগল। জেতা বলল, "সুদা! পূর্বদেশে আমি খুব বেশী দূর পর্যন্ত যাইনি বটে, কিন্তু পাঞ্চালপুরে (অহিচ্ছত্রে) আমি গেছি। সেখানে শীতকালে আমি ঘোড়া বিক্রী করতে যেতাম।"

"পাঞ্চাল (রুহেনখণ্ড) তোমার কেমন লাগল, হে আর্যবৃদ্ধ!"

"জনপদ হিসাবে মন্দ নয়, আমাদের এই মদ্র দেশেব মতই সুবক্ষিত ও সম্পন্ন; বরঞ্চ ক্ষেতের উর্বরতার দিক থেকে এখানকার চেয়ে বেশী সুফলা বলা চলে, কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"ক্ষমা কোরো সুদা: ওখানে মানুষ থাকেনা।"

"মানুষ থাকে না? তাহলে থাকে কারা—দেবতা না দানব?"

"আমি এইটুকুই শুধু বলব যে, ওখানে মানুষ থাকে না।"

"আর্যবৃদ্ধ! আমি রাগ করব না, কিন্তু তুমি আমায় বল, কেন তোমাব এই ধাবণা হোল?"

"সুদা! তুমি এখানে দু'শো নব-নারীকে আমাব ক্ষেতে কাজ করতে দেখেছ।"

"হাঁ!"

"তারা আমার জমিতে কাজ করে। জমিতে কাজ করে বেতন পায়—কিন্তু কখনো কি দেখছ মাথা নীচু করে তাদের হীনতা প্রকাশ করতে?"

"না, পরন্তু মনে হত সকলেই যেন তোমার পরিবারের মানুষ।"

"হাঁ, একেই মানুষ বলে। তারা আমাব পরিবারেরই লোক। সকলেই মদ্রের নব-নারী। পূর্বদেশেও এই রকম দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে দাস ও স্বামী সম্পর্ক, মানুষ নেই, বন্ধু পাওয়া যায় না।"

"আর্যবৃদ্ধ! তুমি সত্য কথা বলেছ। মানবতার মূল্য শতদ্রু নদী পেরিয়ে এসে এই মদ্রভূমিতে দেখছি। মানুষের মধ্যে বাস করতে পাওয়াটা আনন্দ, গর্ব ও সৌভাগ্যের কথা।"

"পুত্র, তোমার কথায় আমি খুশী হয়েছি। তুমি আমার কথায় রাগ করনি, আপন আপন জন্মভূমিকে সকলেই ভালবাসে, তা হল দেশপ্রেম।"

"কিন্তু প্রেম মানে দোষ ত্রুটি সগর্বে চোখ বুজে থাকা নয়।"

"আমি কুরু পাঞ্চাল দেশে যাবার সময় বহু বার একথা ভেবেছি, এদেশের পণ্ডিতদের

সঙ্গে আলোচনাও করেছি। এই সব দোষ কি করে এলো তার কারণ তো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু প্রতিকার কি করে হবে তা জানিনা।”

“কারণগুলো কি আর্যবৃদ্ধ!”

যদিও পাঞ্চালীদের বাসস্থানকেই পাঞ্চাল জনপদ বলা উচিত, কিন্তু পাঞ্চালের অর্ধেক অধিবাসীও পাঞ্চাল জনের নয়।”

“হাঁ, বাইরে থেকে আসা আগন্তুকও অনেক আছে।”

“আগন্তুক নয় পুত্র! মূল নিবাসী অনেক আছে। ওখানকার শিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী; ওখানকার যারা দাস সকলেই, পাঞ্চাল জনের লোকেরা ওখানে পৌছবার অনেক আগে থেকেই বাস করত। তাদের গায়ের রং দেখেছ তো?”

“হাঁ, পাঞ্চাল জন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালো শ্যামল অথবা তাম্র বর্ণ।”

অপনা প্রশ্ন করল “পাঞ্চাল জনের গায়ের রং কি মদ্রদের মতই গৌরবর্ণ?”

“কম বেশী হবে।”

জেতা বলল, “হাঁ, কম বা বেশী! কেননা অন্যের সঙ্গে রক্ত সংমিশ্রনের ফলে এই পরিবর্তন ঘটেছে। আমার ধারণা, যদি মদ্রদের মতই ওখানে শুধু আর্যরা—পিঙ্গল কেশ আর্য বাস করত তাহলে হয়তো শুধু মানুষ দেখা যেত। আর্য ও আর্য-ভিন্ন দুই উঁচু নীচু ভাবনা থেকেই ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হতে পারে।”

“আযবৃদ্ধ তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। তুমি বোধ হয় জানো যে, এই আর্য ভিন্নদের মধ্যে অর্থাৎ যাদের আগে অসুর বলা হোত তাদের মধ্যে উঁচু নীচু দাস ও প্রভুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

“হাঁ, কিন্তু পাঞ্চালেরা সকলেই তো আর্যজনের এক রক্ত এক শরীর থেকে জন্মলাভ করেছে। তাতে কি করে তাদের মধ্যে উঁচু নীচু ভেদাভেদ এসে অনুপ্রবেশ করল। পাঞ্চালের রাজা দিবোদাস একবার আমার কাছ থেকে ঘোড়া কিনেছিল, আমাকে তার জন্যে তার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুগঠিতদেহসম্পন্ন গৌরবর্ণের যুবক ছিল সে, কিন্তু, মাথায় এক ভারী মুকুট, তাতে লাল হলদে রং ছিল। কানে দুটো ছেঁদা করে তাতে পরানো ছিল বড় বড় কুণ্ডল। তার আঙুলে ও গলায় ছিল নানা অলঙ্কার। তাকে দেখে আমার মন করুণায় ভরে গেছল। মনে হচ্ছিল পূর্ণ চন্দ্রকে যেন রাহু গ্রাস করেছে। তার সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিল, তাকে যে-কোন মদ্র সুন্দরীর মতই দেখাচ্ছিল কিন্তু লাল হলদে বর্ণের অলঙ্কারে বেচারী নুয়ে পড়েছিল।”

“সুদাসের বুক দুর দুর করে উঠল। তার মনের চাঞ্চল্য যাতে মুখে ফুটে না ওঠে তারই চেষ্টা সে প্রাণপনে করতে লাগল, কিন্তু তাতে সফল না হয়ে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল, “আর্যবৃদ্ধ, পাঞ্চাল রাজ কি তোমার ঘোড়াগুলো কিনলো।”

“হা, নিল তো বটেই, ভালো দামও দিল। কতটা হিরণ্য দিয়েছে এখন আর মনে নেই। কিন্তু দেখতে দেখতে আমার জ্বরই আসছিল, পাঞ্চাল জনের লোকেরা পর্যন্ত রাজার সম্মানে নুয়ে পড়ে যে ভাবে বন্দনা করছিল—তা দেখে কার না গা ঘেন্নায় শিউরে

ওঠে। যদি মাথাও কেটে নেওয়া হয় তবু কোন মদ্রকে দিয়ে ঐ ভাবে মাথা নোয়াতে পারবে না।"

"তোমাকে তো আর ঐ রকম করতে হয় নি আর্যবৃদ্ধ ?"

"আমাকে বললে তো ঐ খানেই খুনোখুনী হয়ে যেত। পূব দেশের রাজারা কোন মদ্রকে ঐ ধরনের হুকুম করতে ভরসা পায় না। তবে ওখানে দেখলাম যে, এটা যেন তাদের সনাতন রীতি।"

"কেন ?"

"কেন, তা তুমি জানতে চাও ? সে এক বিরাট্ কাহিনী। যখন পশ্চিম থেকে আগে এগোতে এগোতে পাঞ্চাল জনের লোকেরা যমুনা গঙ্গা ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী দেশ (উত্তর দক্ষিণ পাঞ্চালীতে) বসতি স্থাপন করল—তখন তারা মদ্রজনেব মতই একটি পরিবার—এক বেরাদরের মতই থাকতে লাগলো। তারপর অসুরদেব সঙ্গে ওদেব মেলামেশা বাড়তে লাগল আর তাদের অনুকরণে অনেক পাঞ্চাল জনের লোকের মধ্যে সর্দার, রাজা বা পুরোহিত হবার আশায় লালায়িত হতে লাগল।"

"কিন্তু লালায়িত হোল কেন ?"

"লোভের জন্য, নিজে মেহনত না করে অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করে জীবন-ধারণ করার জন্যে। এই রাজা ও পুরোহিতরাই পাঞ্চালদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে—এরাই আর তাদের মানুষ থাকতে দেয়নি"—এই কথাগুলো বলতে বলতে জেতা নিজের কাজে চলে গেল।

২

মদ্রপুর (শাকলা বা শিয়ালকোট-এ) জেতার পরিবারের মধ্যে সুদাস চার বছর কাটিয়ে দিল। জেতার স্ত্রী ইতিপূর্বেই মারা গেছেন। বিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের মধ্যে দু' একজন এসে থাকত বটে, কিন্তু এ গৃহের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল জেতা, সুদাস আর অপনা। অপনার বয়স তখন বছর কুড়ি। তাদের ব্যবহারে বেশ বোঝা যেত যে, অপনা ও সুদাসের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম বিদ্যমান। মদ্রপুরীর সুন্দরীদের মধ্যে অপনার যথেষ্ট নাম ছিল আর সেখানকার সুন্দর তরুণের অভাব ছিল না যারা তার প্রেমপ্রার্থনা না করত। আর সুদাসের মত সুপুরুষ যুবকের জন্যে সুন্দরী তরুণীর অভাব ঘটত না। কিন্তু এখানকার লোকেরা সর্বদাই দেখেছে সুদাসকে অপনার সঙ্গে আর অপনাকে সুদাসের সঙ্গে নাচতে। জেতা এ কথা জানত; এর পরিণামের কথা ভেবে সে খুশীও হত যদি সুদাস স্থায়ীভাবে তাদের মধ্যে বসবাস করতে রাজী হত। কিন্তু সুদাস মাঝে মাঝে তার বাবা মা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে তাতেই জেতার মনে ভাবনার সৃষ্টি করে—কারণ সে জানত যে, সুদাস মা-বাপের একমাত্র সন্তান।

চন্দ্রভাগা (চনাব) নদীর অপর নাম ছিল প্রেমিক প্রেমিকাদের নদী, একদিন অপনা ও সুদাস সেখানে স্নান করতে গেল। এর আগেও অনেকবারই স্নানের সময়ে সুদাস অপনার অপরূপ নগ্ন শরীর দেখেছে, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশটি নিরাবরণ দেহের সুন্দরী নারীর নগ্ন সৌন্দর্যের পাশে অপনার সৌন্দর্য দেখে মনে হল যে, আজই যেন প্রথম সে তার সঙ্গিনীর অপরূপ লাবণ্যময়ী রূপ মাধুরীর পূর্ণ পরিচয় পেল। ফিরবার পথে সুদাসকে মৌন দেখে অপনা প্রশ্ন করল,—"সুদাস! আজ যে তুমি কথা বলছ না, খুব পরিশ্রান্ত হয়েছ নাকি? চন্দ্রভাগার খরস্রোতে ডুবার সাঁতরে পাড়ি দিতে পরিশ্রম ত হবেই।"

"তুমিও তো অপনা। তুমি একবার পাড়ি দিয়েছ, আর আমি দিয়েছি ডুবার; সময় পেলে আরো দশ বার এপার-ওপার করতে পারতাম।"

"জল থেকে উঠবার সময় আমি দেখছিলাম তোমার বুকের ছাতিটা চওড়া হয়েছে, তোমার হাত পায়ের পেশীগুলোও যেন দ্বিগুণ মোটা হয়েছে।

"সাঁতার কাটা খুবই ভাল ব্যায়াম। এতে শরীর বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়। কিন্তু অপনা তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা হয় না। তুমি ত এখনো ত্রিভুবনের মধ্যে অনুপম সুন্দরী।"

"নিজের চোখ দিয়েই বলছ ত সুদাস?"

"কিন্তু মোহের বশবর্তী হয়ে বলছি অপনে!"

"হাঁ, তা ঠিক্। তুমি কোন দিন আমার চুম্বন প্রার্থনা করনি, অথচ তুমি জান মদ্র তরুণীরা এ জিনিস খুবই উদারভাবে বিতরণ করে থাকে।"

"আমি না চাইতেই তোমার দানের উদারতায় তুমি ভরিয়ে দিয়েছ।"

"সে ত তোমাকে দেখে আমি আমার ভাই শ্বেতপ্রবাকেই দেখতে পেতুম।"

"তাহলে এখন আর চুমু দেবে না?"

"চাইলে চুম্বন কেন দেব না?"

"আর চাইলে তুমি হবে আমার···?"

"ও কথা বলো না সুদাস! অস্বীকার করে আমিই দুঃখ পাব।"

"কিন্তু এ দুঃখ আসতে না দেওয়া তোমারই হাতে।"

"আমার নয়, তোমারই হাতে আছে।"

"কি ভাবে?"

"তুমি কি সারা জীবনের জন্যে আমার বাবার এই ঘরে থাকতে প্রস্তুত আছ?"

সুদাস বহু দিন থেকেই এই মুহূর্তটির আশঙ্কা করছিল, যখন মধুভরা ঐ মুখ থেকে এই কঠিন প্রশ্নটি শুনতে হবে। এখন বিদ্যুতের মত কথাটা কান ছেদ করে মর্মস্থলে আঘাত করল। এক মুহূর্তের জন্য মুখটা মেঘলা হয়ে উঠেছিল দ্বিধা ও সংকোচে। কিন্তু তার মনোভাব অপনাকে বুঝতে দিতে সে পারে না। তাই তখনি সে শান্তভাবে বলল, "অপনে, তোমায় আমি কত না ভালবাসি।"

"তা আমি জানি, আর তুমিও আমার মনের কথা জান। আমি চিরকালের জন্যেই

তোমার হয়ে থাকতে চাই, তাতে আমার বাবাও খুশী হবে। কিন্তু তার জন্যে তোমায় পাঞ্চাল থেকে চির বিদায় নিতে হবে।"

"পাঞ্চাল চিরকালের জন্যে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন নয়; কিন্তু সেখানে আছে আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা। আমাকে ছাড়া মায়ের আর কোন দ্বিতীয় সন্তান নেই। মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, তার মৃত্যুর আগে তার সঙ্গে দেখা আমি করবই।"

"মাকে যে কথা দিয়েছ তার খেলাপ আমি করাতে চাই না, সুদাস! তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তা চিরকালই থাকবে, এমন কি তুমি যদি আমায় ফেলে চলে যাও, তাহলেও। আমি নিজের মনের কাছে জানি যে, আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কিন্তু আমাদের দুজনকার দেওয়া কথা—নিজেদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা—আমরা দুজনেই তা ভাঙতে পারি না।"

"তোমার মনের কাছে করা অঙ্গীকার কি, অপনে!"

"মানবভূমি ছেড়ে অ-মানব ভূমিতে কখনো যাবে না।"

"অ-মানব ভূমি, পাঞ্চাল জনপদ?"

"হাঁ, যে দেশে নারীর স্বতন্ত্রতা নেই—স্বাধীনতা নেই—সে দেশে মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নেই।"

"তোমার সঙ্গে আমি একমত।"

"আর এই জন্যেই তোমাকে এই চুম্বন দিচ্ছি।"—এই কথা বলে অপনা তার অশ্রু-সিক্ত গালটি সুদাসের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। সুদাসের চুম্বন শেষ হলে অপনা তার ঠোঁট দিয়ে ঠোঁটে দীর্ঘ চুমু খেল। তারপর আবার বলল, "তুমি যাও, একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে এস; তোমার জন্যে আমি এই মদ্রপুরে অপেক্ষা করে থাকব।"

অপনার এই অকৃত্রিম সাদাসিদে কথাগুলি শুনে সুদাসের নিজের ওপর অপার ঘৃণা জন্মাল—যা সে কোন দিনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি!

ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মা-বাপকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইল জেতার কাছে। পিতা পুত্রী উভয়েই তাকে যাবার সম্মতি দিল।

প্রস্থানের দিন স্থির হওয়ায় তার আগের দিনটা অপনা বেশী বেশী করে সুদাসের আশেপাশে অনুক্ষণ ঘুরতে থাকল। তাদের দুজনেরই পদ্ম পাপড়ির মত নীল চোখ দুটো জলে ভেসে যাচ্ছিল, আর ওরা তা গোপন করছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা চুম্বনে ভরিয়ে দিল, নিভৃতে নীরব হয়ে চোখে চোখ রেখে বসে রইল আর কখনো দৃঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে আবদ্ধ করল।

যাবার মুহূর্তে অপনা শেষ বারের মত তার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব, সুদাস!"

এই কথাগুলো জীবন ভোর তার মনের ওপর দাগ কেটে রইল।

৩

সুদাস তার মাকে ভালবাসত গভীর ভাবে। পিতা দিবোদাস ছিলেন একজন প্রতিভাশালী রাজা—যাঁর গুণগানে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ লিখেছেন শ্লোক।* এই শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ আছে ঋগ্বেদে, এগুলো সংগৃহীত হওয়া ও ঋগ্বেদে স্থান পাওয়া থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ঋষিদের মনে চাটুকারিতা ভাবের অভাব ছিল না।

সুদাসের ভালবাসা ছিল শুধু তার মায়ের জন্য। সে ভালভাবেই জানত তার মায়ের মত দিবদাসের আরো স্ত্রী আছে, আছে অসংখ্য দাসী। পাঞ্চালের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী—রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মা হিসাবে একটু বিশেষ সম্মান পেলেও বৃদ্ধা দন্তহীনার জন্যে রাজার অন্তরে কোন প্রেম অবশিষ্ট ছিল না; দিবোদাসের অন্তঃপুরে রাত্রিবাসের জন্য নিত্য নব তরুণীর আনাগোনা ছিল। সুদাস মায়ের একমাত্র পুত্র হলেও তার পিতার একমাত্র পুত্র ছিল না। তার অনুপাস্থিতিতে ছোট ভাই প্রতর্দন দিবোদাসের উত্তরাধিকারী হ'ত।

বছরের পর বছর কেটে যাবার পর সুদাসকে না দেখে মা তাকে দেখবার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। আর অনবরত চোখের জল ফেলতে ফেলতে চোখের দৃষ্টি হয়েছিল ক্ষীণ। সুদাস একদিন নিঃশব্দে অন্যের অগোচরে, বাবাকে খবর না দিয়ে মায়ের সামনে এসে হাজির হল। নিষ্প্রভ চোখ দুটো দিয়ে সুদাসের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সুদাস বলল, "মা! আমি তোমার সুদাস।"

শুনে মার চোখ দুটো প্রভাময় হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একটুও না নড়ে বলল, "যদি তুই সত্যিই আমার সুদাস হ'স ত আমার দৃষ্টির বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরছিস্ না কেন? আমার কোলে মাথা রাখছিস্ না কেন?"

সুদাস মায়ের কোলে মাথা রাখল। মা হাত বুলিয়ে দেখল, সত্যিই হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাবার মত নয় ত? নিজের চোখের জলে সুদাসের গাল, কপাল, চুল ভিজিয়ে দিয়ে বার বার চুমু খেতে লাগল। মায়ের চোখের জল বন্ধ করতে না পেরে সুদাস বলল, "মা! আমি ত এখন তোমার কাছে এসে গেছি, তবু কাঁদছ কেন?"

"আজকের দিনটা, শুধু আজকের দিনটা আমায় কাঁদতে দাও। আজ আমি ঘড়া-ভর্তি কেঁদে নি। এই আমার শেষ কান্না, সুদাস, আমার চোখের মণি।"

খবর গিয়ে পৌঁছল অন্তঃপুর থেকে রাজার কানে। রাজা এল দৌড়ে, সুদাসকে আলিঙ্গন করল, আনন্দাশ্রু ধারা বইতে লাগল তার চোখে।

---

* ঋগ্বেদ ৬।২৬।২১১,২৫

দিন কাটতে লাগল, দিন থেকে মাস গেল। বছর গেল—দুটো বছর শেষ হল। মা-বাপের সামনে সুদাস প্রসন্ন মুখ বজায় রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু নির্জনে এলেই তার কানে সেই সজীব কণ্ঠস্বর বেজে উঠত—"আমি থাকব তোমার জন্য অপেক্ষা করে।" আর তার চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই কম্পমান রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয়—চোখের জলে দৃষ্টি যতক্ষণ না ঝাপসা হয়ে উঠত, সে দেখত! মনের দোটানায় সে ছিঁড়ে পড়ত—একদিকে অপনার অকৃত্রিম প্রেম আর অপরদিকে বৃদ্ধা মায়ের বাৎসল্য পূর্ণ হৃদয়। মায়ের অসহায় হৃদয় বিদীর্ণ করে চলে যাওয়া তার নিজের কাছে আত্মসর্বস্ব নীচ কাজ বলে মনে হল। তাই সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে, মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত পাঞ্চাল ছেড়ে যাবে না। কিন্তু রাজপুত্রের মত বিলাসিতার জীবন মেনে নিতে সে পারছিল না—সে বুঝেছিল যে; এটা তার সামর্থের বাইরে। পিতার প্রতি তার সশ্রদ্ধ ব্যবহার বজায় রেখে তার আদেশ পালনের চেষ্টা করত।

একদিন বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে ডেকে বললেন, "বৎস সুদাস! আমার জীবনের শেষ দিন এসে গেছে, এখন আর আমার পক্ষে পাঞ্চালের শাসন ভার বহন করা সম্ভব নয়।"

"তাহলে আর্য! এই ভার পাঞ্চালীদের ওপর দিচ্ছ না কেন?"

"পাঞ্চালীদের? তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝতে পারলুম না।"

"আর্য! শেষ পর্যন্ত এ রাজ্য আসলে পাঞ্চালীদেরই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাঞ্চাল জনের সাধারণ লোক ছিল। তখন পাঞ্চালের কোন রাজা ছিল না। পাঞ্চাল জনের সাধারণ লোকেরা শাসন চালাত। যেমন আজও মল্ল, মদ্র অথবা গান্ধার জনের লোকেরা চালায়। তারপর প্রপিতামহ বধশ্ব, আত্মসুখের লোভ, ভোগের লোভ, অপরের পরিশ্রমের ফলভোগের লোভে পড়েছিল। সে ছিল জন-পতি, পরে সেনাপতি হয়েছিল, আর কয়েকটা যুদ্ধে জয়লাভ করে সারা জনের সম্মান লাভ করল—সেই সবের সুযোগে জনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। জন শাসন খতম করে অসুরদের মত ব্যক্তি-শাসন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। অসুরদের মতই পুরোহিতদের সৃষ্টি করল, বশিষ্ঠ বা বিশ্বামিত্রের কোন পূর্বপুরুষকে পুরোহিত পদ ঘুষ দেওয়া হল, তার পরিবর্তে পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের চোখে ধূলো দিয়ে প্রচার শুরু করে দিল—ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য দেবতারা এই রাজাকে পাঠিয়েছে পৃথিবীর প্রজাকে শাসন করার জন্যে—কাজেই জনের সাধারণ মানুষ যেন রাজার হুকুম মেনে চলে আর যথাবিহিত সম্মান করে। এর সবটাই ছিল বেইমানি। ডাকাতির ভাগ বাঁটোয়ারা। পিতা! আমাদের পূর্বপুরুষ যে রাজত্ব গড়ে গেছে তা বিশ্বাসহন্তার রাজত্ব। তাদের নাম পর্যন্ত আমাদের ভুলে যেতে হবে—তাদের প্রতি আমাদের কোন কৃতজ্ঞতার নাম পর্যন্ত না নেওয়া উচিত।"

"না পুত্র! বিশ্ব (=সারা) জনকে আমি আমার রাজকৃত্ (=রাজা করার অধিকারী) বলে স্বীকার করি। অভিষেকের প্রতিজ্ঞার সময় জনের সাধারণ লোকেরাই রাজচিহ্ন পলাশদণ্ড দেয়।"

"রাজার অভিষেকের উৎসব হচ্ছে একটা প্রদর্শনী বা তামাশা মাত্র। কিন্তু সত্যি সত্যি কি আর জনের লোকেরা (প্রজারা) রাজার মালিক। না, আর একথা খুবই স্পষ্ট হয় যখন আমি দেখি—রাজা নিজের জনের সঙ্গে একত্র সকলের সমান হয়ে বসে না, আহার করে না, কাজও করে না। মদ্র বা গান্ধার কি এ রকম করতে পারত?"

"আমরা যদি তাদের মত থাকি তাহলে যে কোন শত্রু যে কোন সময়ে আমাদের হত্যা করবে বা বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে।"

"চোর বা অপহারকদেরই এ ভয় হতে পারে। জন-পতি চোরও নয়, অপহারকও নয়। বস্তুত তারা জনের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাদের ব্যবহারও সেই রকম—তাই তাদের ভয় পাবার কিছুই নেই। আর রাজাদের কথা আলাদা, জনের অধিকার অপহরণকারী, তাই সব সময়ই জনকে ভয় করে চলতে হয়। রাজাদের রাত্রিবাসের অন্তঃপুরের, সোনা-দানার জন্য সংগ্রহ করতে হয় ক্রীতদাস। রাজাদের রাজভোগ নিজের পরিশ্রমে অর্জিত নয়—অপরের পরিশ্রম অপহরণ করে তা ভোগ করে।"

"পুত্র! তুমি কি এর জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ?"

"আর্য, তা মোটেই নয়। তোমার ঐ আসনে বসলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক—তোমার মত করতে হবে। তাই আমার পিতা দিবোদাসকে আমি দোষী সাব্যস্ত করছি না।"

"তুমি পাঞ্চাল জনের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলছ, তা কি সম্ভব? তোমাকে বুঝতে হবে, জনের অধিকার অপহারক কেবল মাত্র পাঞ্চালরাজ দিবোদাস নয়। অপকারকদের মধ্যে আছে সামন্তরা। ঠিকই যে জনের সম্মিলিত শক্তির সামনে সে পঙ্গু। কিন্তু, এদিকে আছে করদ সামন্ত, রাজন্যবর্গ (উগ্র রাজপুত্র = রাজবংশ জাত সন্তানরা) এবং সেনাপতি ছাড়াও প্রধান সামন্ত হচ্ছে পুরোহিতরা।"

"হঁা, পুরোহিতদের ক্ষমতার কথা আমি জানি। রাজ্যের উত্তরাধিকারী প্রথম পুত্র ছাড়া অন্যান্য পুত্ররা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ হয়। আমার ছোট ভাই প্রতর্দনও হয়ত তাই করবে। রাজা ও পুরোহিতদের মধ্যে এখন রাজবেদী (সিংহাসন) ও যজ্ঞবেদী নিয়ে বাঁটোয়ারা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভবিষ্যতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ দুই স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, দুই স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে গড়ে উঠবে। মদ্র ও গান্ধার দেশে যুদ্ধ ও ধর্মাচরণ উভয় কাজেই একই লোকে করতে পারে, কিন্তু পাঞ্চালপুরে যুদ্ধবৃত্তি বধ্যাশ্ব পুত্র দিবোদাসের হাতে আর ধর্মাচরণ বিশ্বামিত্রের করায়ত্ত। ইতিমধ্যেই জনের কাজ তিন ভাগে বাঁটোয়ারা হয়েছে। জনের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে রাজা ও পুরোহিতরা ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে, জনের অধিকার হরণের অংশীদার হিসাবে, বৈবাহিক বন্ধনের বা রক্ত সম্বন্ধের সূত্রে এক হতে পারে; কিন্তু এখনই এদের আলাদা আলাদা শক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়—এখনই দুই স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পৃথক গোষ্ঠীতে পরিগণিত হতে চলেছে। তাই তারই জন্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সখ্য পুনঃস্থাপনের প্রয়াস দেখা দিয়েছে। জনের সাধারণ মানুষ এই দুই শ্রেণীর বাইরে। আজ এই বিশাল জনের নাম বদলে বিশ্ (= বিট) বা

প্রজা নাম দেওয়া হয়েছে। কী বিড়ম্বনা দেখ, যে একদিন জন (পিতা) ছিল তাকে আজ (পুত্র) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর্য! একে কি তুমি বঞ্চনা বলবে না?"

"আর পুত্র! এ ছাড়াও আরো অনেকে আছে যাদের তুমি গুনতির মধ্যে ধরনি।"

"হাঁ, আর্য জনের বাইরের প্রজাবৃন্দ—যেমন শিল্পী, ব্যবসায়ী, দাসদাসী রয়েছে। হয়ত এই কারণেই জনকে ক্ষমতাচ্যুত করায় সামন্তবৃন্দ সফল হয়েছে। আর্য ভিন্ন প্রজারা যখন দেখত যে তাদের শাসক-জনের লোকেরা কারুর দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে তখন তারা খুশীই হত। আর এই ব্যাপারটাকেই রাজারা ন্যায় বিচার বলে জাহির করে।"

"পুত্র! তুমি হয়ত ভুল করছ না, কিন্তু এ কথা আমায় বল তো যে, রাজ্য কার হাতে ছেড়ে দেব? চোর, অপহারক—সামন্ত ও ব্যবসায়ী এদের সকলকেই কি নেওয়া হবে—কেননা আর্য জন ও অনার্য প্রজা যারা সংখ্যায় যথেষ্ট তারা কি রাজ্য শাসন করতে পারবে? আর এদিকে ধর্ম সামন্ত ও রাজ সামন্তরা ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রজাদের ওপর—তাদের গ্রাস করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়েই আছে। মাত্র ছয় সাত পুরুষ আগেই ত কুরু-পাঞ্চাল জনের হাত থেকে ক্ষমতা অপহৃত হয়েছে, জনের শাসনের কথা লোকে এখনো ভুলে যায়নি। সে সময় কেন দিবোদাসের রাজত্ব ছিল না, তখন এই দেশকে পাঞ্চালা (সারা পাঞ্চালবাসীর দেশ) বলা হত—কারণ দেশটা তাদেরই ছিল। কিন্তু আজ আর সেই অবস্থায় ফিরে যাবার পথ নেই।"

"হাঁ, পথে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মত অনেক গ্রহ লুকিয়ে আছে।"

"এতে প্রমাণ হয় যে, আমি পরবশ হয়েছি, কালের গতি বদলাতে পারিনি, কাল কি ঘটবে তাও জানি না। আমি এতেই খুশী যে সুদাসের মত পুত্রলাভ করেছি। এক সময় আমি তরুণ ছিলাম। তখন পর্যন্ত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের শ্লোক গাথা মানুষের ধর্ম-কর্ম জীবনের ওপর এত মায়াজাল ছড়াতে পারেনি। আমি ভাবতাম রাজা যে দস্যুবৃত্তি করে তাকে কমাতে হবে; কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্য তা পারিনি। সে সময় তোমার মা-ই ছিল আমার যথাসর্বস্ব। তারপর যখন আমি ভগ্নমনোরথ ও নিরাশ হতে লাগলাম তখন এই পুরোহিতরা শুধু নিজেদের কবিতা ও স্তুতিগাথাই নয় নিজেদের কন্যাদের পাঠিয়ে আমাকে ফাঁসিয়ে দিল। আমার রাণী-মহল শত শত দাসী কন্যায় ভরে গেল—এর তুলনা কেবল ইন্দ্রের সঙ্গেই চলতে পারে। দিবোদাসের এই পতন থেকে তুমি শিক্ষা নাও, সতর্ক হও এবং যত্নের সঙ্গে চেষ্টা কর, হয়ত তোমার সামনে পথের সন্ধান মিলবে, দস্যুবৃত্তির অবসান সম্ভব হবে। কিন্তু সুদাসের মত সহৃদয় শাসককে সরিয়ে হৃদয়হীন প্রবঞ্চক, প্রতর্দন-এর মত শঠের হাতে রাজ্য দিলে পাঞ্চালের ভাল হবে না। আমি পিতৃলোকে গিয়েও তোমার সযত্ন চেষ্টা লক্ষ্য করে সুখী হব।"

দিবোদাস দেবলোকে প্রয়াণ করল। সুদাস এখন পাঞ্চালের রাজা। ঋষিমণ্ডলী দলে দলে তার চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। সুদাস এখন বুঝল যে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতাদের নাম নিয়ে এই শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধরা লোকেদের কিভাবে অন্ধ বানিয়ে রাখে। তাদের শক্ত খপ্পরের কঠিন আওতা সম্বন্ধে তার জানা ছিল। যাদের উপকার

করবে বলে সে ঠিক করেছিল—সেই প্রজারাই তাকে ভুল বুঝল। অতীতের দিনগুলোর কথা মাঝে মাঝে তার মনে হত—ছিন্ন বস্ত্রে নগ্নপদে বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সেই দিন-গুলোর কথা। সেদিন তার মনে শান্তি ছিল অনেক বেশী। সেদিন মুক্ত স্বাধীন সুদাসের হৃদয়ের ব্যথা বোঝবার মত, তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করার মত কোন দরদী তার পাশে ছিল না। পুরোহিত ও ঋষিরা তাদের কন্যা ও পৌত্রীদের তার কাছে পাঠাত; তার করদ সামন্তেরা আপন স্ত্রীদের আর প্রদেশ সামন্তরা পাঠাত কুমারী মেয়েদের তার অন্তঃপুরে। কিন্তু সুদাস নিজেকে আগুন-লাগা ঘরে বসে থাকার মত মনে করত। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অপেক্ষমানা সেই নীলনয়নীর কথা সে ভুলতে পারত না।

সুদাস তার সমস্ত প্রজাদেরই—আর্য অনার্য নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু তার আগে তার দরকার হয়ে পড়ল যে, ঈশ্বরের কৃপার দিকে চেয়ে আছে যে প্রজা সাধারণ তাদের কাছে প্রমাণ করা যে সুদাস ভগবানের করুণা লাভ করতে সমর্থ। আর এই অনুগ্রহ লাভের একমাত্র উপায় পুরোহিতদের প্রশংসাভাজন হওয়া। শেষ পর্যন্ত পুরোহিতদের কাছ থেকে এই প্রশংসা বাণী আদায় করার জন্য তাকে সোনা, রূপা, ক্রীতদাস ও গো-দান করতে হল। এই সবের পর চর্বিযুক্ত মাংস এবং সুস্বাদু মদ খাওয়ার পর পুরোহিতরা সিদ্ধান্ত করল যে সত্যিই সুদাসের নামের যা অর্থ—অর্থাৎ সুদাতা তা সার্থক। এই সমস্ত ধার্মিক চাটুকারেরা সুদাসের বদান্যতা সম্পর্কে অসংখ্য শ্লোক লিখেছিল—আজও সেগুলো ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু কে বলতে পারে—এই সমস্ত স্তুতিবাদ শুনলে পর কী গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে সে এর লেখকদের দেখত।

সুদাসের লোভনীয় সুনাম অনতিবিলম্বে শুধু উত্তর পাঞ্চালে অর্থাৎ বর্তমান রুহেলখণ্ডে আর সীমাবদ্ধ রইল না—আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ল। নিরানন্দ অস্তিত্ব বজায় রেখে সে যথাসাধ্য সমস্ত প্রজার কল্যাণার্থে কাজ করে চলছিল।

পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর পর তার মাতারও মৃত্যু হল। অভ্যস্ত হয়ে উঠবার আগে যে বেদনায় অহোরাত্র তার হৃদয় টন টন করত—তা আজ যেন বিপজ্জনক দুষ্ট ক্ষতের মত তাকে পেয়ে বসল। দিনের প্রতি মুহূর্তে সে যেন দেখতে পেত, অপনা জলভরা চোখ আর কম্পমান ঠোঁট দুটি নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, "আমি অপেক্ষা করে থাকব তোমার জন্যে।" সুদাসের চোখের সমস্ত জলও তার এই জ্বলন্ত চিন্তাকে নেবাতে পারত না। একদিন পর্বতদেশে মৃগয়ার ছলে সে তার রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

যে পুরাতন গৃহে সে অপনার প্রেমলাভ করেছিল—সেটি সেদিনও দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু জেতা বা তার প্রিয় কন্যার দেখা সে পেল না। দুজনেই তখন গতায়ু হয়েছে। অপনা মাত্র এক বছর আগে মারা গেছে। অপনার যে ভাই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল, সে পরে ফিরে এসে সপরিবারে বাস করতে শুরু করেছে; কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে নতুন করে

সম্বন্ধ স্থাপন করবার তার কোন ইচ্ছা ছিল না। অপনার এক বান্ধবীব সাথে সুদাসেব দেখা হল—সে কাঁদতে কাঁদতে সুদাসকে মৃতাব কতকগুলো রঙ্গীন পোষাক—ঘাঘবা, শাল, কাঁচুলি এবং শিবস্ত্রাণ দেখাল ও বলল, "আমাব বান্ধবী তাব শেষ দিনে সুদাসেব নিকট প্রতিশ্রুতি দিযেছিল সে, তাব জন্য এখানে অপেক্ষা করে থাকবে।"

সুদাস পোষাকগুলো নিযে তাব বুকে ও চোখে চেপে ধবল। অপনাব দেহেব সুবাস তখনও যে এগুলোব মধ্যে বর্তমান ছিল।

প্রবাহণ

স্থান : পাঞ্চাল (উত্তর প্রদেশ)

কাল : খৃষ্টপূর্ব ৭০০ শতক

[আজ থেকে ১০৮ পুরুষ আগের এই কাহিনী। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন বৈদিক যুগ শেষ হতে চলেছে—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের রচনা আরম্ভ হয়েছে, এই সময় উদ্যান রচনা ও লোহার ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।]

একদিকে ঘন নিবিড় সবুজ বন, করিন্তা (মহুয়ার) মাদক গন্ধ, পাখীর কুজন, অন্য দিকে প্রবাহিণী গঙ্গার স্বচ্ছ ধারা—তীরে আমাদের হাজার হাজার পাংশুটে বর্ণের গাভীগুলি চরে বেড়াচ্ছে, আর হুংকার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল বলিষ্ঠ বৃষভ। প্রবাহণ! এই মনোরম দৃশ্য দেখে চোখকে তৃপ্ত করা উচিত। তুমি তো দেখছি দিন-রাতই সাম গান (উদ্গীত গাথা) গাইছ, অথবা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মন্ত্র আবৃত্তি করছ।

"লোপা, তুমি যে চোখ দিয়ে এই দৃশ্য দেখ—আমি সেই চোখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি পাই।"

"হুঁ! কথায় তোমার সঙ্গে পারা মুস্কিল—খুব কথা বানাতে পারো। তোমাকে যখন তোমার সহপাঠিদের সঙ্গে সুর করে পুরোণো শ্লোক ও মন্ত্রো পাঠ পড়তে দেখি তখন মনে হয় আমাদের প্রবাহণ স্তন্যপায়ী শিশুই থেকে যাবে।"

"তাই নাকি! প্রবাহণ সম্পর্কে তোমার সত্যিই এই ধারণা নাকি?"

"ধারণা যাই হোক, তবে আরো একটা ধারণা আছে, যে সব সময়ের জন্যে প্রবাহণ আমার, আমারই থাকবে।"

"এই আশা ও বিশ্বাসেই, লোপা, প্রভূত শ্রম ও বিদ্যার্জনের শক্তি পাই। আমি নিজের মনকে জোর করে সংযত করতে অভ্যস্ত—তা না হলে কতবার আমার মন পুরাণো গাথা, পুরাণো মন্ত্র, পুরাণো উদ্গীতগুলি বার বার মুখস্থ করার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে। মন যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শরীর যখন অবসন্ন—যখন মনে হয় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি—সেই সংকট মুহূর্তে আমার একটি মাত্র দাওয়াই আছে—লোপার সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত মিলনের আশাই আমায় প্রেরণা জোগায়।"

"আর এই সময়টার জন্য আমিও সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকি।"

লোপার পিঙ্গল বর্ণ চোখ দুটির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কোন এক দূর লক্ষ্যে। প্রভাতী হাওয়ায় তার দীর্ঘ স্বর্ণাভ কোমল কেশরাশি উড়ছিল। মনে হচ্ছিল লোপা যেন কোন্ সুদূরে হারিয়ে গেছে। প্রবাহণ তার চুলগুলির ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, "তোমার তুলনায় আমায় নিজেকে বামন মনে হয়।"

"বামন! না গো না, আমার প্রবাহণ।"—বলতে বলতে লোপা তার সুডৌল গাল প্রবাহণের গালের ওপর রেখে বলতে লাগল, একদিন আমি তোমার ওপর অভিমান করতাম—মনে পড়ে কি তোমার, সেই দিনগুলি। যেদিন তুমি পিসীমার সঙ্গে এলে আমাদের বাড়ী—আমি আমার শিশু চোখ দিয়ে আর এক আট বছরের বালককে দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র তিন কি চার। কিন্তু আগের স্মৃতি সেদিনের শিশু-চিত্তকে অঙ্কিত করতে এতটুকু ভুল করছে না। আজও মনে পড়ছে—এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—তোমার সেই স্বর্ণাভ কুঞ্চিত কেশ, সরু নাক, পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট, বড় বড় উজ্জ্বল নীল চোখ, আর গৌর বরণ তপ্ত দেহ। আমার কেমন লজ্জা হল। মা তোমাকে আদর করে চুমু খেয়ে বললেন, পুত্র প্রবাহণ, এই তোমার মামাত বোন। ও। লজ্জা হয়েছে, এ লজ্জা দূর কর।"

"আর আমি তোমার কাছে এগিয়ে গেলাম। তুমি মামীমার সুগন্ধিত নবীন কেশ-রাশির আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেললে।"

"আমি মুখ লুকালেও চুলের ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম তুমি কি করো। বাড়ীতে মা দাস ও দাসীদের সন্তানেরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাবার আচার্যকুল অর্থাৎ বিদ্যাপীঠ তখনো গড়ে ওঠেনি। এই ঘর আমার একলা মনে হত, তাই তোমাকে দেখে সেদিন মনে মনে কী খুশীই হয়েছিলাম।"

"খেলার জন্যে! আর তবু তুমি মুখ লুকিয়েছিলে। আমি তোমার নগ্ন সাদা শরীর ও ফোলা ফোলা গাল দুটো দেখছিলাম। আমার শিশুনেত্রে ভালই দেখাচ্ছিল। কাছে গিয়ে তোমার কাঁধে হাত রাখলাম। তোমার মনে পড়ে কি, মা ও মামীমা কি করছিল? দুজনেই মুচকি হেসে বলে উঠল, হে ব্রহ্মা আমাদের সাধ পূর্ণ কর। তখন সাধ পূর্ণ কর প্রার্থনার মানে বুঝিনি।"

"না, প্রবাহণ আমার মনে পড়ছে না। আমার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট যে, আমার কাঁধের ওপর তোমার নরম হাতের স্পর্শ এখনো মনে আছে।"

"আর তুমি সংকোচে একেবারে জড়সড়ো হয়ে গেলে।"

"তুমি আমার হাতটা তোমার হাতের মধ্যে নিয়েছিলে, কিন্তু মুখে রা শব্দ ছিল না—যেন ঠোঁট দুটো সেলাই করা। তখন মা কি বলেছিল মনে আছে?"

"মামীমার প্রতিটি কথাই আমার মনে আছে। তাকে কি আমি কখনো ভুলতে পারি! মা আমাকে গার্গ্য মামার কাছে রেখে ফিরে বাড়ী গেল, কিন্তু মামীমার অপার স্নেহ আমার মায়ের স্থান দখল করেছিল। মামীমাকে আমি কেমন করে ভুলতে পারি বল?" প্রবাহণের চোখ দুটো জলে ভরে এল, সে লোপার ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলল, "লোপা তোমার মতই মামীমার মুখ ছিল; আমরা দুজনে এক বিছানায় শুতাম। রাত্রে কতবারই না আমার—তোমার নয়—চোখের পাতা খুলে যেত, কিন্তু দূর থেকে মামীমাকে আসতে দেখলেই আবার চোখ বুজতাম। যখন মামীমার মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার ঠোঁটের

পরশ গালে পেতাম তখন চোখ মেলতাম। মামী বলত, বৎস জেগে আছ! তারপর তোমার গালে চুমু খেত, কিন্তু তুমি বেহুঁস হয়ে ঘুমোতে।"

লোপার চোখও অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো, সে উদাস স্বরে বলল, "মাকে আমি এত কম দেখেছি।"

"হাঁ, তুমি যে কথা বলছিলে। যে দিন প্রথম এই বাড়ীতে এলাম সেদিনের কথা। আমাকে তোমার সামনা-সামনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তোমার মা বলল, বৎস! এই তোমার মামাত বোন। ওর ঠোঁটে চুমু খাও আর ওর সংঙ্গে ঘোড়া ঘোড়া খেল।

"হ্যাঁ, তুমি আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলতে ডাকলে। আমি চুলের ভেতর থেকে আমার মুখ বের করলাম। তুমি তারপর ঘোড়া হ'লে আর আমি তোমার পিঠে চেপেছিলাম।"

"আর আমি তখনই তোমাকে পিঠে চাপিয়ে পাঁচ ছয় হাত নিয়ে গেলাম।"

"আমি খুব দুষ্ট ছিলাম না?"

"তুমি সব সময়-ই ভয়হীন ছিলে, লোপা! আর আমার কাছে তো সব কিছুই ছিলে, তুমি! মামার ভয়ে আমি নিজে পড়াশুনায় লেগে থাকতাম আর যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়তাম তখন তোমার কাছে আসতাম।"

"আর তোমাকে দেখার জন্যে আমি তোমার কাছে এসে বসতে লাগলাম।"

"আমার মনে হচ্ছে, লোপা! তুমি যদি আমার অর্ধেক পরিশ্রম করতে, তাহলে মামার শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারতে।"

"কিন্তু তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।" লোপা প্রবাহণের চোখ দু'টির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল—"আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে যেতে চাই না।"

"কিন্তু তাতে আমি বেশী খুশী হতাম।"

"কেন না, আমাদের দু'জনার আপন আপন পৃথক সত্তা কিছু নেই।"

"লোপা, তুমি যে শুধু আমার মনে উৎসাহই দিয়েছ তা নয়, আমার শরীরে শক্তিও দিয়েছ। রাতে আমি কত কম ঘুমোতাম! পড়া মুখস্থ করতে এবং অন্যকে দিয়ে মুখস্থ করাতে খাওয়া-দাওয়া পযন্ত ভুলে যেতাম। তুমি আমাকে পাঠগৃহের সেই অন্ধকার থেকে জোর করে টেনে বার করতে, কখন বা বনে, কখন বা উদ্যানে এবং কখন বা গঙ্গার ধারা দেখতে নিয়ে যেতে। এ সব আমার খুবই ভাল লাগতো। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চাই তিনখানি বেদ ও ব্রাহ্মণের সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে।"

"কিন্তু এখন তো তোমার সে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাবা বলেন, প্রবাহণ এখন আমার সমতুল্য।"

"তা আমিও বুঝতে পাচ্ছি। ব্রাহ্মণ বিদ্যা আয়ত্ত করতে আর সামান্যই বাকী কিন্তু বিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণ্যতেই শেষ হয় না।"

"এই কথা আমিই তোমায় বলতে যাচ্ছি না,—আচ্ছা, এখনও কি তুমি পলাশ-দণ্ড আর রুক্ষ কেশ নিয়ে চলবে ?"

"এ নিয়ে তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না, লোপা ! পলাশ-দণ্ড এখন ছাড়লেই হল। আর আমার এই ষোল বছরের রুক্ষ চুলগুলিতে অনায়াসে তুমি সুগন্ধিত তেল দিতে পার।"

"প্রবাহণ, বলতো রুক্ষ চুলের ওপর এত বেশী জোর দেওয়া হয় কেন ? আমি তো বুঝতে পারি না। যদি সংযমের কথা বল—তুমি তো আমার ঠোঁটে চুমু খেতে কখনও ছাড়নি।"

"তার কারণ ছোট বেলার অভ্যাস।"

"তাহলে আচার্যকুলের অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্রত কি কঠোরভাবেই পালন করে ?"

"হ্যাঁ লোপা, তা না করে কোন উপায় নেই বলে করে। এ সব হল সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য। মানুষ একে ব্রাহ্মণ কুমারদের কঠিন তপস্যা বলে মনে করে।"

"বেশ তাই যদি হয় তবে কুরুরাজ আমার বাবাকে তো জনপদ, হীরে, সোনা, দাস-দাসী ঘোড়া ও রথ উপঢৌকন দিয়ে চলেছেন। কেন ? আমার ঘরে প্রথম দিকে অনেক দাসী ছিল। আবার কিছুদিন আগে কুরুরাজ আরও তিন জন দাসী পাঠিয়েছেন, তাদের জন্য কোন কাজই নেই।"

"তাদের বেচে দাও, লোপা। ওরা তরুণী। এক-এক জনের জন্য তিরিশ নিষ্ক (আর্শফী-স্বর্ণমুদ্রা) পেয়ে যাবে।"

"আমার আপশোষ হয়। আমরা ব্রাহ্মণ, বেশী শিক্ষিত এবং বেশী জ্ঞানী, কেন না, আমাদের জ্ঞানার্জনের সুযোগ আছে। কিন্তু যখন আমি এ সব ক্রীতদাসের জীবন দেখি তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের ওপর ক্রুদ্ধ হই। আজ দেবকুল, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, ও ঋষিদের এবং বাবার মত আজকের সমস্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাশাল (ধনীক)-দের বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা জেগে ওঠে। সর্বত্রই দেখি ব্যবসা, দর কষাকষি, লাভ, লোভ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। সে দিন কালীদাসীর স্বামীকে বাবা কোশল-দেশীয় সেই বণিকের হাতে পঞ্চাশ নিষ্কে বেচে দিলেন। কালী আমার কাছে কান্নাকাটি করায় আমি তার হয়ে বাবাকে অনেক বললাম। কিন্তু তিনি বললেন—'সমস্ত দাসদের ঘরে রেখে দিলে স্থান সংকুলান হবে না। আর সত্যিই যদি বিনা কাজে ঘরে রাখা যায় তাহলে ঐ টাকাগুলোও লোকসান। বিদায়ের পূর্ব রাত্রে তারা স্বামী স্ত্রী কি কান্নাটাই না কাঁদল। তাদের দু' বছরের সেই ছোট মেয়েটি—সকলে তাকে দেখলে বলত বাবার চেহারার সঙ্গে মিল আছে—সেই বাচ্চাটাও ভোরে উঠে কঁকিয়ে কাঁদল! কিন্তু কালীর স্বামীকে বেচে দেওয়া হল। যেন সে মানুষ নয়, পশু। ব্রহ্মা যেন তাকে আর তার শত শত প্রজাকে এইজন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমি তা স্বীকার করতে রাজী নই, প্রবাহণ! আমি তোমার মত তিনখানি বেদ মুখস্থ করিনি সত্যি, কিন্তু তা শুনে এই বুঝেছি যে, চোখে দেখতে পাওয়া

যায় না, এইরকম বস্তু (লোক-জগত) বা শক্তির প্রলোভন বা মায়া মাত্র বলে দেখানো হয়েছে।"

প্রবাহণ লোপার আবক্ত গালটি নিজের চোখের সঙ্গে চেপে বললো, "আমাদের প্রেম, মতভেদ রাখার জন্যই হ'য়েছে।"

"মতভেদ আমাদের প্রেমকে আরও .াঢ় করেছে।"

"ঠিক বলেছ, লোপা! অন্যে যদি এ কথাই বলত তাহলে আমি কতই না রাগ করতাম, কিন্তু সেই কথাগুলিই যখন দেখি যে তোমার মুখ দিয়ে আমার সমস্ত দেবতা, ঋষি এবং আচার্যদের ওপর তীব্র বাণের মত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন তোমার ওই অধরে চুম্বন করতে বার বার ইচ্ছা হয়। কেন?"

'তার কারণ হল, আমাদের নিজেদের মধ্যেই দুটো মতের দ্বন্দ্ব প্রায়ই চলেছে। আমরা এ দ্বন্দ্বের প্রতি সহিষ্ণু, কেন না আমরা একে অপরকে আমাদের অভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করি।"

"তুমিও তো আমার অভিন্ন অঙ্গ, লোপা!"

২

"তুমি তো কখনো শিবির দোশালা, কাশীর চন্দন, সামুদ্রিক মোতি দিয়ে নিজেকে বিভূষিতা কর নি। এসবে তোমার এত উদাসীনতা কেন, প্রিয়ে।"

'ওগুলোতে কি আমায় বেশী সুন্দর দেখাবে?"

'আমার কাছে তো তুমি সব সময় সুন্দর।"

"তাহলে এই বোঝা চাপিয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সত্যি বলছি প্রিয়! তুমি যখন এই ভার বোঝাকে মুকুট বলে নিজের মাথায় পর তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।"

"অথচ অন্য মেয়েরা কাপড় গয়নার জন্য কতই না ঝগড়া করে।"

"আমি সে রকম মেয়ে নই।"

"তুমি হচ্ছ সেই রকম মেয়ে যে পাঞ্চাল রাজার হৃদিরাজ্য শাসন করে।"

"আমি প্রবাহণের স্ত্রী, পাঞ্চালীদের রাণী নই।"

"বেশ তাই প্রিয়তমে! কিন্তু আজকের এমনি দিনের কথা আমরা তো কল্পনাও করিনি। আমি যে পাঞ্চাল রাজপুত্র একথা মামা একেবারেই গোপন রেখেছিলেন।"

"সে সময় বাবা আর কি-ই বা করতে পারতেন। পাঞ্চাল রাজার শতেক রাণীর মধ্যে পিসীমা অন্যতমা মাত্র। আর তোমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল পাঞ্চাল রাজের আরো দশটি ছেলে। তাই কে ভেবেছিল তুমিই একদিন পঞ্চাল রাজ সিংহাসনের উত্তরাধীকারী হবে।"

"আচ্ছা লোপা, এই রাজভবন তোমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না কেন ?"

"কেন না, গর্গ ব্রাহ্মণের প্রাসাদে—যেখানে ছিল বিদ্যাপীঠ, পড়ানো হোত বেদ আর ব্রাহ্মণ্য—আমার ক্লান্তি ও বিরক্তি—এসেছিল সেখানেই। আমাদের জন্যে ঐ প্রাসাদ ছিল বটে, কিন্তু ক্রীতদাস-দাসীদের জন্যে ? আর আমাদের সেই বিদ্যাপীঠের প্রাসাদেব তুলনায় এই রাজপ্রাসাদ হচ্ছে হাজার গুণে বড। এই বিরাট্ প্রাসাদে একমাত্র তুমি আর আমি ছাড়া বাকী সবাই দাসদাসী। দুজন অদাসের জন্যে দাস-দাসীতে ভরা এই ভবন অ-দাস ভবন হয়ে যায় না। কিন্তু প্রবাহণ আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে তোমার এই কঠোর হৃদয় দেখে।"

"তাই তো কঠিন বাক্যবাণ সহ্য করতে পাচ্ছি।"

"না, মানুষের এবকম হওয়া উচিৎ নয়।"

"আমি মানুষ হতে চাই নি, চেয়েছিলাম যোগ্য মানুষ হতে প্রিয়তমে! যদিও যোগ্যতা অর্জনের সময এককথা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয নি যে, আমাকে একদিন এই রাজ ভবনে আসতে হবে।"

"তোমার অনুশোচনা হচ্ছে না তো, প্রবাহণ, আমার সঙ্গে প্রেম কবাব জন্যে।"

"শিশু জন্মমাত্র বিনা আযাসে মাতৃস্তন পান কবতে পায—আমিও কোন প্রযাস না কবে তোমাব প্রেম লাভ কবেছি, তোমাব ভালবাসা আমাব প্রতিদিনেব অভ্যস্ত জীবন শরীরের অঙ্গ হয়েছে। আমি সংসারী পুরুষ, লোপা। তবু আমি তোমাব প্রেমের কদর বুঝি। মনের গতি সব সময় এক রকম থাকেনা। যখন কোন অবসাদ আসে তখন আমার কাছে জীবনটা দুর্বিসহ হযে দাঁড়ায। তখন তোমাব প্রেম ও সুবিচার আমাকে মস্ত বড অবলম্বন যোগায়।"

কিন্তু আমি তোমাব যতটা অবলম্বন হতে চাই-তা যে হতে পাচ্ছিনা, আব এব জন্যে আমি বেদনা বোধ করি, প্রবাহণ!"

"তার কাবণ, রাজ্য শাসন কবার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল।"

"কিন্তু একদিন তো তুমি মহাপণ্ডিত হতে চেয়েছিলে।"

"তখন আমার জানা ছিল না যে, পাঞ্চালপুব (কনৌজ) এব রাজভবনের উত্তরাধিকারী আমি।"

"কিন্তু রাজকার্যেব বাইরেও যে তুমি হাত দিচ্ছ, এতে তোমাব দবকাব কি ?"

"অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মেব কল্পনা! কিন্তু লোপা এটা তো রাজকার্যের বাইরে নয। রাজ্যকে অবলম্বন দেওযাব জন্যেই আমাদের পূর্বপুরুষবা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে এতটা সম্মানিতের পদে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই সমস্ত ঋষিরা ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের নামে জনগণকে রাজআজ্ঞা পালন করতে শেখাত। তখনকার দিনে রাজারা সাধারণের বিশ্বাস-ভাজন হওয়াব জন্যে বড বড় ব্যয়সাধ্য যজ্ঞও করত। আজকালও আমরা করে থাকি এবং ব্রাহ্মণকে দান দক্ষিণা দিই। এই যজ্ঞ ও পুরোহিতদের দামী জিনিষ দক্ষিণা দেওয়ার মধ্য দিযে জনগণের মনে দেবতাদের আলৌকিক বিশ্বশক্তির ওপর

বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে চায়, মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাতে চায় যে, সুগন্ধিত তণ্ডুল, গোবৎসের নরম মাংসের সুরুয়া, সূক্ষ্ম বস্ত্র, মুক্তার ভূষণ যা কিছু আমরা ব্যবহার করি না কেন এ সমস্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। পুরাণো দেবতারাই তো সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল, তবু এই নতুন ব্রহ্মের আমদানির প্রয়োজন কি ?"

"পুরুষানুক্রমে বহু যুগ ধরে কেউ ইন্দ্র, বরুণ বা ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ দেখেনি। তাই এখন অনেক লোকের মনেই সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছে।"

"তাহলে ব্রহ্ম সম্পর্কে সন্দেহ হবে না কেন ?"

"সেই জন্যেই তো ব্রহ্মের রূপ বর্ণনা আমি এমনভাবে করেছি যে, তাকে প্রত্যক্ষ দেখার কথাই উঠবে না। দেবতারা ছিল সাকার—ব্রহ্ম হবে নিরাকার। আকাশের রূপ দেখাশোনার বিষয় বস্তু নয়, কারণ যত্র তত্র সর্বত্রই বিরাজমান—তাই তা দেখবার প্রশ্ন ওঠে কি ? প্রশ্ন ওঠে সাকার দেবতাদের সম্পর্কে।"

তুমি যে আকাশ আকাশ করছ তাও সাধারণ নয়, বরঞ্চ উদ্দালক আরণির মত তাদেরও মতিভ্রম ঘটায়। তোমার মতলবটা কি ? তুমি কি প্রজাদের ভ্রমাচ্ছন্ন রাখতে চাও।"

"লোপা ! তুমি তো আমায় জানো, তোমার কাছে কি-ই বা লুকোতে পারি ? এই যে রাজশক্তি (রাজভোগ) একে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার জন্যে এর প্রয়োজন আছে। যারা সন্দেহ করবে তাদের বিদ্যা বুদ্ধিকেই এ দিয়ে খাটো করা যাবে—তাদের নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে নিজেদেরই সন্দেহ জাগবে। কারণ, যারা দেবতার যজ্ঞ বা পূজোর প্রতি সন্দেহ করে তারা আমাদের ঘোরতর শত্রু।"

"কিন্তু তুমিও তো ব্রহ্ম সত্তাহীন নয় বলছ, ব্রহ্মের সত্তা ও দর্শনের কথাও বলছ।"

"সত্তা আছে, কাজেই দেখতেও পাওয়া চাই। কিন্তু তা ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, কারণ তাহলেই সন্দেহবাদীরা ইন্দ্রিয় দ্বারা (চাক্ষুষ) দেখতে চাইবে। তাই আমি বলেছি ব্রহ্মের দর্শন পেতে হলে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা সম্ভব, আর এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় লাভ করতে হলে চাই সাধনা। আর সাধনার যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে তাতে মানুষ ৫৬ পুরুষ ধরেও বিশ্বাস অটুট রাখতে পারবে—ভ্রমাচ্ছন্ন থাকবে। আমি পুরোহিতদের স্থূল হাতিয়ারকে নিষ্ফলা ভেবেই এ হাতিয়ার আবিষ্কার করেছি। লোপা, তুমি কি কখনো শাবরের কাছে পাথর ও তামার হাতিয়ার দেখেছ।

"হাঁ, তোমার সঙ্গে যখন দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে গিয়েছিলাম সেই সময় দেখেছি।"

"যমুনার ওপারে আমরা গিয়েছিলাম বটে। আচ্ছা শাবরদের পাথরের ও তামার হাতিয়ার আমাদের কালো লোহার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে কি ?"

"না, পারে না।"

"পারে না তো ! তাই বলছিলুম বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পুরানো দেবতারা বা ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞও আগেকার বুদ্ধিমানদের যাও বা সন্তুষ্ট করতে পারত—এখন তা সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়।"

"তাদের কাছে তোমার সৃষ্ট এই ব্রহ্ম—তাও কিছু না। তুমি ব্রাহ্মণ জ্ঞানীদের ধ'রে

শিষ্য বানাচ্ছ, তাদের ব্রহ্মজ্ঞান শেখাচ্ছ, অথচ তোমারই ঘরে বসে তোমার কথাকে সরাসরি মিথ্যা বলে আমি মনে করি।"

"কারণ, তুমি আসল ব্যাপারটা জানো। তুমি আমার খাঁটি রহস্য (উপনিষদ্) জান।

"ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানীই হবে তবে কেন তোমার রহস্য তারা জানবে না ?"

"তাও তো তুমি দেখতে পাচ্ছো। কোন কোন ব্রাহ্মণ হয়তো উপনিষদ্ পরীক্ষা করে দেখতে পারে, কিন্তু তারাও আমার এ রহস্য (উপনিষদ্)কে নিজেদের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার বলে মনে করবে। ওদের পৌরোহিত্য ও গুরুগিরির ওপর মানুষের অবিশ্বাস হতে আরম্ভ করেছে, যার পরিণাম হতে পারে সব রকম দক্ষিণা হতে বঞ্চিত হওয়া ; ফলে চড়ার জন্য অশ্ব-রথ, খাবার জন্য ভাল খাদ্য, থাকার জন্য সুন্দর প্রাসাদ এবং ভোগের জন্য সুন্দরী দাসী থেকে বঞ্চিত হওয়া।"

"এ তো ব্যবসা।"

"ব্যবসা তো নিশ্চয়ই। আর এমনি ব্যবসা যে এতে লোকসানের ভয় নেই। এ জন্যই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সমিধ (যজ্ঞ কাষ্ঠ) হাতে আমার কাছে শিষ্য হ'তে আসে। আর আমিও ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে উপনয়ন ছাড়াই—বিধিমত গুরু না হ'য়েও তাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করি।"

"এ অত্যন্ত নিকৃষ্ট চিন্তা, প্রবাহণ !"

"তা স্বীকার করি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এ সব থেকে উপযোগী পন্থা। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের নৌকো হাজার বছরও কাজ দেয়নি কিন্তু প্রবাহণের নির্মিত নৌকোয় দু' হাজার বছর পরেও পরধন-ভোগী রাজা ও সামন্তরা পার হ'তে পারবে। যজ্ঞরূপী নৌকোকে আমি অদৃঢ় বলে মনে করি, লোপা ! তাই আমি এ দৃঢ় নৌকো নির্মাণ করেছি। এর সাহায্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ মিলিত ভাবে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারবে। কিন্তু, এ আকাশ যে ব্রহ্মের থেকেও বড়—তাই হ'বে আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার, লোপা !"

"কোন্ আবিষ্কার ?"

"মরে গিয়ে আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসা—পুনর্জন্ম।"

"এ তো সব চেয়ে জালিয়াতি।"

"আর সব থেকে কার্যকরীও বটে। এরই ফলে এক দিকে সামন্ত ব্রাহ্মণ এবং ব্যবসায়ীদের হাতে অপার ভোগ-রাশি একত্রিত হয়েছে, অন্য দিকে সাধারণ প্রজা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আবার এ সব নির্ধনদের—যেমন শিল্পী, কৃষক এবং দাস-দাসীদের—ভড়কাবার লোক সৃষ্টি হ'তে আরম্ভ করছে। তারা বলে—'তুমি তোমার শ্রমশক্তি অন্যকে দিয়ে কষ্ট করছ। ওরা তোমাকে মিথ্যাই বিশ্বাস করাতে চায় যে তুমি কষ্ট, ত্যাগ ও দান করলে মরে স্বর্গে যাবে। কিন্তু কেউ স্বর্গে মৃত-জীবকে সেই ভোগ করতে দেখেনি।' এরই জবাব হল যে, এ সংসারে উঁচু-নীচু ভাব, ছোট-বড় জাতি, ধনী-নির্ধনের যে প্রভেদ, তা'হল পূর্বজন্মকৃত ফল। আমি এভাবে পূর্বকার সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখিয়ে দিয়েছি।"

"এ ভাবে তো চোরও তার চুরি করা জিনিসকে পূর্বজন্মের রোজগার বলতে পারে ?"

"কিন্তু তার জন্য আমরা প্রথম থেকেই দেবতা, ঋষি এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের সহায়তা গ্রহণে কৃতকার্য হয়েছি। সেজন্যই অপহৃত জিনিসকে পূর্বজন্মের রোজগার বলে স্বীকার করা হবে না। এ জন্মে বিনা পরিশ্রমলব্ধ ধনকে আমরা প্রথমে. দেবতার কৃপায় পাওয়া বস্তু বলে বলতাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, দেবতা আর দেব-কৃপার ওপর সন্দেহ স্বরু হয়েছে, তখন আমাদের কোন একটা নতুন উপায়ের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণদের চিন্তা করার শক্তিও লোপ পেয়েছে। প্রাচীন ঋষিরা মন্ত্র আর বাক্য মুখস্থ করতেই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর কাটিয়ে দেয়, এ ছাড়া তারা অন্য কোন গভীর বিষয় কোত্থেকে আর চিন্তা করবে ?"

"প্রবাহণ! তুমিও কি করনি? তুমি কি মুখস্থ করতে দীর্ঘ সময় এভাবে কাটিয়ে দাওনি ?"

"মাত্র ষোল বছর। চব্বিশ বছর বয়সের পর আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যা শেষ করে বাইরের সংসারে প্রবেশ করেছিলাম। এখানে আমি পড়া-শুনোর প্রচুর স্বযোগ পেয়েছি। রাজ-শাসনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানার পর আমি দেখলাম, ব্রাহ্মণদের নির্মিত পুরানো নৌকো বর্ত্তমানের জন্য অদৃঢ়।"

"তাই তুমি দৃঢ় নৌকো নির্মাণ করেছ ?"

"সত্যি কি মিথ্যা তা নিয়ে আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হল, কার্যোপযোগিতা নিয়ে লোপা! সংসারে ফিরে আসা পুনর্জন্মের কথা আজ নূতন বলে মনে হচ্ছে ঠিকই, আর তুমি এর অন্তর্গূঢ় স্বার্থও জান। কিন্তু, আমার ব্রাহ্মণ চেলারা তো এই নিয়ে এখন থেকেই মাতামাতি স্বরু করছে। পিতরদের এবং দেবতাদের (পিতৃ-যান, দেব-যান) পথ বুঝবার জন্য এখুনি মানুষ বার বছর গরু চরাতে প্রস্তুত। তুমি আমি থাকব না, কিন্তু এমন সময় আসবে যখন সমস্ত দরিদ্র প্রজা এই পুনর্জন্মের আশায় সারা জীবনের তিক্ততা, কষ্ট এবং অন্যায়কে মেনে নিতে প্রস্তুত হবে। স্বর্গ ও নরক বুঝবার এ কেমন সোজা উপায় আবিষ্কার করেছি, বলতো লোপা ?"

"কিন্তু, নিজের পেটের জন্যে শত শত কোটি মানুষকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ।"

"বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রও পেটের দায়ে বেদ রচনা করেছিল,উত্তর পঞ্চাল (রোহিলাখণ্ড)-রাজা দিবোদাসের শবর দুর্গ অধিকারের পর কবিতার পর কবিতা রচিত হয়েছিল। পেটের সংস্থান করা অন্যায় নয়। আমরা যখন নিজেদের পেটের সঙ্গে হাজার হাজার বছরের জন্য আপন পুত্রপৌত্রাদি, ভাই-বন্ধুদের পেটেরও সংস্থান * করি,

---

* ত্বং তদুক্থমিন্দ্র বর্হণাকঃ
প্রযচ্ছতা সহসা শূর-দর্ষি।
অব গিরের্দাসং শবরং হন্ প্রাবো
দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী॥

ঋগ্বেদ ৬।২৬।২৫

তখন শাশ্বত যশের ভাগী হই। প্রবাহণ এমনি কাজ করছে, যা পূর্বগামী ঋষিগণও করতে পারেননি—যা ধর্মের রুটি ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণও করতে পারেনি!"

"তুমি অতি নিষ্ঠুর, প্রবাহণ!"

"কিন্তু আমি আমার কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করছি।"

৩

প্রবাহণের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তার ব্রহ্মবাদ ও পুনর্জন্ম অথবা পিতৃযানবাদ বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়ে সিন্ধু থেকে আরম্ভ করে সদানীরা (গণ্ডক) পর্যন্ত জয়ধ্বনি তুলেছিল। যজ্ঞের প্রভাব তখনও কমেনি, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীরা তখনো পর্যন্ত এগুলো করতে বিশেষ উৎসাহ পেত। ক্ষত্রিয় প্রবাহণের আবিষ্কৃত ব্রহ্মবাদে ব্রাহ্মণরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল এবং এই বিদ্যায় কুরুকুলের যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল।

কোন এক সময় মন্ত্রের কর্তা এবং যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজের জন্ম যে দেশ দিয়েছিল—সেই কুরু পঞ্চালেই যাজ্ঞবল্ক্য এবং তার সঙ্গী ব্রহ্মবাদী-ব্রহ্মবাদিনীদের জয়-জয়কার হল। ব্রহ্মবাদীদের পরিষদ ক্রমে যজ্ঞের চেয়ে বেশী খ্যাতি সম্পন্ন হয়েছিল। এরি জন্য রাজা রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞের সঙ্গে একটি করে পরিষদ রচনা করত, কখনো বা এরই পরিষদ আলাদা করেও ডাকা হোত। তাতে হাজার হাজার গরু ঘোড়া এবং দাস-দাসী ('বিশেষ ক'রে দাসী, কেন না রাজাদের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত দাসীদের ব্রহ্মবাদীরা বেশী পছন্দ করত) পরিষদের এক এক যুদ্ধ-বিজেতাদের পুরস্কার দেওয়া হোত।

যাজ্ঞবল্ক্য অনেকগুলি পরিষদে বিজয়ী হয়েছে। এবার সে বিদেহ (তিহুর্ত)এর জনক পরিষদে খুব বড় রকমের একটা বিজয় লাভ করল, এবং তার শিষ্য সোমশ্রবা হাজার গরু তাকে দান করল। যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ থেকে আরম্ভ করে কুরু পর্যন্ত সেই গরু-গুলিকে হাঁকিয়ে আনার কষ্ট কেন স্বীকার করবে? সে ওগুলিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলে। এ জন্য ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচুর খ্যাতি হল। হ্যাঁ, হীরে-মুক্ত-সোনা, দাস-দাসী এবং অশ্ব-রথ—এ সমস্ত অবশ্যই সে নিজের সঙ্গে নৌকো ভরে' কুরু-দেশে নিয়ে এসেছিল।

ষাট বছর হল প্রবাহণের মৃত্যু হয়েছে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জন্মগ্রহণ করেনি, কিন্তু একশ' বছর বয়স অতিক্রম করেও লোপা এখনো কর্মক্ষম আছে, পাঞ্চালপুরের (কনৌজের) বাইরে রাজ-উদ্যানে তখন সে বাস করছিল। বাগানের আম-কলা-জাম গাছগুলির ছায়ায় থাকতে সে বেশী পছন্দ করত। জীবনভোর সে প্রবাহণের কথার বার বার বিরোধিতা ক'রে এসেছিল, কিন্তু আজ এই সুদীর্ঘ ষাট বছরে সে প্রবাহণের দোষগুলো

ভুলে গেছে। শুধু আজ তার স্মৃতিপটে জেগে রয়েছে—সারা জীবনের প্রেম। আজও বৃদ্ধার চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়নি কিংবা প্রতিভা তেমন ম্লান হয়নি। ব্রহ্মবাদীদের ওপর আজও সে খাপ্পা। একদিন পাঞ্চালপুরে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী এসে উঠল। রাজোত্থানের পাশেই একটি বাগানে গার্গীকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল। জনকের পরিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাবে ধোঁকা দিয়ে তাকে পরাস্ত করেছিল গার্গী তা কখনও ভুলতে পারেনি। "যদি আর কোন প্রশ্ন কর তবে তোমার মাথা থাকবে না, গার্গী!"—গার্গী ভেবেছিল যে, ও-কোন কথাই নয়। ও-রকম কাজ শুধু উগ্রপাণিই (অপরের রক্তে যে হাত রাঙায়) করতে পারে।

গার্গী লোপার পিতৃ কুলের মেয়ে। লোপা তার বিশেষ পরিচিতা ছিল। যদিও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তার মতামত উল্‌টো ছিল। এবার যাজ্ঞবল্ক্য তার বিরুদ্ধে যে রকম নীচ অস্ত্র প্রয়োগ করলো তাতে গার্গী একেবারে রেগে আগুন হল। তাই যখন তার প্রপিতা-মহীর পিসীমার কাছে এল, তখন তার ভাবের নিশ্চয়ই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। লোপা কাছে এসে গার্গীর কপাল ও চোখে চুমু খেয়ে আলিঙ্গন করল, আর জিজ্ঞেস করল, শরীর কি রকম আছে। গার্গী বললে, "আমি বিদেহ থেকে এসেছি, পিসী!"

"মল্ল-যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি কি বেটি?"

"হ্যাঁ, মল্ল-যুদ্ধই হয়েছে পিসীমা! এ ব্রহ্মবাদী পরিষদ্ মল্ল-যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। মল্ল-যুদ্ধের মতই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছলে-বলে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা হয়।"

"তাহলে তো কুরু-পাঞ্চালের অনেকেই ব্রহ্মবাদী আখড়ায় নেমে থাকবে।"

"কুরু-পাঞ্চাল তো এখন ব্রহ্মবাদীদের দুর্গ।"

"আমার সামনেই ব্রহ্মবাদীদের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করেছিল প্রবাহণ আর তাও সৎ উদ্দেশ্যে নয়। আজ তা দাবানল হয়ে সমস্ত কুরু-পাঞ্চালদের জ্বালিয়ে এখন বিদেহ পর্যন্ত পৌঁছেচে।"

'পিসীমা আমি তোমার কথার সত্যতা এখন কিছুটা বুঝতে পাচ্ছি। বস্তুত, এটা ভোগ-অর্জনের একটা প্রশস্ত পথ। বিদেহে যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পেয়েছে, অন্য সব ব্রাহ্মণরাও প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে এসেছে।

"এ যে যজ্ঞের থেকেও বেশী লাভের ব্যবসা, মা! আমার স্বামী একেই রাজা ও ব্রাহ্মণদের মজবুত নৌকো বলত। তাহলে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের পরিষদে বিজয়ী হ'লো, আর তুমি কিছুই বললে না?"

"যদি বলারই কিছু না থাকত তবে গঙ্গায় এত দূর নৌকো পাড়ি দেওয়ার কোন্ প্রয়োজন ছিল?"

"নৌকোতে এলে! রাস্তায় চোর ডাকাতে ধরেনি তো?"

"না, পিসীমা! ব্যবসায়ীদের বড় বড় নৌকোর সারিতে যোদ্ধারা সঙ্গে থাকে। আমরা ব্রহ্মবাদীরা এতো মূর্খ নয় যে একলা-দোকলা নিজেদের প্রাণ সংকটময় করে চলব।"

"যাজ্ঞবল্ক্য তাহলে সকলকেই পরাস্ত করেছিল?"

"একে পরাস্ত করা বড্ড না।"

"কেন?"

"কেন না, প্রশ্নকর্তা যাজ্ঞবল্ক্যের জবাব শুনে চুপ থাকতে বাধ্য হয়।"

"তুমিও?"

"হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু তার কথায় নয়, কথার ধমকে আমাকে চুপ করতে হয়েছে।"

"কথার ধমকটা কি?"

"হ্যাঁ, আমি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে যাজ্ঞবল্ক্যকে এ রকম ভাবে ঘেরাও করেছিলাম যে, তার বেরোবার পথ ছিল না। তখন সে আমাকে এমন কথা বলল, যা আমি কখনও তার কাছে শুনবো বলে আশা করিনি।"

"কি রে বেটি?"

"আমাকে প্রশ্নের উত্তর দাবি করতে বিরত করা হল, সোজাসুজি আমায় ধমক দিয়ে বলল, "গার্গী আবার যদি কোন প্রশ্ন কর—তাহলে আর তোমার মাথা থাকবে না।"

"তুমি ও-রকম করবে আশা করনি মা, কিন্তু আমি সব কিছুই আশা করেছিলাম, গার্গী! যাজ্ঞবল্ক্য প্রবাহণের উপযুক্ত প্রশিষ্য প্রমাণিত হল। প্রবাহণের মিথ্যাবাদকে সে ষোলকলায় পূর্ণ করেছে। তুমি যে আর কোন প্রশ্ন করনি, ভালই করেছ।"

"তুমি কি করে জানলে পিসীমা!"

"আমি এ জন্য জানতে পারলাম যে, নিজ চোখে তোমার কাঁধের ওপর মাথাটা দেখতে পাচ্ছি।"

"তাহলে পিসীমা, তুমি বিশ্বাস করছ যে, আমি যদি আর কোন প্রশ্ন করতাম, তবে আমার মাথা পড়ে যেত?"

"নিশ্চয়ই। তবে, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-বলে নয়, অন্য লোকের মাথা যে ভাবে পড়তে দেখা যায়, সেই ভাবে।"

"না পিসীমা, তা কখনো হতে পারে?"

"হতে পারে না? তুই এখনো শিশু আছিস বেটি, গার্গী। তুই ভাবিস এ ব্রহ্মবাদ আর কিছুই নয় খালি মনের পাখা মেলা কল্পনা, মনের বিলাস। না, গার্গী তা নয়। এর পেছনে রাজ-রাজড়াদের, ব্রাহ্মণ ও পরশ্রম ভোগীদের মস্ত বড় স্বার্থ লুকানো আছে। যে লগ্নে এই ব্রহ্মবাদ জন্মলাভ করেছিল সেই সময়কালে এর জন্মদাতা আমার পাশেই শয়ন করত। যোদ্ধার হাতে লোহার কৃপাণ যেমন শক্তি যোগায় তেমনিই এই ব্রহ্মবাদ রাজসত্ত্বা ও ব্রাহ্মণসত্ত্বাকে দৃঢ় করেছে।

"পিসীমা, আমি কিন্তু এইভাবে বুঝিনি।"

"তুমি কেন, অনেকেই বোঝেনি। তবে এ কথা আমি বলব না, যে জনক বিদেহ এ রহস্য (উপনিষদ্) বোঝে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য এটা ভালই বোঝে—যেমন আমার পতি প্রবাহণ বুঝত। প্রবাহণ কোন দেবতা, দেবলোক, পিতৃলোক, যক্ষ বা ব্রহ্মবাদে নিজে বিশ্বাস করত না। তার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল ভোগে,

আত্মসুখে, সে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভোগেই অর্পণ করেছিল। মরবার তিন দিন আগেও বিশ্বামিত্রকুলের-পুরোহিতের স্বুবর্ণকেশী কন্যা তাঁর রতিগৃহে এসে রাত্রি-বাস করেছিল। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না, তবু সে বিশ বছরের তরুণী সুন্দরীর সঙ্গে রাত্রি বাস করত।"

"পরিষদে বিজয়লাভ করে যাজ্ঞবল্ক্য যে সমস্ত গাভী পেয়েছিল তা দান করে—বিদেহ রাজার কাছ থেকে পাওয়া সুন্দরী দাসীদের অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছিল, পিসীমা।"

"আমি তো সেই কথাই বলছিলাম যে সে প্রবাহণের পাক্কা চেলা। ওর ব্রহ্মবাদ দেখলি তো? আর তুই দেখছিস্ দূর থেকে। যদি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেতিস্ বেটি, তাহলে ওদের বুঝতে কোন মুস্কিল ছিল না।"

"তবে কি পিসীমা, তুমি সত্যি সত্যিই মনে কর যে, আমি যদি আর কোন প্রশ্ন করতাম তাহলে আমার মাথা পড়ে যেত?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মতেজে নয়। দুনিয়াতে কত মাথাই না নিঃশব্দে দেহচ্যুত হয়েছে।"

"আমার মাথা ঘুরছে।"

"আজ? আমার মাথা ঘুরছে তখন থেকে যখন আমার জ্ঞান হয়েছে। সমস্ত হচ্ছে ছলনা, খালি কথার কারসাজি। প্রজাদের পরিশ্রমার্জিত ফল বিনা পরিশ্রমে চুপচাপ করে ভোগের পথই হল রাজবাদ, ব্রহ্মবাদ ও যজ্ঞবাদের মূল কথা। এই জাল থেকে প্রজাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা নিজেরা সচেতন না হচ্ছে। আর তাদের সচেতন হতে দেওয়া এ স্বার্থবাদীরা মোটেই পছন্দ করে না।"

"মানব হৃদয় কি আমাদের এ প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করতে প্রেরণা দেবে না?"

"দেবে বেটি, দেবে! আর আমি একমাত্র সেই আশাতেই আছি।"

বন্ধুল মল্ল

৪৯০ খৃঃ পূঃ

[আজ থেকে একশ' পুরুষ আগেকার একটি ঐতিহাসিক কাহিনী। এই সময়ে সামাজিক বৈষম্য—খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী-সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই সময়ের মধ্যে জন্মেছে অনেক পথপ্রদর্শক—যারা নরক থেকে মানুষকে উদ্ধার করে, পরলোকের পথ দেখায়, কিন্তু যে নরকের অগ্নিকুণ্ড গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলছিল তার দিকে সবাই চোখ বুজে ছিল।]

১

পূর্ণ বসন্ত কাল। গাছগুলির পাতা ঝরে গিয়ে নব-পল্লবে পল্লবিত হয়েছে। শাল বৃক্ষগুলি তার শ্বেতপুষ্পের সুগন্ধ ছড়িয়ে বনভূমি আমোদিত করছে। সূর্য-কিরণ প্রখর তেজে দীপ্ত হতে এখনও দেরী আছে। শালের গহন বনে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মানুষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। দুজন তরুণ তরুণী পথ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল একটি বড় বল্মীক (উই-ঢিপি)। তরুণীর অরুণ গৌরকান্তি মুখের ওপর কুঞ্চিত পিঙ্গল কেশরাশি ইতস্ততভাবে চারিদিকে বেপরোয়ার মত ছড়িয়ে থাকায় সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তরুণ তার বলিষ্ঠ হাতখানি তরুণীর কাঁধের ওপর রেখে বলল, 'মল্লিকা! এই-বল্মীক দেখে এত তন্ময় হলে কেন?"

"দেখ এটা কত উঁচু, প্রায় দুই মানুষ সমান হবে।"

"হাঁ, ঠিকই এটা সাধারণ উই-ঢিপির চেয়ে বড়, কিন্তু বল্মীকের উচ্চতা এর চেয়ে বেশী দেখা গেছে। তোমার হয়ত মনে হতে পারে বর্ষার বর্ষণ ধারা সুরু হলে এর থেকে কি সত্যি সত্যিই আগুন ও ধোঁয়া বের হবে?"

"না, ওটা বোধহয় কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু এই পিঁপড়ের মত ছোট ছোট এবং তার চেয়েও কোমল বক্রমুখী সাদা পোকাগুলি কেমন করে এত বড় বল্মীক তৈরী করল?"

মানুষের শরীরের উচ্চতার সঙ্গে যদি তার হাতে গড়া বাসস্থান মাপা যায় তাহলে তাও এই রকমই কয়েক গুণ বড় হবে। এ একটা উই পোকার কাজ নয়। শত সহস্র উই পোকা মিলিতভাবে এই কাজ সম্পন্ন করেছে। মানুষও এইভাবেই মিলিত হয়ে নিজের কাজ করে।"

"তাই আমিও ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ করছিলাম যে এদের নিজেদের মধ্যে কতই না মিল। এদের আমরা কত ক্ষুদ্র প্রাণী ভেবে থাকি, এরাও শত সহস্র একসাথে মিলে নিজেদের জন্যে প্রাসাদোপম বাসস্থান নির্মাণ করেছে। আমার দুঃখ হয় যে আমাদের মল্লরা এই উইয়ের কাছ থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করছে না।"

"মানুষ কারুর চাইতে মিলে মিশে থাকতে কম যায় না, বরং মানুষ যে আজ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হতে পেরেছে তারও কারণ হচ্ছে একতা। আর এইজন্যেই মানুষ আজ এত বড় বড় নগর, নিগম (লোকালয়) ও গ্রাম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে ; তাই তাদের জলযান দিগন্তহীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্বীপ-দ্বীপান্তরের ধনরত্ন সংগ্রহ করছে ; আর এই জন্যেই হাতী,-গণ্ডার-সিংহ মানুষের কাছে হার মানতে বাধ্য হচ্ছে।"

"কিন্তু মানুষের ঈর্ষা ! এই ঈর্ষা যদি মানুষের না থাকত, কত ভাল না হত !"

"তুমি মল্লদের ঈর্ষার কথা মনে করে বলছ ?"

"হাঁ, তারা যে তোমায় ঈর্ষা করে। আমি কখনো তোমাকে অন্যের নিন্দা বা অপকার করতে দেখিনি, পরন্তু তোমার মধুর ব্যবহারে দাস ও কর্মকাররা পর্যন্ত কত না খুশী—আর এ কথা সবাই জানে। তবু কত সম্ভ্রান্ত মল্ল তোমার প্রতি প্রতিহিংসা পোষণ করে।"

তার কারণ, তারা আমায় দেখছে সর্বজনপ্রিয় হতে। আর গণে (প্রজাতন্ত্রে) সর্বজন-প্রিয়কেই লোকে বেশী হিংসা করে, সর্বপ্রিয়রাই তো গণ-প্রধান বলে গণ্য হয়।"

"কিন্তু তোমার গুণাবলী দেখে তাদের প্রসন্ন হওয়া উচিত ছিল। মল্লদের মধ্যে কেউ তক্ষশীলায় এত সম্মান পেয়েছে ব'লে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তারা কি জানে না যে আজও কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ পত্রের পর পত্র পাঠাচ্ছেন তোমাকে আহ্বান ক'রে ?"

"আমরা একসঙ্গে দশ বছর তক্ষশীলায় পড়াশুনা করেছি, তিনি তাই আমাকে স্নেহ করেন এবং আমার গুণগ্রাহী।

"কুসীনারার মল্লরা তা জানে না একথা আমি স্বীকার করতে রাজী নই। মহালিচ্ছবি যখন এখানে এসে তোমার সঙ্গে ছিল তখন কুসীনারার অনেক লোকই তোমার গুণাকর্ষতার প্রশংসা তার কাছে শুনেছে।"

"কিন্তু মল্লিকা ! আমার প্রতি তারাই ঈর্ষা করে যারা আমার গুণের কথা জানে। গুণী এবং সর্বপ্রিয় হওয়াটাই হল প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ঈর্ষার বড় কারণ। আমি নিজের জন্যে মোটেই ভাবিনা, কিন্তু আমার দুঃখ এইজন্যে যে এত কষ্ট ক'রে মল্লদের সেবার জন্যে তক্ষশীলাতে শস্ত্র-বিদ্যা শিখেছিলাম, তা কোন কাজে লাগাতে পারলাম না। আজ যেমন বৈশালীর লিচ্ছবীদের কোশল এবং মগধ নিজেদের সমতুল্য মনে করে, তখনো কিন্তু কুসীনারা কোশলরাজকে নিজেদের চেয়ে বড় ব'লে স্বীকার করে। আমি ভেবেছিলাম যে পাবা অনুপিয়া ও কুসীনারাদি ন'টি মল্লকে আমরা স্নেহবন্ধনে বেঁধে লিচ্ছবীদের মত নিজেদের একটি সম্মিলিত সুদৃঢ় মল্ল প্রজাতন্ত্র গঠন করব। ন'টি মল্ল যদি পরস্পর মিলিত হ'ত তা হলে প্রসেনজিৎ আমাদের দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস করত না। তা আর হ'ল না, এটাই আমার দুঃখ।"

বন্ধুলের গৌরকান্তি ম্লান হওয়াতে মল্লিকার মনে দুঃখ হ'ল, তাই সে তার মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করল। বলল,

"প্রিয়তম, তোমার বন্ধুরা শিকারে যাবার জন্যে হয়ত তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে আর আমিও যেতে চাই। ঘোড়ায়, না পায় হেঁটে ?"

"গবয় (নীল গাই) শিকার ঘোড়ায় চ'ড়ে হয় না মল্লিকা, আর হাঁটু পর্যন্ত অন্তরবাসক (ঘাঘরা) প'রে, তিন হাত লম্বা এলোমেলো উত্তরাসংগ (চাদর) উড়িয়ে আর এই রকম উস্কোখুস্কো কাল-নাগিনীর মত চুল দুলিয়ে কেউ কি শিকার করতে যায় ?"

"এসব বুঝি তোমার ভাল লাগে না ?"

"খারাপ !" বলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার লাল টুকটুকে ঠোঁটে চুম্বন করে বন্ধুল বলতে লাগল—"মল্লিকা নামের সঙ্গেও যার মিল আছে তাকেও আমার খারাপ লাগতে পারে না, কিন্তু শিকার করতে গেলে জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়।"

"আচ্ছা, তাহলে তোমার সামনেই বেঁধে ফেলি।" এই বলে মল্লিকা ঘাঘরা জাঙ্গিয়ার মত কসে পরল, আর চুলগুলি সামলে খোঁপা বেঁধে বলল—"আমার চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে দাও, বন্ধুল !"

পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বন্ধুল তার কাঁচুলির ভেতর থেকে উন্নত ক্ষুদ্র-বিল্ব-স্পর্ধী স্তন অর্ধালিঙ্গন ক'রে বলল, "আর এ স্তন ?"

"সব মল্লকুমারীদেরই স্তন হয়।"

"কিন্তু এ কত সুন্দর ?"

"তাতে কি, কেউ কি এ কেড়ে নেবে ?"

"তরুণদের দৃষ্টি পড়বে।"

"এ যে বন্ধুলের তা তারা জানে।"

"না, মল্লিকা! তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি আমার গামছা দিয়ে বেঁধে দি।"

"কাপড়ের বাইরে থেকে দেখে কি তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না ?"—মল্লিকা মুচকি হেসে বন্ধুলের মুখে চুম্বন ক'রে বলল। বন্ধুল তার কাঁচুলিটা সরিয়ে দিয়ে শুভ্র স্ফটিক-শিলার মত বুকের উপর সেই আরক্ত সুডৌল স্তনকে গামছা দিয়ে বেঁধে দিল। মল্লিকা আবার কাঁচুলিটি প'রে বলল,

"এখন তো তোমার বিপদ কেটে গেছে বন্ধুল !"

"বন্ধুলের নিজের জিনিসের জন্যে আর কোন ভয় নেই, প্রিয়ে! এখন ছুটলেও বেশী দুলবে না।"

সমস্ত মল্ল তরুণ-তরুণীরা শিকারী বেশে সজ্জিত হয়ে সেই তরুণ-তরুণী যুগলের প্রতীক্ষা করছিল, তারা আসতেই ধনুক, খড়্গ, ভল্ল বাগিয়ে রওনা হ'ল। নীল গাইএর মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জায়গা তাদের মধ্যে কারো কারো জানা ছিল। তাদের প্রদর্শিত পথ ধরেই মল্লরা চলল। বড় গাছের অল্প পত্রহীন ছায়ার নীচে নীল গাইয়ের একটি দল ব'সে রোমন্থন করছিল। যূথপতি একটি নীল গাই, খাড়া কান আগু পিছু ক'রে পাহারা দিচ্ছিল। মল্লরা দু'দলে ভাগ হ'য়ে গেল—এক দল হাতিয়ার বাগিয়ে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। অন্য দল আবার দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে ঘিরবার জন্য এগুতে লাগল। যে ধার থেকে এই দু'দল মিলবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল সে ধার থেকেই বাতাস আসছিল।

নীল গাইটি তখনও তাব হবিণেব মত ছোট লেজটি নাডছিল, দল তুটি মিলবাব আগেই অন্যান্য গাইগুলিও উঠে দাঁডিযে নাক ফুলিযে কান সামনেব দিক ক'বে চঞ্চল হযে সেদিকে দেখতে লাগল। মুহূর্তেব মধ্যেই বুঝতে পাবল যে তাবা বিপদগ্রস্ত হয়ে পডেছে, তাই বাতাসেব গতিব সঙ্গে তাবাও ছুটতে লাগল। তখনও পযন্ত বিপদ স্বচক্ষে দেখেনি। তাই মাঝে মাঝে দাঁডিয়ে পিছু ফিবে দেখছিল।

লুকিযে থাকা শিকাবীদেব কাছে এসে একবাব তাবা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, এমনি সময ধনুকেব টঙ্কাব শোনা গেল। যূথপতি নীল গাইটিব কলিজা লক্ষ্য ক'বে বন্ধুল নিজেব অব্যর্থ নিশানা কবল। সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা এবং আবও অনেকেই বাণ ছুঁডল। কিন্তু বন্ধুলেব বাণ যদি ব্যর্থ হ'ত তবে শিকাব যে মবত না—সেকথা নিশ্চিত ছিল। নীল গাইটি সেখানে পডে গেল। দলেব অন্যান্য গরুগুলি ছত্রভঙ্গ হযে এদিক সেদিক পালিযে গেল, বন্ধুল কাছে গিযে দেখল নীল গাই শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তু'টি গাই-এব বক্তেব চিহ্ন অনুসবণ ক'বে চলতে চলতে এক ক্রোশ দূবে আব একটি গবয়কে মাটিতে লুটোনো অবস্থায পাওয়া গেল। এই সাফল্যেব জন্য আজকেব বন-ভোজনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বেশী। কিছু লোক নির্ধূম আগুন প্রজ্বলিত কবতে লেগে গেল। মল্ল স্ত্রীলোকবা হাঁডি তৈবী কবল। কিছু পুরুষ গাযেব চামডা খুলে মাংসখণ্ডগুলি কাটতে সুরু কবল। সর্বপ্রথমে আগুনে পোডান কলিজা ও সুবা চযক (মদেব পাত্র) সকলেব সামনে পবিবেশন কবা হ'ল। মাংসটুকবা কাটতে বন্ধুলেব তু'হাত আটকা ছিল, তাই মল্লিকা নিজেব হাতে ওব মুখে মাংস ও মদেব পেযালা তুলে দিল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, তখনও মাংস বান্না শেষ হয়নি। অগ্নি-কুণ্ডেব পোডা কাঠ স্কন্ধাগ্নি (কাঠেব গুডিব আগুন) তখনো নিভে যায়নি, তাব লাল আভা যথেষ্ট ছিল। সেই বক্তাভ সন্ধ্যায মল্লবা নাচতে ও গাইতে সুরু কবল। মল্লিকা, কুশীনাবাব সুন্দবতমা তরুণী, শিকাবীবেশে পূর্ণ সাফল্যেব সঙ্গে স্বীয় নৃত্যকৌশল প্রদর্শন কবল। বন্ধুলেব সঙ্গীরা এই অখিল জম্বু-দ্বীপেব অমূল্য নাবীবত্নেব অধিকাবী হওযাব জন্যে তাব ভাগ্যেব প্রশংসা কবছিল।

২

কুশীনাবাব সংস্থাগার (=প্রজাতন্ত্রভবন= সভাগৃহ) আজ জনাকীর্ণ। গণসংস্থাব (প্রতিনিধি পবিষদেব বা পার্লিযামেণ্টেব) সকল সদস্য সদস্যশালাব (পার্লিযামেণ্টে ভবনের) মধ্যে উপবিষ্ট। অনেক দর্শনেচ্ছু নবনাবী বাইবেব মাঠে দাঁডিয়েছিল। সদস্যশালাব মাথাব দিকের উপরিস্থিত একটি বিশেষ স্থানে সভাপতি বসেছিল। সে সদস্যদের বিশেষভাবে লক্ষ ক'বে দাঁডিয়ে বলল—

"ভন্তেগণ! (পূজ্যগণ!) শোন, আজ যে কাজের জন্যে আমরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছি, তা আমি তোমাদের কাছে বলছি। আয়ুষ্মান্ বন্ধুল তক্ষশীলা থেকে যুদ্ধবিদ্যা অর্জন ক'রে মল্লদের গৌরব-বর্ধন ক'রে ফিরে এসেছে। তার অস্ত্র-নৈপুণ্যের কথা কুসীনারার বাইরের লোকও জানে। চার বছর হ'ল সে এখানে এসেছে। আমি গণসংস্থার ছোট-খাটো কাজগুলি তাকে করতে দিয়েছি এবং সে প্রত্যেকটি কাজই খুব তৎপরতা ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। গণের এখন উচিত তাকে একটা স্থায়ী পদে নিযুক্ত করা—উপসেনাপতির পদের জন্যে আমি প্রস্তাব করছি।

ভন্তেগণ শোন! গণের পক্ষ থেকে আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে উপসেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে। যে আয়ুষ্মান্ এ প্রস্তাবের পক্ষে আছ সে নীরব থাক আর যে বিরুদ্ধে আছ সে বলতে পারো।

ভন্তেগণ! আবার বলছি। আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে গণের পক্ষ থেকে উপসেনাপতির পদ প্রদান করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। যে আয়ুষ্মান্ এতে রাজী আছ সে নীরব থাক আর যার আপত্তি আছে সে বলতে পারো।

ভন্তেগণ! আমি তৃতীয় বার বলছি, আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে গণসংস্থা সহকারী সেনাপতির পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করছে। যে আয়ুষ্মান্ এতে রাজী আছ সে নীরব থাক আর যে রাজী নয় সে তার বক্তব্য বলতে পারো।

এমনি সময় একজন সদস্য—রোজমল্ল—চাদর সরিয়ে দিয়ে ডান কাঁধ খালি ক'রে দাঁড়াল। সভাপতি জিজ্ঞাসা করল, "আয়ুষ্মান্ তুমি কি কিছু বলতে চাও? আচ্ছা, তোমার বক্তব্য বল।"

রোজমল্ল সকলকে সম্বোধন ক'রে বলল,—"ভন্তেগণ আমি আয়ুষ্মান্ বন্ধুলের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করি না। তবে, আমি বিশেষ কোন কারণে তাকে সহকারী সেনাপতি করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চাই। আমাদের গণের নিয়ম আছে যে, যদি কাউকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করতে হয় তবে তার পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি তাই মনে করি যে, আয়ুষ্মান্ বন্ধুলের বেলায়ও সে নিয়ম প্রয়োগ করা হোক।"

রোজমল্ল বসার পরে আরও দু'তিন জন সদস্যও একই কথা বলল। আবার কিছু সদস্য পরীক্ষা গ্রহণের যে কোন প্রয়োজন নেই তার ওপর বিশেষ জোর দিল। অবশেষে গণপতি বলল—

"ভন্তেগণ শোন! আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত করতে গণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাই ছন্দ (ভোট) নেওয়া প্রয়োজন। শলাকা-গ্রহাপক (শলা বিতরণকারী) ছন্দ-শলাকা (ভোট গুণবার কাঠি) নিয়ে তোমাদের কাছে যাচ্ছে। তার এক হাতের ডালিতে লাল কাঠি এবং অন্য হাতের ডালিতে কালো কাঠি। লাল কাঠি হল প্রস্তাবের পক্ষে আর কালো কাঠি হল প্রস্তাবের বিপক্ষে। যে আয়ুষ্মান্ রোজমল্লের পক্ষে আছে অর্থাৎ মূল জ্ঞপ্তির (প্রস্তাব) বিরোধী সে কালো কাঠি, এবং মূল জ্ঞপ্তির যে স্বপক্ষে—লাল কাঠি নেবে।"

শলাকা-গ্রহাপক ছন্দশলাকাগুলি নিয়ে একে একে প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে গেল। সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে একটি ক'রে শলাকা নিল, শলাকা-গ্রহাপক ফিরে এলে পর গণপতি বাকি শলাকাগুলি গণনা করল। লাল শলাকা বেশী আর কালো কম। তার অর্থ হল সদস্যগণ কালো শলাকাই বেশী নিয়েছে।

গণপতি ঘোষণা করল:

"ভন্তেগণ শোন! কালো শলাকা অধিক সংখ্যক সদস্য নিয়েছে। তাই আমি ঘোষণা করছি যে গণ আয়ুষ্মান রোজমল্লের সঙ্গে একমত। এখন তোমরা ঠিক কর আয়ুষ্মান্ বন্ধুলের কি ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

ছন্দ-শলাকা ওঠাবার পরে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক বিতর্ক চলল, শেষে ঠিক হল যে বন্ধুল মল্লকে কাঠের সাতটা খোঁটা এক সঙ্গে তরবারি দিয়ে কাটতে হবে। পরীক্ষার জন্যে সপ্তম দিনটি নির্দিষ্ট ক'রে সভার কাজ শেষ হল।

সপ্তম দিনে কুশীনারার মাঠে স্ত্রী-পুরুষের খুব ভীড় হল। মল্লিকাও সেখানে উপস্থিত। কাছাকাছি সাতটি শক্ত কাঠের খোঁটা পাশাপাশি পুঁতে দেওয়া হল। গণপতি আদেশ করার পর বন্ধুল তরবারি হাতে নিল। সমস্ত জনমণ্ডলী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে লাগল। বন্ধুল মল্লের সুদৃঢ় হাতে সেই ঋজু দীর্ঘ খড়্গ দেখে লোক তার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল বন্ধুলের তরবারি লোকে উঠতে পড়তে দেখল—প্রথম খোঁটা কাটল তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়—এইভাবে ষষ্ঠ খোঁটা কাটবার সময় বন্ধুলের কানে ঝন করে একটা শব্দ ভেসে এল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল এবং উৎসাহ কমে গেল। বন্ধুলের তরবারি সপ্তম খোঁটাটা তখনো কাটে সম্পূর্ণ হয়নি, শেষ পৌঁছবার আগেই থেমে রইল। বন্ধুল তাড়াতাড়ি একবার সবগুলি খোঁটার মাথা দেখে নিল। তার শরীর কাঁপছিল মুখ রাগে লাল হয়ে গেল, কিন্তু সে একদম চুপ করে রইল।

গণপতি ঘোষণা করল যে সপ্তম খোঁটার মাথা খণ্ডিত হয়নি। তবু কিন্তু লোকের সহানুভূতি বন্ধুল মল্লের প্রতি ছিল।

ঘরে ফিরে মল্লিকা বন্ধুলের রক্তিম এবং গম্ভীর চেহারা লক্ষ করে নিজের উদাসভাব ভুলে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল।

বন্ধুল বলল:

'মল্লিকা! আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এরকম যে করা হবে তা আমি আশা করিনি।'

"কি হয়েছে প্রিয়?"

"প্রত্যেকটা খোঁটার মধ্যে লোহার শলাকা ছিল। পঞ্চম খোঁটাটা পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি। ষষ্ঠ খোঁটা কাটার পর আমি ঝন্ ক'রে-ওঠা পরিষ্কার একটা শব্দ শুনতে পাই। আমি বোঁকারাজী বুঝতে পারলাম। যদি শব্দটা শুনতে না পেতাম

তাহলে সপ্তম খোঁটাও নিশ্চয় কাটতে পারতাম। কিন্তু শব্দ শোনার পর আমার মন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ল।"

"এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা! যারা এ রকম করেছে তারা খুবই নীচতার পরিচয় দিয়েছে।"

"কে এ রকম করেছে তা আমি জানতে পারিনি। রোজমল্লের ওপর আমার কোন রাগ নেই। কেননা সে উচিত কথাই বলেছিল আর তার মতের সঙ্গে গণের বেশীর ভাগ সদস্য একমত ছিল। কিন্তু আমার দুঃখ ও রাগ হচ্ছে এই জন্যে যে কুসীনারায় আমাকে স্নেহ করার লোকের এত অভাব।"

"তাহলে বন্ধুল মল্ল তুমি কুসীনারার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ?"

"কুসীনারা আমার মাতৃতুল্য, এ যে আমাকে লালনপালন ক'রে বড করেছে। কিন্তু এখন আমি আর কুসীনারায় থাকব না।"

"কুসীনারা ছেড়ে চলে যেতে চাও?"

"হাঁ! কারণ, কুসীনারায় এখন বন্ধুল মল্লের কোনো প্রয়োজন নেই।"

"তাহলে কোথায় যাবে?"

"মল্লিকা, তুমি আমার সঙ্গী হবে?"—উদ্বিগ্ন মুখে হাসিব বেশ টেনে বন্ধুল জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তোমার ছায়ার মত, বন্ধুল!" মল্লিকা বন্ধুলেব লাল চোখ দুটিতে চুম্বন কবল, আর মুহূর্তের মধ্যে তার রুক্ষতা বিলীন হ'য়ে গেল।

"মল্লিকা! তোমার হাত আমাকে দাও।" মল্লিকাব হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বন্ধুল বলল—

"তোমার এ হাত আমার শক্তির উৎস, এ হাত পেলে বন্ধুল যে কোনো জায়গায় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

"প্রিয়তম! তবে কোথায় যাবে ঠিক্ করলে এবং কবেই বা যাবে?"

"মুহূর্তকালও আর দেরী করতে চাই না, কেননা খোঁটার মধ্যে লোহার খবব গণপতি পাবেই এবং তারপর আবার সে আমার পরীক্ষার দিন ঠিক্ করবে। কাজেই লোকের উৎসাহ প্রকাশ পাবার আগেই আমাদের যাত্রা করা চাই।"

"অন্যায়ের বিচার হ'তে কেন দিচ্ছ না?"

"কুসীনারা আমার সম্বন্ধে তার স্বীয় মত প্রকাশ করেছে, মল্লিকা! এখানে কোনো প্রয়োজন নেই—অন্তত এ সময়। কুসীনারায় যখন বন্ধুলের প্রয়োজন হবে, তখন সে এখানে এসে হাজির হবে।"

সঙ্গে নিয়ে চলার উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বন্ধুল এবং মল্লিকা সেই রাতেই কুসীনারা ছেড়ে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন অচিরবতীর (রাপ্তী নদীর) তীরে অবস্থিত ব্রাহ্মণদের মল্লগ্রামে (মলাও, গোরখপুর) পৌছুল। মল্লদের জনপদে মল্ল-

গ্রামের সাংকৃত্য নিজের যুদ্ধ ও বীরত্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল, সেখানে বন্ধুলের একজন বন্ধুও ছিল, কিন্তু বন্ধুল তার সঙ্গে দেখা করল না। সে গ্রামে গিয়েছিল এই ভেবে যে সেখান থেকে নৌকোযোগে শ্রাবস্তী (সহেট-মহেট, গোণ্ডা জিলা) চলে যাবে। মল্লগ্রামে শ্রেষ্ঠী সুদত্তের লোক বাস করত ; তাই তার সাহায্যে নৌকা যোগাড় করা সহজ ছিল। ব্রাহ্মণ সাংকৃত্য স্বীয় কুলাচার অনুসারে নিজের ঘরে একটি পুষ্ট শূকর কাটল আর স্বহস্তে রান্না ক'রে বন্ধুল মল্ল ও মল্লিকাকে সেই মাংসে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াল !

৩

শ্রাবস্তীর রাজধানীতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নিজ সহপাঠী বন্ধুল মল্লকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাল। তক্ষশীলায় বসেই প্রসেনজিৎ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, "আমি রাজা হলে, বন্ধুল তোমাকে আমার সেনাপতি হতে হবে।" রাজা হওয়ার পর সে অনেকবার এর জন্যে বন্ধুলকে লিখে জানিয়েছিল, কিন্তু বন্ধুল কোশল-কাশীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী এবং বিশাল রাজ্যের সেনাপতি হওযার চাইতেও স্বীয় জন্মভূমি কুসীনারার গণের একজন সাধারণ উপসেনাপতির মর্যাদাকেই ওপরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু এখন কুসীনারাই তাকে বিতাড়িত করল, তাই প্রসেনজিতের প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষভাবে গ্রহণ করতে সে রাজী হ'ল। বলল—

"আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী বন্ধু ! কিন্তু কয়েকটি শর্ত থাকবে।"

"সানন্দে তা বলতে পার বন্ধু।"

"আমি মল্লপুত্র বোধ হয় তা তুমি জান।"

"হাঁ, তা আমি জানি, এবং আমি তোমাকে কখনও মল্লদের বিরুদ্ধে যেতে বলব না।"

"আচ্ছা, আর আমার কোনো শর্ত নেই।"

"মল্লদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক আছে আমি তা সর্বদাই বজায় রাখতে চাই, বন্ধু। তুমি জান যে আমার কোনো রাজ্য-বিস্তারের বাসনা নেই। তবে যদি কোনো কারণে মল্লদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, তাহলে তুমি স্বাধীনভাবে যে কোনো পক্ষ গ্রহণ করতে পারবে। প্রিয় বন্ধু ! আমি তোমার জন্যে আর কি করতে পারি ?"

"না, মহারাজ ! এই যথেষ্ট।"

৪

বন্ধুল মল্ল কোশল-সেনাপতি নিযুক্ত হ'ল। প্রসেনজিৎ যে রকম নম্র ও উদ্যমহীন রাজা ছিল তাতে তার এ রকম একজন সেনাপতিরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিকই

যদি বন্ধুল মল্লকে না পেতো তাহলে হয়ত 'মগধ' এবং 'বৎস' তার রাজ্যের বেশ কিছুটা অংশ অধিকার করে নিত।

শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছুবার কিছুকাল পরে মল্লিকার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। বন্ধুল মল্ল একদিন জিজ্ঞাসা করলঃ

"প্রিয়ে! তোমার কোনো জিনিসের দোহদ্ (সাধ্) হ'লে বল।"

"হাঁ, দোহদ্ হয়, প্রিয়তম! কিন্তু তা বড় দুষ্কর।"

"বন্ধুল মল্লের পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয়, মল্লিকা! বল তোমার কিসের দোহদ্।"

"অভিষেক পুষ্করিণীতে স্নান করতে ইচ্ছা হয়।"

"মল্লদের?"

"না, বৈশালীর লিচ্ছবিদের।"

"তুমি ঠিকই বলেছ মল্লিকা! তোমার দোহদ্ খুবই দুষ্কর। কিন্তু যত দুষ্করই হোক বন্ধুল মল্ল তা পূর্ণ করবেই। কাল সকালে প্রস্তুত থেকো, আমরা দু'জনেই রথে যাব।"

পরের দিন পাথেয় নিয়ে খড়্গ, ধনুক ইত্যাদিতে সজ্জিত হ'য়ে দু'জনেই রথে যাত্রা করল।

কয়েক সপ্তাহ ধ'রে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একদিন বন্ধুলের রথ বৈশালীর সেই দ্বারে গিয়ে প্রবেশ করল, যেখানে এক দল লিচ্ছবির ঈর্ষার জন্যে তার সহপাঠী মহালি অন্ধ হয়েছিল। মহালি ছিল এখানকার একজন অধ্যক্ষ। বন্ধুল একবার ভাবল যে মহালির সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে, কিন্তু তাতে মল্লিকার দোহদে বিঘ্ন ঘটতে পারে ভেবে সে তার সে ইচ্ছা দমন করল।

অভিষেক পুষ্করিণীর ঘাটে কড়া পাহারা। সেখানে কেবলমাত্র লিচ্ছবি-পুত্রদের জীবনে মাত্র একবারই স্নান করবার (অভিষেক পাবার) সৌভাগ্য ঘটত—তাও আবার যখন তাকে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের ৯৯৯ জন সদস্যের কোনো একটি শূন্য স্থানে নির্বাচিত করা হ'ত তখনই মাত্র। প্রহরিগণ বাধা দিলে বন্ধুল তাদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিল এবং মল্লিকাকে স্নান করিয়ে রথে তুলে খুব তাড়াতাড়ি বৈশালী থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রহরীদের খবর পেয়ে পাঁচ শ' লিচ্ছবি রথী বন্ধুলের পিছু ধাওয়া করল। মহালি তা শুনে তাদের নিষেধ করল, কিন্তু গর্বিত লিচ্ছবিরা কারু নিষেধ শোনবার পাত্র ছিল না।

দূরে রথের চাকার শব্দ শুনে মল্লিকা পিছন ফিরে দেখে বলল—"প্রিয়তম! অনেকগুলি রথ আসছে।"

"প্রিয়ে! তাহলে রথগুলি যখন একটি রেখার মত সোজা হয়ে চলবে তখন আমাকে ব'লো।"

মল্লিকা ঠিক্ সময় মতই বলল। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা একথা বলেন যে, বন্ধুল তখন সজোরে একটি তীর নিক্ষেপ করেছিল আর সে তীর নাকি পাঁচ শ' লিচ্ছবির কোমর-

বন্ধ ভেদ ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল। লিচ্ছবিগণ বন্ধুলের কাছে উপস্থিত হ'য়ে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাল।

বন্ধুল তখন বিনীতভাবে তাদের বলল: "আমি তোমাদের মত মৃত লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করি না।"

"আচ্ছা, অন্তত একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ যে আমরা কি রকম মৃত লোক।"

"আমি দু'বার কখনও তীর ব্যয় করি না! যাও, ঘরে ফিরে গিয়ে প্রথমেই প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর এবং তার পরে কোমর-বন্ধ খুলো"—এই বলে বন্ধুল মল্লিকার হাত থেকে রাশ নিল এবং তীব্র বেগে রথ চালিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। কোমর-বন্ধ খোলার পর সত্যি সত্যিই পাঁচ শ' লিচ্ছবি মারা গেল।

৫

শ্রাবস্তী জম্বু-দ্বীপের মধ্যে তখন সব চাইতে বড় নগর ছিল। প্রসেনজিতের রাজ্যে শ্রাবস্তী ছাড়াও সাকেত (অযোধ্যা) এবং বারাণসী (কাশী) নামে দুটি মহানগর ছিল! শ্রাবস্তীর সুদত্ত (অনাথ-পিণ্ডদ), মৃগার এবং সাকেতের অর্জুনের মতন আরও অনেক কোটিপতি ব্যবসায়ী কাশী কোশলের সম্মিলিত রাজ্যে বাস করত। তারা সার্থের (ব্যবসায়ের) জন্যে শুধুমাত্র জম্বু-দ্বীপেই নয়, তাম্রলিপ্ত হতে আরম্ভ করে পূর্ব সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) এবং ভরুকচ্ছ (বরোচ) ও সুপ্পারক (সোপারা) হ'য়ে পশ্চিম সমুদ্র (আরব সাগর) দিয়ে সুদূর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত যেত। ব্রাহ্মণ সামন্তরা (মহাশালেরা) ক্ষত্রিয় সামন্তদের সমতুল্য ছিল না বটে, কিন্তু তবুও সমাজের মধ্যে তারা উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে ছিল। ঐশ্বর্যে সামন্তরা তাদের কাছে খুবই নগণ্য ছিল। সুদত্ত জেত রাজকুমারের উদ্যান 'জেতবন' অজস্র কার্ষাপণ (মুদ্রা) বিছিয়ে ক্রয় করেছিল এবং গৌতম বুদ্ধের জন্যে সেখানে জেতবন বিহার তৈরী করেছিল। মৃগারের পুত্র পুন্নবর্দ্ধনের বিবাহে প্রসেনজিত নিজে সদলবলে সাকেতে গিয়েছিল। কন্যার পিতা অর্জুন শ্রেষ্ঠীর অতিথি হয়েছিল। অর্জুনের কন্যা তথা মৃগারের পুত্রবধূ বিশাখা নিজের হারের মূল্য দিয়ে সহস্র প্রকোষ্ঠের একটি সাত তলা বিশাল বিহার নির্মাণ করে এবং তার নাম রেখেছিল 'পূর্বরাম মৃগার মাতা প্রাসাদ'। দেশ-দেশান্তরের ধন-রত্ন জড় হয়ে এই শ্রেষ্ঠীর কাছে চলে আসত। তার অপার সম্পত্তির কথা কি আর বলা যায়?

জৈবলী, উদ্দালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিগণ যজ্ঞবাদকে গৌণ, দ্বিতীয় স্থান দিয়েও বাস্তবিক নিস্তারের জন্যে ব্রহ্মবাদের সুদৃঢ় নৌকো নির্মাণ করেছিল। জনকের মত নৃপতিগণও বড় রকমের পুরস্কার দিয়ে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় শাস্ত্রার্থ-পরিষদ্ আহ্বান করতে লাগল, আর এগুলির মধ্য থেকেই বেদের বাইরে কল্পনা করবার পথ প্রশস্ত হ'ল। তখন দেশের মধ্যে স্বতন্ত্র

চিন্তাধারার জোয়ার এসেছিল। আর বিচারক (তীর্থঙ্কর) বিচার (মতবাদ) সাধারণ সভায় লোকের নিকট উপস্থিত করত। কোথাও তার স্বরূপ মামুলি উপদেশ (অববাদ, সুক্ত) এর রূপে হ'ত, কোথাও, কোন বাদের আহ্বান- ঘোষণা রূপে জম্বুর (জাম্) শাখা পুঁতে বেড়াত।

প্রবাহণ ছাপ্পান্ন পুরুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অনেকগুলি উপায় উদ্ভাবন করেছিল—যেমন প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস), ধ্যান, তপ ইত্যাদি। তখন উপনিষদের শিক্ষায় বাইরের আচার্যও নিজ স্বতন্ত্র বিচারেব সঙ্গে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) ও ব্রহ্মচর্যের ওপর বিশেষ জোর দিত। অজিত কেশকম্বল একেবারেই জড়বাদী ছিল। সে ভৌতিক (জড়) পদার্থ ছাড়া আত্মা, ঈশ্বরভক্তি, নিত্য-তত্ত্ব অথবা স্বর্গ-নরক পুনর্জন্মবাদ মানত না, তবুও সে নিজে গৃহ-ত্যাগী ব্রহ্মচারী ছিল। তখনকার সামন্ত শাসনকর্তার সহানুভূতিব পাত্র তো সে ছিলই না, বরং তার রোষানলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও নিজের জড-বাদকে ধর্মের রূপ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিল। ব্রাহ্মণ-সামন্ত লৌহিত্য ও পায়সীব মত রাজন্য সামন্তগণ জডবাদী ছিল। আর তাদের মতবাদের জন্যে তারা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, জডবাদকে পরিত্যাগ করা তারা লোকলজ্জা ব'লে মনে করত। তবুও তাদেব জড়বাদ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল না।

জডবাদের প্রচার থাকা সত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সামন্তগণেব ও ধনুকেব ব্যবসায়ীদেব সব চাইতে বেশী আস্থা ছিল গৌতমবুদ্ধের অনাত্মবাদের ওপর—বিশেষত কোশলেব। এব বিশেষ একটি কারণ হ'ল যে গৌতম নিজে কোশলের অন্তর্গত শাক্য-গণের (শাক্য-প্রজাতন্ত্র) অধিবাসী ছিল। সে জড়বাদীদের মত বলত—আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি নিত্যবস্তু পৃথিবীতে নেই, সব বস্তুই উৎপন্ন হয় এবং অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। সংসার কতক-গুলি বস্তুর সমূহ নয়, বরং ঘটনাবলীর স্রোত। তার প্রচারিত মতবাদ জ্ঞানীরা খুবই যুক্তিসংগত ও হৃদয়গ্রাহী ব'লে মনে করত। কিন্তু ওই অনাদিবাদে লোক-মর্যাদা ধনী-গরীব, দাস-স্বামীর প্রভেদ নষ্ট হয়, তাই অজিতের জড়বাদ সামন্ত ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রিয় হ'তে পারল না। গৌতমবুদ্ধ নিজের অনাত্মবাদ ও জডবাদের মধ্যে আরও কিছু যোগ ক'রে তার তিক্ততা কিছুটা দূর করল। তার মতে আত্মা নিত্য না হলেও চেতনা-প্রবাহ স্বর্গ কিংবা নরকের মানুষের মধ্যে এক দেহ হতে আর এক দেহে—এক শরীর-প্রবাহ হ'তে আর এক শরীর প্রবাহে সঞ্চারিত হয়। এ বিচার অনুযায়ী প্রবাহণ রাজার আবিষ্কৃত হাতিয়ার ছিল, আর তার জন্যেই পুনর্জন্মবাদের পুরোপুরি স্থিতির জায়গা হ'ল। যদি গৌতমবুদ্ধ নিছক জডবাদেরই প্রচার করত তাহলে নিশ্চয়ই শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, রাজগৃহ ভদ্রিকার শ্রেষ্ঠীরা (ধনিকরা) অজস্র টাকা ব্যয় করত না এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সামন্তরা ও রাজারা তার পায়ের ধূলি নেবার জন্যে ভিড় করত না।

শ্রাবস্তীর উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের গৌতমবুদ্ধের মতবাদে অগাধ বিশ্বাস ছিল। প্রসেনজিতের পাটরাণী মল্লিকা দেবী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। তার নগরস্থিত শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ তার সখী বিশাখা শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ পূর্বারামের মত একটি মহা-বিহার

নির্মাণ ক'রে বুদ্ধদেবকে দান করেছিল। সেনাপতি বন্ধুল মল্লের স্ত্রী মল্লিকা পাটরাণী মল্লিকার অত্যন্ত প্রিয় সখী ছিল, তার অনুপ্রেরণায় সেও বুদ্ধের উপদেশাবলী শুনে যেতে লাগল এবং কিছুদিন পরে বুদ্ধদেবের উপাসিকা হয়ে পড়ল।

মল্লিকার ঘর খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। আর কোশলের মত রাজ্যের সেনাপতির ঘর সমৃদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। মল্লিকার দশজন বীর পুত্র ছিল। তারা প্রত্যেকেই রাজ-সেনার উচ্চ পদে অধিষ্ঠ ছিল। বন্ধুলমল্ল এক যুগ পর্যন্ত রাজার ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর মধ্যে অনেকেই তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য জনপদের কোনো লোককে এত উচ্চ পদে কাজ করতে দেখা তারা পছন্দ করত না। ঈর্ষাপরায়ণ লোকরা রাজার কাছে তার নামে অপবাদ রটাতে সুরু করল। রাজাও কিছুটা বোকা-বুদ্ধির লোক ছিল। তাই তারা রাজার কাছে গিয়ে এই ব'লে উস্কাল যে বন্ধুলমল্ল রাজাকে নির্বুদ্ধি ব'লে প্রচার করছে। শেষটায় রাজার কাছে এ কথাও বলল যে, সেনাপতি রাজ্য কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে। প্রসেনজিতেরও তা ঠিক ব'লে মনে হ'ল। তখন রাজা ও বন্ধুল তাদের নিজ নিজ শত্রুদের হাতে খেলতে লাগল। বন্ধুল মল্লকে চিন্তিত দেখে একদিন মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল।

"প্রিয়তম! তুমি এত কি ভাবছ?"

"রাজা আমার ওপর সন্দেহ করতে সুরু করছে।"

"তাহলে সেনাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে চল না কুশীনারা চলে যাই। সেখানে আমাদের জীবিকার্জনের জন্যে আমার কর্মাঠ (ক্ষেত্র) আছে।"

"এর অর্থ হ'ল রাজাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া। দেখছ না মল্লিকা! মগধরাজ অজাতশত্রু কতবার কাশী আক্রমণ করল। আমরা একবার তাকে বন্দী করেছিলাম। মহারাজ তার প্রতি উদারতা দেখিয়ে রাজকন্যা বজ্রার বিয়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু অজাতশত্রু সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হ'তে চায়, মল্লিকা! সে এ বিয়েতে চুপ হওয়ার পাত্র নয়। তার গুপ্তচরে রাজধানী ছেয়ে গেছে। আমাদের অন্য পড়সী অবন্তিরাজার জামাতা বৎসরাজ উদয়নের উদ্দেশ্যও ভাল নয়, সেও সীমান্তে প্রস্তুত হচ্ছে। এমনি সময়ে শ্রাবস্তী ছেড়ে স'রে যাওয়াটা খুবই কাপুরুষের কাজ হবে, মল্লিকা!"

"আর এটা মিত্রদ্রোহের কাজও।"

"মল্লিকা! আমি নিজের কথা চিন্তা করি না। যুদ্ধে অনেকবার আমি মৃত্যুর কবলিত হয়েও বেঁচে গিয়েছি। তাই কখনও যদি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে তাহলেও সেটা আমার কাছে বড় কথা হবে না।"

পাটরাণী মল্লিকা ছিল মালীর কন্যা। সে সাধারণ একজন কর্মকারের মেয়ে হয়েও নিজের গুণের জন্য প্রসেনজিতের পাটরাণী হয়েছিল। আজ আর সে নেই। যদি থাকতো তাহলে লোকের কথায় রাজার কান এতোটা খারাপ হওয়া কখনই সম্ভব হত না। একদিন রাজা সীমান্তের বিদ্রোহের নাম ক'রে বন্ধুলমল্লের পুত্রদের এক জায়গায় পাঠিয়ে দিল। তারা বিজয় লাভ ক'রে যখন ফিরছিল সেই সময় বিশ্বাসঘাতকতা

ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে বন্ধুলমল্লকে পাঠাল। এই প্রকারে পিতা আর তার দশ পুত্রই এক জায়গায় প্রাণ দিল। যখন এ ঘটনার সংবাদ মল্লিকার কাছে এসে পৌঁছল তখন সে বুদ্ধ ও তার ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করাতে যাচ্ছিল। তার দশ তরুণী পুত্রবধূ খুব ভক্তি সহকারে নানা রকম খাবার তৈরী করছিল। মল্লিকা সেই চিঠিখানা পড়ায় তার হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল। কিন্তু তখন সে নিজকে এতদূর সংযত করল যে তার চোখ দিয়ে এতটুকু অশ্রুকণা গলিত হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি তার মুখ পর্যন্ত ম্লান হল না। সে চিঠিটা নিজের আঁচলে বেঁধে সমস্ত সংঘকে ভোজন করাল। ভোজনের পরে বুদ্ধের উপদেশাবলী শ্রদ্ধার সহিত শুনল। তারপর চিঠিটা প'ড়ে শোনাল। বন্ধুলের পরিবারে যেন বজ্রপাত হ'ল। মল্লিকার খুবই ধৈর্য ছিল, কিন্তু সেই তরুণী বিধবাদের ধৈর্য ধারণ করান বুদ্ধের পক্ষেও সহজ কাজ ছিল না।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রসেনজিত সত্যি ঘটনা জানতে পেরে খুবই শোকার্ত হলেন কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না। প্রসেনজিতের মনের সান্ত্বনার জন্য বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘকায়াযণকে নিজের সেনাপতি নিযুক্ত করল।

৬

শীতকাল। কপিলাবস্তুর আশেপাশের ক্ষেতে গম, ভুট্টা ও হলুদ রংএর সরষে ফলেছে। আজ নগর খুবই সাজানো হয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় তোরণ তৈরী করা হয়েছে, বিশেষ ক'রে সংস্থাগারটিকে বেশী সাজানো হয়েছে। তিন দিন কঠোর পরিশ্রমের পরে আজ একটুখানি অবসর পেয়ে কয়েকজন দাস কোন একটি ঘরের কোণে ব'সে ছিল। কাক বল্‌ল :—

"আমাদের দাসের জীবন কি কোন জীবন? আমরা মানুষ না হ'য়ে যদি গরু হ'য়ে জন্মাতাম তাহলেও ভাল ছিল। তখন তো আর আমাদের মানুষের মতো জ্ঞান হ'ত না।"

"ঠিকই বলেছ কাক! কাল আমার প্রভু দণ্ডপাণি লোহা লাল ক'রে আমার স্ত্রীকে দগ্ধ করেছে।"

"কেন দগ্ধ করল?"

"কেন করল, সে কথা তার কাছে কে জিজ্ঞাসা করে? তারা তো দাসদের পতি-পত্নী সম্বন্ধও মানতে রাজি নয়। এ সত্ত্বেও এই দণ্ডপাণি নিজকে নিগংঠ-শ্রাবক (জৈন) বলে। সে এমনি নিগংঠ যে মাটির কীট সরাবার জন্য নিজের কাছে ময়ূরের পাখনা রাখত। দোষের মধ্যে হ'ল যে, আমার মেয়ে কিছুদিন ধ'রে কঠিন অসুখে ভুগে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লে আমার স্ত্রী সেই সংবাদ আমাকে দিতে এসেছিল। হতভাগী মেয়ে শেষ পর্যন্ত বাঁচল না। তা ম'রে গিয়ে ভালই হ'য়েছে। সংসারে আমাদের

মতোই তো ওকেও বাঁচতে হ'ত। সত্যিই কাক! আমাদের দাসদের কোনো জীবনই নয়! শুধু এই নয়, আমার মনিব বলেছিলেন যে এ ধুমধাম শেষ হলেই আমার স্ত্রীকে বেচে দেবে।"

"তবে ওই কষাই দণ্ডপাণি লোহা দিয়ে দাগিযেও কি তৃপ্তি পেল না?"

"না, ভাই। বারবছর পরে সে মেয়েটিকে পঞ্চাশ নিষ্কে (স্বর্ণমুদ্রা) বেচে দেওয়ার কথা বলেছিল। বিশ্বাস কর, আমরা জেনে শুনেই তার পঞ্চাশ নিষ্ক নষ্ট ক'রে দিয়েছি।"

"আর একথাও স্বীকার করতে হ'বে যে আমাদের দাসদেব বাপ মায়ের হৃদয়ও নেই।" তাদের কথার মাঝে একটি বৃদ্ধ দাস বল্ল—"আর এও একজন দাসীরই পুত্র, যার স্বাগতের জন্যে এতসব তোড়জোড করা হচ্ছে।"

"কে দাদা?"

"এ-ই কোশল রাজকুমার বিদূডভ।"

"দাসীর পুত্র?"

"হ্যাঁ, মহানাম শাক্যের সেই বুড়ী দাসীকে জান না? আমাদের মতো কেলো নয়—নিশ্চয়ই কোনো শাক্যের ঔরস-জাত হবে।"

"তা দাসীর কি তার অভাব, দাদা।"

"হ্যাঁ, তাই এই দাসীর পেটে মহানামের একটি মেয়ের জন্ম হয়। তার রঙ ছিল খুবই ফর্সা আর দেখতেও অতিশয় সুন্দরী; তাকে যেন শাক্যকন্যা বলেই মনে হোত।"

"মনে না হবার কারণ কি? সুন্দরী মেয়ে যদি হয়—তা সে দাসীকন্যা হোক না কেন—মালিক তাদেব খুবই যত্নে লালনপালন ক'রে থাকে।"

"কোশলবাজ প্রসেনজিত কোন এক শাক্য কুমারীকে বিয়ে করতে চাইল; কিন্তু শাক্যরা নিজেদের ত্রিভুবনে কুলীনশ্রেষ্ঠ মনে করে গর্ব বোধ করে থাকে, তাই কাক, তারা কেউই মনে মনে নিজ কন্যাকে রাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইল না। কিন্তু পরিষ্কার কবে একথা বলার জো নেই, পাছে অস্বীকার করলে কোশলরাজ রাগ করে, এ ভয়ও আছে। শেষ পর্যন্ত মহানাম তার দাসীকন্যাকে শাক্যকুমারী বলে পরিচয় দিয়ে প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। এই বর্ধ ক্ষত্রিয়ার পুত্র হোল বিতূডভ রাজকুমার।"

"কিন্তু এখন তো এও শাক্যদের মতই আমাদের রক্তপিপাসু হবে।"

বাজনা বাজতে লাগল, শাক্যরা কোশল-রাজকুমারকে মহা ধুমধামের সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা করল—যদিও মনে মনে দাসীপুত্র বলে সকলে ঘৃণা করত।

বিতূডভ নিজ মাতুলকুলের স্বাগত গ্রহণ করে মাতামহ মহানামের আশীর্বাদ পেয়ে খুব খুসী হয়ে কপিলাবস্তু থেকে বিদায় নিল। দাসীপুত্রের পদার্পণে সংস্থাগার (সভাগৃহ) অপবিত্র হয়েছিল; তাই তার শুদ্ধির প্রয়োজন ছিল। দাসদাসীরা আসনগুলি ধুয়ে শুদ্ধি করতে লেগেছিল; একজন গোঁফওয়ালা দাস দাসীপুত্র বিতূডভের উদ্দেশ্যে হাজার গালি

পাড়ছিল। বিঢুডভের একজন সৈনিক নিজের ভল্ল সংস্থাগারে ভুলে ফেলে গিয়েছিল, তাই নিতে এসে এই কটূক্তি ও অপবাদ শুনতে পেল। ধীরে ধীরে সব কথাই বিঢুডভ শুনল। সে কপিলাবস্তু শাক্যহীন করবার প্রতিজ্ঞা করল, আর তা পরবর্ত্তীকালে করেও ছিল তার ক্রোধের অনুলক্ষ্য ছিল প্রসেনজিত, যে তাকে দাসীর গর্ভে জন্ম দিয়েছিল।

দীর্ঘ কায়ায়ণ নিজের মামা ও মামাতো ভাইদের মৃত্যুকে ভুলতে পারল না। অন্যদিকে প্রসেনজিত তার সমস্ত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য অধিক মাত্রায় বিশ্বাস ও মধুরতা দেখাতে চাচ্ছিল। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তার বুদ্ধদেবকে স্মরণ হোল। কয়েক যোজন দূরে শাক্যদের কোন গ্রামে বুদ্ধদেব অবস্থান করছেন শুনে কায়ায়ণও কিছু সৈন্য নিয়ে সেখানে রওনা হোল। বুদ্ধদেবের বাসগৃহে যাবার সময় তার মুকুট, খড়্গ ও অন্যান্য রাজ চিহ্নগুলি কায়ায়ণের হাতে দিয়েছিল। বিঢুডভের সঙ্গে কায়ায়ণের যোগ ছিল। রাণীকে সেখানে ত্যাগ করে রাজ্যমধ্যে গিয়ে বিঢুডভকে রাজা বলে ঘোষণা করল ; নিজে রওনা হোল শ্রাবস্তির পথে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত উপদেশ শুনে প্রসেনজিত বাইরে এলে রাণী তাকে সব কথা বলল। সেখান থেকে প্রসেনজিত রাজগৃহের (রাজগীব) গিয়ে নিজের ভ্রাতুস্পুত্র মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছ থেকে পরামর্শ ও সাহায্য নেওয়া ঠিক করল। বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ পথশ্রমে পথিমধ্যেই শরীর অচল হয়ে পড়ল, সন্ধ্যায় গোধুলি লগ্নে যখন রাজগৃহে পৌছল তখন নগরদ্বার বন্ধ হয়েছে। সেই রাত্রে দ্বারপ্রান্তে একটি কুটিরে প্রসেনজিতের মৃত্যু হোল। সকালে রাণীর ·বিলাপ শুনে অজাতশত্রু ও বজ্রা ছুটে এল, তখন জাঁক-জমকের সঙ্গে শবদাহ করা ছাড়া আর কি-ই বা করবার ছিল।

বন্ধুলকে হত্যার এই হোল প্রতিশোধ, দাসপ্রথার এই হোল পরিণাম।

নাগদত্ত

কাল ঃ ৩৩৫ খৃষ্টপূর্ব

১

"বিষ্ণুগুপ্ত! উচিত কাজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমরা মানুষ তাই আমাদের কিছু কর্তব্য আছে। আর সেই জন্যে আমাদের উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে খেয়াল রাখা দরকার।"

"কর্তব্য কি ধর্ম নয়?"

"আমি ধর্মকে ছলনা বলে মনে করি। ধর্ম কেবলমাত্র পরস্বাপহারীদের শান্তিতে পরের ধনকে উপভোগের সুযোগ দেয়। ধর্ম কি কখনও গরীব এবং দুর্বলের কোন খবর রাখে? পৃথিবীতে এমন কোন জাত নেই যারা ধর্ম মানে না। দাসেরাও যে মানুষ—ধর্ম কি তা কখনো স্বীকার করে? দাসেদের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু স্ত্রী-জাতির প্রতি—তা সে অ-দাস হোক না কেন ধর্ম কি কখনো ন্যায় করেছে? টাকা হ'লেই তুমি দু-চার-দশ কিংবা একশ' বিয়ে করতে পার। সেই স্ত্রী দাসী ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না: কিন্তু ধর্ম একে ঠিক বলেই মনে করে। আমি যে কর্তব্যের কথা বলছি তা ধর্মজাত কর্তব্য নয়, সুস্থ মানুষের মন যেটাকে কর্তব্য বলে মনে করে।"

"তাহলে আমি বলব যে প্রয়োজনীয় যা কিছু তাই হল কর্তব্য।"

"তবে তো উচিত-অনুচিতের মধ্যে কোন প্রভেদই থাকবে না।"

"প্রভেদ থাকবে বন্ধু! আমার প্রয়োজনীয় বলার অর্থ শুধু একজনের প্রয়োজনের কথা নয়।"

"একটু পরিষ্কার করে বল, বিষ্ণুগুপ্ত!"

"আমাদের এই তক্ষশিলা গান্ধারের কথাই ধর না ভাই! আমাদের কাছে নিজ স্বতন্ত্রতা কত প্রিয় এবং তা লাভ করা উচিতও বটে। কিন্তু আমাদের দেশ এত ছোট যে তার পক্ষে বড় শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত মদ্র, পশ্চিম গান্ধারের মত ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রগুলি আমাদের প্রতিবেশী ছিল তত দিন সুখেই ছিলাম। কখনো কখনো যুদ্ধ করতে হ'ত বটে কিন্তু পরিণামে সামান্য কিছু লোকই মরত শুধু। আমাদের স্বাতন্ত্র্য অপহৃত হয়নি। কারণ আরও ছিল, তক্ষশীলা জয়—কণ্টকাকীর্ণ রাজ্য জয় করা কারও পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু যখন পার্শবরা (ইরাণী) পশ্চিমের প্রতিবেশী হ'য়ে দাঁড়াল তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্য শুধু তাদের কৃপার উপর নির্ভর করে রইল। তখন আমাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য আবশ্যক হ'ল পার্শবদের মত শক্তিশালী হওয়া।

"শক্তিশালী হওয়ার জন্য কি করেছ?"

"ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে কাজ হবে না। ছোট ছোট জনপদের জায়গায় বিশাল রাজ্য কায়েম করতে হবে।"

"সে বিশাল রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের কি কোন স্থান থাকবে?"

"সকলেই রাজ্যকে আপন বলে মনে করবে।"

"এ খুবই গোলমালের কথা বিষ্ণুগুপ্ত! দাস কি কখনও প্রভুকে আপন ব'লে মনে ক'রে?"

"তবে শোন, বন্ধু নাগদত্ত, স্থান পাওয়াটা শুধু ইচ্ছা ও খেয়ালের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে যোগ্যতার ওপর। যদি তক্ষশীলা—গান্ধারদের যোগ্যতা থাকে তবে তারা ওই বিশাল রাজ্যেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারবে। তা না হলে সাধারণ ভাবেই থাকবে।"

"গোলামের স্থান অধিকার কবে?"

"কিন্তু বন্ধু! দরয়োশ রাজ্যে পশ্চিম গান্ধাররা যে স্থান পেয়েছে তার থেকে এ গোলাম-স্থান অনেক বেশী ভাল হবে। আচ্ছা আমার কথা ছেড়েই দাও। তুমি-ই বল না আমাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার জন্য কি করা উচিত। একথা খুবই সত্যি যে আমাদের মত ক্ষুদ্র জনপদের পক্ষে আপন মস্তিষ্ক রক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়।"

"আমি বলব বিষ্ণুগুপ্ত! প্রথমত আমাদের নিজস্ব গণ-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা উচিত। আর তা কোন রাজার বশ্যতা স্বীকার করবে না। আমি জানি যে আমাদের মত একটি ক্ষুদ্র গণের (রাষ্ট্রের) পক্ষে স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের কর্তব্য হ'ল সমস্ত উত্তরাপথের (গান্ধারের) গণগুলিকে (রাষ্ট্রগুলিকে) সংঘবদ্ধ করা।"

"সে সংঘের প্রত্যেকটি গণ স্বতন্ত্র থাকবে না, সংঘ সর্বোপরি থাকবে?"

"সকলের ওপর গণকে আমি শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি আর সেইভাবেই গান্ধার, মদ্র, মল্ল এবং শিবি প্রভৃতি সব গণগুলিকেও সংঘের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হবে।

"কেমন করে তা স্বীকার করবে? শেষ পর্যন্ত তো গণকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য রাখতেই হবে, বলি (কর) আদায় করতে হবে।"

"আমরা গণের ভিতর লোকের সাহায্য নিয়ে ওসব কাজ করিয়ে থাকি, তেমনি সংঘেও তার ভিতরকার কাজ গণগুলির সাহায্যেই করাতে পারবে।"

"গণের মধ্যে প্রথম থেকেই আমরা এক জনের (গোষ্ঠী) এক রক্তের পরিবার হিসাবে বাস ক'রে আসছি। আর অনাদিকাল থেকে এই পরিবার অর্থাৎ গণকে মেনে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ গণগুলির মিলিত সংঘ একটি নতুন জিনিস। এখানে রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই, বরং এদের মধ্যে অনাদিকাল হ'তে চলে আসছে রক্তপাতের দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক্ষেত্রে কেমন ক'রে আমরা সবাইকে দিয়ে সংঘের নিয়ম কানুন স্বীকার করাতে সক্ষম হবো? বন্ধু! তুমি যদি এদের ব্যবহার-গুলির বিচার করে দেখতে তাহলে আর তুমি এর জন্য বলতে না। যদি বাধ্য করা

হয় তা হ'লে, সংঘের কথা না হয় ধরলাম যে গণগুলি মেনে নেবে। কিন্তু বাধ্য করবার শক্তি আস্‌বে কোত্থেকে ?"

"আমি মনে করি যে সে শক্তি ওরই মধ্য থেকে সৃষ্টি করা উচিত।"

"আমিও মনে করি যে গণগুলির ভিতর থেকে যদি সে শক্তি সৃষ্টি হত তা হ'লে খুবই ভাল হ'ত। কিন্তু পার্শবদের কাছে বার বার মার খেয়ে আমরা বুঝেছি যে সে শক্তি ভিতর থেকে সৃষ্টি হ'তে পারে না। তাই আমাদের প্রয়োজন, যে কোন উপায়ে সে শক্তি সৃষ্টি করা।"

"রাজাকে মেনে নিয়েও ?"

"শুধু তক্ষশীলা নয়। তক্ষশীলা গান্ধারের মত জনপদগুলির জন্য একজন রাজা অর্থাৎ রাজচক্রবর্তীকেও স্বীকার ক'রে নিতে কোন ক্ষতি নেই।"

"তা হ'লে পার্শব দারয়োশকেই বা কেন রাজা বলে মেনে নাওনা।"

"পার্শব দারয়োশ আমাদের লোক নয় বন্ধু! তা তুমি নিজেই জান। আমরা জম্বুদ্বীপের লোক।"

"আচ্ছা, তা হলে নন্দকে স্বীকার করে নাও।"

"আমরা যদি সমস্ত উত্তরাপথের সব গণগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে না পারি, তাহলে নন্দকে স্বীকার করে নিতে আপত্তি করা উচিত নয়। পশ্চিম গান্ধারদের মত দারয়োশের অধীন হওয়া ভাল—না নিজেদের জম্বুদ্বীপের চক্রবর্তীর অধীনতা স্বীকার করা ভাল ?"

"বিষ্ণুগুপ্ত তুমি এখনও রাজার রাজ্য দেখনি, যদি দেখতে তাহলে বুঝতে যে সেখানে সাধারণ লোকেরও দাসদের অপেক্ষা বেশী অধিকার নেই।"

"স্বীকার করছি তা। আমি পশ্চিম গান্ধার ছাড়া আর কোথাও যাইনি; কিন্তু দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আমার খুবই আছে। আমি লেখাপড়া শেষ ক'রে ভ্রমণে বেরুতে চাই। বিদেশী দাসত্বের হাত থেকে বাঁচতে হলে ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে ফেলতে হবে আমাদের। এ সম্পর্কে আমার দ্বিমত থাকতে পারে না। এই কোরোস আর দারয়োশদের সফলতার এই হল চাবিকাঠি।"

"তারা কতটা সাফল্য লাভ করেছে তা আমি কাছে থেকে দেখতে চাই।"

"কাছে থেকে।"

"হ্যাঁ, আমি প্রাচীতে মগধ পর্যন্ত দেখেছি। আর নন্দের রাজত্ব—যাকে আমাদের পূর্ব গান্ধারের (তক্ষশীলা) তুলনায় নরক বলা যায় তাও দেখেছি। গরীবদের দাবিয়ে দেওয়ার শক্তি তার আছে। কিন্তু মেহনতকারী কৃষক, শিল্পী ও দাসেরা যে তাতে কত নিপীড়িত তার প্রতি কোন নজর দিচ্ছে না।"

"এসবের কারণ হ'চ্ছে এই যে, নন্দের রাজ্যে তক্ষশীলার মত কোন স্বাভিমানী স্বতন্ত্রতাপ্রেমী গণ (প্রজাতন্ত্র) সম্মিলিত হয়নি।"

"সম্মিলিত হয়েছে, বিষ্ণুগুপ্ত! লিচ্ছবিদের গণ আমাদের গান্ধার থেকেও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এখন বৈশালী মগধের চরণদাসী আর লিচ্ছবি মগধ-শিকারীদের জবরদস্ত

কুকুর ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈশালীকে দেখ গিয়ে দেখবে দেশটা উজাড় হয়ে যাচ্ছে গত দেড়শ বছরের মধ্যে এর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশও এখন অবশিষ্ট নেই। শতাব্দী ধ'রে অর্জিত স্বতন্ত্রতা, স্বাভিমানী ভাব—এসব এখন মগধ রাজার লড্ডুয়ে সৈন্য বানাবার কাজে লাগান হ'চ্ছে। একবার যদি বড় বড় রাজ্যের হাতে নিজেকে অর্পণ করে দাও তাহলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড়ই মুস্কিলের ব্যাপার।"

"বন্ধু নাগদত্ত! আমিও একদিন তোমার মতই এই মতই পোষণ করতাম, কিন্তু এখন আমি মনে করি যে ছোট ছোট গণের যুগ আর নেই। আর বড় গণ (প্রজাতন্ত্র) ও সংঘ গ'ড়ে তোলবার চিন্তা স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু তবুও আমি যুগের প্রয়োজনকেই উচিত বলি। কিন্তু এখন কি পশ্চিমে যাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছ?"

"হ্যাঁ, প্রথমে পার্শবদের দেশ। পরে যদি সম্ভব হয় তবে যবনদের (গ্রীক) দেশও দেখতে চাই। আমাদের মত তাদেরও গণ আছে, তাই নিজের চোখে দেখতে চাই যে কিভাবে তারা মহান দারয়োশ ও তার বংশধরদের উদ্দেশ্য সফল হতে দেয়নি।"

"আর আমিও যাচ্ছি মিত্র! প্রাচ্যকে দেখব, দেখব যে সমস্ত জম্বু দ্বীপকে একত্রিত করার শক্তি মগধে আছে কি নেই। চল আমরা পড়া শেষ করে ধন-অর্জন ও পরিবার-পোষণ করা যায় এমন জায়গায় গিয়ে কাজ করি। কিন্তু বন্ধু তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প'ড়ে বৈদ্য হ'য়ে ভালই করেছ, কেন না কোথাও গিয়ে থাকবার পক্ষে এ খুবই লাভজনক বিদ্যা। আমি জানি না বলে এখন অনুতাপ হচ্ছে।"

"কিন্তু তুমি ওর চেয়েও লাভজনক জ্যোতিষ বিদ্যা এবং সামুদ্রিক তন্ত্রমন্ত্র জান।"

"মিত্র! তুমি ত জান যে এ বিদ্যা ফাঁকিবাজী।"

"কিন্তু বিষ্ণুগুপ্ত! এই বিদ্যা সত্য কি মিথ্যা তাতে চাণক্যর কি যায় আসে বলতে পার? তার কাছে যা প্রয়োজন তাই উচিত।"

ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলাধূলা ও পড়াশুনার সাথী—তক্ষশীলার নাগদত্ত কাপ্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের বিদ্যার্থী জীবনের এই শেষ দেখা। একাধিকবার যে তক্ষশীলা পার্শবদের হস্তগত হয়েছিল, কে তার স্বতন্ত্রতা বাঁচাবার জন্য দুজনই নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

২

চারি দিকে বৃক্ষ-বনস্পতিবিহীন ছোট ছোট নগ্ন পাহাড়। সেখানকার হরিৎ বর্ণ দেখার আশায় চোখ পিপাসার্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল। পাহাড়ের মাঝখানটায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা—তার মধ্যেও ক্বচিৎ কোথাও জল এবং বনস্পতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। এই উপত্যকার ধারে ধারে সার্থের (ক্যারাভ্যান) রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে লোক সদা সর্বদা লোক

যাওয়া-আসা করত। আর সার্থ এবং তার পশুদের আরামের জন্য পান্থশালা (সরাই) নির্মিত হয়েছিল। আশপাশের ভূমি দেখে এরকম আশা করা যেত না যে এই পান্থশালায় সমস্ত সুখ-সুবিধা আছে। এই মরুভূমিতে এত জিনিস কোথা থেকে আসে তা জানা যায় নি। এই পর্বতের মধ্যে একাধিক পান্থশালা ছিল; তাদের কোনটা বা সাধারণ রাজকর্মচারীদের জন্য, কোনটা আবার সৈনিকদের আবাসস্থল হিসেবে আর কিছু ব্যবসায়ীদের জন্যে ব্যবহৃত হ'ত; অন্তত একটা থাকতো রাজার পান্থ-প্রাসাদ হিসেবে। সেখানে রাজা আর তাঁর ক্ষত্রপরা বিশ্রাম করত। আজ পান্থ-প্রাসাদে কেউ এসেছে। পান্থশালার আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধা ছিল। আঙ্গিনায় অনেক দাস-কর্মচারী দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সকলের চেহারায় ঔদাস্যের ভাব ফুটে উঠেছিল। এত লোকের সমাগমেও পান্থ-প্রাসাদ আশ্চর্যরকমের নীরবতায় ভরা ছিল। এমন সময় দরজা থেকে উদ্বেগের সঙ্গে তিনজন রাজকর্মচারী বেরিয়ে এল এবং তারা সাধারণ পান্থশালার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের বহু মূল্যের বস্ত্র ও আভিজাত্যপূর্ণ মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকেরা ভয় ও সম্মানের সঙ্গে এক ধারে সরে দাঁড়াল। সেখানে কোন বৈদ্য আছে কিনা তারা প্রশ্ন ক'রল। অবশেষে সাধারণ পান্থশালায় খবর পাওয়া গেল যে সেখানে একজন হিন্দু বৈদ্য আছে। এখানে এমনিতেই বৃষ্টি কম হয়, তাও বর্ষাঋতু অনেক আগেই শেষ হয়েছে। মনাক্কা, বাদাম, আঙ্গুর, খরমুজের মত ফল সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল। রাজকর্মচারী যখন বৈদ্যের (ডাক্তারের) নিকট গেল তখন সে একটি বড় খরমুজ কাটছিল। তার আশেপাশে তারই মত ভিক্ষুকের বেশে আরও অনেকে ব'সে ছিল, তাদের সামনেও ওরকম খরমুজ রাখা ছিল।

রাজকর্মচারীকে দেখেই ভিক্ষুকেরা ভয়ার্ত হয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়ে স'রে দাঁড়াল। একজন ইশারা ক'রে বলল—

"প্রভু! এ হিন্দু বৈদ্য।"

বৈদ্যের ময়লা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে প্রথমটায় রাজকর্মচারীর মুখে একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল। পুনরায় সে তার চেহারার প্রতি তাকাল। তার চেহারা ওই কাপড়ের সঙ্গে মানাচ্ছিল না। তার মুখে ভয় ও দৈন্যের নামও ছিল না। তার নীল চোখের দীপ্তি রাজকর্মচারীটিকে প্রভাবিত ক'রল। তার ললাটের কুঞ্চিত ভাব বিলীন হয়ে গেল। সে কিছুটা শিষ্টস্বরে বলল—

"তুমি বৈদ্য (ডাক্তার) ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথাকার ?"

"তক্ষশীলার।"

তক্ষশীলার নাম শুনে রাজকর্মচারী আরও নম্র হয়ে গেল এবং বলল—

"আমাদের ক্ষত্রপ—বক্ষু-সোগ্দের ক্ষত্রপের স্ত্রী শাহানশাহের (বাদ্শার) বোনের অসুখ। কেমন, তুমি কি তার চিকিৎসা করতে পারবে ?"

"কেন পারব না, আমি তো বৈদ্য।"

"কিন্তু, এই তোমার কাপড় ?"

"কাপড় তো আর চিকিৎসা করবে না, চিকিৎসা করব আমি।"

"কিন্তু, এ খুব বেশী ময়লা।"

"আজ আমার ওগুলি বদলবারই কথা। এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা কর"—বলে বৈদ্য একটি পশমের চোগা—যা পরিহিত বস্ত্রের চেয়ে পরিষ্কার ছিল—পরল, এবং হাতে ঔষধের পুরিয়া ভর্তি একটি চামড়ার থলি নিয়ে রাজকর্মচারীর সঙ্গে চলল।

পান্থশালা ছিল শুধু নামেই। কিন্তু অঙ্গনে গাধার বিষ্ঠা কিংবা ভিখারী ঠগদের আস্তানাও ছিল না। সেখানকার সব জায়গাই পরিষ্কার ছিল। উপরে যাওয়ার সিঁড়িতে নানা রঙের নির্মিত গাল্‌চে বিছান এবং সিঁড়ির দুদিকটায় সুন্দর কারুকার্যে ভরা ছিল। ঘরের মেঝেতে মহামূল্যবান ফরাস বিছান ছিল। দরজায় দ্বিধাবিভক্ত সূক্ষ্ম পরদা ঝুলান তার পাশে মার্বেল পাথরের মূর্তির মত অনেক সুন্দরী নারবে দাঁড়ান ছিল। একটি দরজায় গিয়ে রাজকর্মচারী বৈদ্যকে দাঁড়াবার জন্য ইশারা করল এবং একটি সুন্দরীর কানে কানে কিছু বলল। সে খুব আস্তে আস্তে দরজা খুলল। ভিতরকার পরদার জন্য সেখানটায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তরুণী ফিরে এলো এবং বৈদ্যকে তার সঙ্গে যাবার জন্য বলল।

তরুণী ভিতরে ঢুকতেই ঘরময় ছড়ানো মধুর সুগন্ধের সুরভি বৈদ্যের নাকে এল। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে সে ঘরের চারিদিকে তাকাল। গৃহসজ্জার নিপুণতায় নিখুঁত রুচির পরিচয় ছিল। ফরাস, পর্দা, মসনদ, দীপদানী, চিত্র এবং মূর্তিগুলি সবই এ রকম ভাবে সাজান ছিল যে বৈদ্য তা আজ পর্যন্ত কখনও দেখেনি। সম্মুখে একটি গদীর ওপর দেয়ালের পাশে দু তিনটি মসনদ রাখা ছিল, তার একটিতে একজন মাঝারি বয়সের স্থূলকায় পুরুষ অন্যের সাহায্য নিয়ে বসে ছিল। তার আকর্ণবিস্তৃত বিশাল গোঁফে শাদা রং ধ'রেছে। তার হলুদ বর্ণের বড় বড় চোখে বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ ও তীব্র চিন্তার ছাপ ছিল। তার কাছেই অনুপম সুন্দরী রমণী বসা যার রঙ শুধু শ্বেত মাখনের মতই নয়, তা মাখনের চেয়েও অধিক কোমল বলে মনে হচ্ছিল। আর তার কপোলের ওপরটা ছিল হালকা লাল কিন্তু এখন তা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। পাতলা ঠোঁটের বিচ্ছুরিত লালিমার সঙ্গে শুক-চঞ্চুর উপমা দেওয়া যায়না। ধনুকের মত বাঁকা তার ক্ষীণ ভ্রূ-যুগল ছিল সোনালী ; তার দীর্ঘ পক্ষ্মবিশিষ্ট নীল চোখ ছিল বিষন্ন ও আরক্তিম।

তার মাথা সুবর্ণ সূক্ষ্ম জালে সজ্জিত ছিল।…

সোনালী ভেলভেটের কাঁচুলি ও পরণে লাল শালোয়ার ছিল তার অঙ্গাবরণ। সেই সৌন্দর্যময় কোমল শরীরের ওপর মণিমুক্তার অলংকার ভার মনে হচ্ছিল। এ দুজন ছাড়াও ঘরের ভেতর আরও অনেক সুন্দরী রমণী দাঁড়ান ছিল। তাদের চেহারা ও বিনীতভাব দেখে বৈদ্যের আর বুঝতে দেরি হল না যে এরা সবই ক্ষত্রপের অন্তঃপুর-পরিচারিকা।

পুরুষ বলতে সেখানে ক্ষত্রপই ছিল—সে একবার বৈদ্যের মাথা হতে পা পর্যন্ত

দেখল কিন্তু তার নীল নেত্রের দিকে চাইতেই তার দৃষ্টি আবদ্ধ হ'ল। তার একথা বুঝতে দেরি হল না যে যদি আমি আমার কাপড় এখন একে পরিয়ে দিই তাহলে এই পশুর্পুরীর (পর্সপোলী) সুন্দরতম তরুণের মধ্যে তাকেও একজন বলে গণ্য করা হবে।

ক্ষত্রপ বিনীতভাবে বলল।

"আপনি তক্ষশীলার বৈদ্য ?"

"হ্যাঁ, মহাক্ষত্রপ !"

"আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। কাল থেকে অবস্থা অত্যন্ত খারাপের দিকে। আমার নিজের দুজন বৈদ্যের ঔষধের কোন ফলই দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি ক্ষত্রপের স্ত্রীকে দেখবার পর বৈদ্যদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"তারা এখানে উপস্থিত থাকবে। আচ্ছা, তবে চলো ভেতরে যাই।"

শ্বেতপাথরের দেওয়াল থেকে যেমনি শ্বেত পর্দাটা সরিয়ে দেওয়া হ'ল, তখনই ভেতরে যাবার রাস্তা দেখা গেল। ক্ষত্রপ এবং ষোড়শী আগে আগে—বৈদ্য তাদের পেছনে পেছনে চলল। ভিতরে হাতীর দাঁতের পায়াওয়ালা একটি পালঙ্কে বিছানা, তার ওপর ফেনসদৃশ কোমল সাদা শয্যার ওপর রোগী শোয়ান ছিল। তার শরীর শ্বেত কদলী-মৃগচর্মের আবরণে ঢাকা এবং শুধুমাত্র চিবুকের উপরিভাগ খোলা ছিল। ক্ষত্রপকে আসতে দেখে পরিচারিকা স'রে দাঁড়াল। বৈদ্য কাছে গিয়ে দেখল। ক্ষত্রপাণীর চেহারার সঙ্গে ষোড়শীর চেহারায় অবিকল মিল ছিল। কিন্তু তার তরুণ সৌন্দর্যের স্থলে এর ভেতর প্রৌঢ়াবস্থার প্রভাব এবং তার ওপর আবার দীর্ঘ রোগভোগের ঝড়-ঝাপটার চিহ্ন। তার লাল টুকটুকে ঠোঁট এখন ফিকে হয়ে গেছে, পরিপুষ্ট গাল ব'সে গিয়েছে। চোখ বন্ধ অর্থাৎ গর্তে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, পীতাভ ভ্রূ এখন সতেজ ললাটের স্নিগ্ধ শ্বেতিমা রুক্ষ নিস্তেজ হয়ে গেছে।

ক্ষত্রপ মুখ কাছে নিয়ে বলল।

"অফ্‌শা !"

রোগী একটুখানি চেয়েই আবার চোখ বন্ধ করল।

বৈদ্য বলল—"মূর্চ্ছা, আংশিক মূর্চ্ছা।" সে তার হাত বের ক'রে নাড়ী দেখল, বড় কষ্টে নাড়ী পেল। শরীর প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষত্রপ বৈদ্যের মুখ গম্ভীর হ'তে দেখল। বৈদ্য একটু ভেবে বলল।

"একটুখানি দ্রাক্ষা সুরা চাই যত বেশী পুরাণো হয়।"

ক্ষত্রপের নিকট এর অভাব ছিল না, এখনও যথেষ্ট আছে ! রক্তের মত লাল পুরোণো দ্রাক্ষা সুরায় পরিপূর্ণ শুভ্র কাচের ঘড়া নিয়ে আসা হ'ল—আর তার সঙ্গে এল মণিমুক্তা খচিত সোনার চষক (পেয়ালা)। বৈদ্য একটি পুঁটলী খুলল এবং ডান হাতের আঙ্গুলের কালো বড় নখ দিয়ে এক রত্তি ওষুধ বের ক'রে রোগীকে হাঁ করাতে বলল। হাঁ করাতে ক্ষত্রপের বেশী কষ্ট হ'ল না। সে ঔষধ মুখের ভেতর ঢেলে

দিয়ে এক ঢোক সুরা মুখে ঢেলে দিল, রোগীকে গিলতে দেখে বৈদ্য সন্তুষ্ট হ'য়ে ক্ষত্রপকে বলল :

"এখন আমি বাইরে মহাক্ষত্রপের বৈদ্যের সঙ্গে দেখা করতে চাই, কিছুক্ষণ পরে মহাক্ষত্রপানী চোখ মেলবে তখন আমার কাছে থাকা প্রয়োজন।" বৈদ্য অন্য ঘরে (কামরায়) গিয়ে পার্শব বৈদ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করল। সে, (পার্শব) সোন্দ থেকে আসার সময় যে সাধারণ জ্বর নিয়ে এসেছিল, তখন হ'তে আজ পর্যন্ত সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করল। এই সময় পরিচারিকা এসে সংবাদ দিল যে প্রভুপত্নী মহাক্ষত্রপকে ডাকছেন। মহাক্ষত্রপের চেহারার ওপর দিয়ে নতুন আশার ঝলক বয়ে গেল। বৈদ্যকে সঙ্গে ক'রে ভেতরে গেল। ক্ষত্রপানীর চোখ সম্পূর্ণ খোলা ছিল। তার চেহারায় জীবনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছিল। ক্ষত্রপানী ধীর সংযত স্বরে বলল—

"আমি বুঝতে পাচ্ছি যে তুমি খুবই কষ্ট করছ। আমি যে ভাল হ'যে উঠব তাই বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। আমি শক্তি পাচ্ছি বলে অনুভব করছি।" ক্ষত্রপ বলল—"একথা আমাকে এ হিন্দু বৈদ্যও বলছিল।"

আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে ক্ষত্রপানী বলল—"হিন্দুবৈদ্য জানে আমার কি অসুখ। আমার অসুখ সেরে গেছে, কেমন বৈদ্য।"

"হ্যাঁ, অসুখ সেরে গেছে কিন্তু মাহাক্ষত্রপানি! একটু বিশ্রাম নিতে হবে। আমি ভাবছি যে কত তাড়াতাড়ি আপনাকে পশুর্পুরী যাওয়ার উপযুক্ত ক'রে তোলা যায়; আমার নিকট অভূতপূর্ব রসায়ন আছে, হিন্দুদের রসায়ন আপনাকে দিচ্ছি। একটু একটু দ্রাক্ষা এবং ডালিমের রস খেতে হবে।"

"বৈদ্য! তুমি রোগ চেন, অন্যরা তো গাধার চেয়ে গাধা। তোমার নির্দ্দেশ মতই চলব। রোশনা।"

ষোড়শী সামনে দাঁড়িয়ে বলল—

"মা।"

"বেটি! তোমার চোখে জল, ওই হাকিমগুলো আমাকে মেরে ফেলত। কিন্তু এখন আর কোন চিন্তা নেই। হিন্দু বৈদ্যকে অহুব মজদান পাঠিয়েছে। এর যেন কোন কষ্ট না হয়। বৈদ্য আমার খাওয়া-দাওয়ার জন্য যা কিছু বলে তা তুমি নিজ হাতে আমাকে দিও।"

বৈদ্য রোশনাকে কয়েকটি কথা বলে বাইরে চলে গেল। ক্ষত্রপের চেহারা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বৈদ্য কিছু ঔষধ ভূর্জপত্রের টুকরায় বেঁধে ক্ষত্রপের নিকট দিয়ে যখন নিজের পান্থশালায় যেতে চাইল তখন ক্ষত্রপ বলল।

"আমার সঙ্গেই তুমি থাকো।"

"কিন্তু আমি দরবারে থাকবার পদ্ধতি জানি না।"

"তবুও মানুষের সঙ্গে থাকার আচার-ব্যবহার তুমি ভাল জান। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার।"

"আমি থাকলে আপনার পরিচারিকার কষ্ট হবে।"

"অমি পাশেই একদম আলাদা একটি ঘর তোমাকে দিচ্ছি। তোমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্তে থাকব।"

"মহাক্ষত্রপানীর জন্য আর কোন চিন্তার কারণ নেই। হাকিমরা অসুখ ঠিকমত নির্দ্ধারণ করতে পারেনি। আমি আ: দু'ঘণ্টা পরে আসলে বাঁচাবার কোন আশা ছিল না। কিন্তু এখন তার অসুখ সেরে গেছে।"

ক্ষত্রপের আগ্রহের জন্য বৈদ্য সে কামরাটিতে থাকতে রাজী হল।

ক্ষত্রপানী চতুর্থ দিন থেকে উঠে বসতে লাগল এবং তার চেহারার ম্লানতা খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে লাগল। সবচেয়ে প্রসন্ন হ'ল রোশনা। দ্বিতীয় দিন সে তার মহামূল্য দু'বছরের চোগাটি (পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড) এনে নিজের হাতে বৈদ্যকে দিল। আজকের এই চোগা সোনালী বেল্ট, আর স্বর্ণখচিত জুতার সঙ্গে সেদিনের সেই বসে থাকা ভিক্ষাপ্রার্থী খরমুজ খাওয়া লোকটির মিল ছিল না।

ক্ষত্রপানী এখন লঘু আহার গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। একদিন ছোট দিনের সন্ধ্যাবেলা সে বৈদ্যকে ডেকে পাঠাল। বৈদ্যকে তার একেবারে নতুন পুরুষ মনে হচ্ছিল, যেন তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে কেউ আসছে। কাছে এলে পর বসতে বলল এবং বসার পরে বলল।

"বৈদ্য! আমি তোমার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। এই নির্জন পথিমধ্যে মজদান তোমাকে আমায় বাঁচাবার জন্যে পাঠিয়েছে। তোমার জন্মস্থান কোথায়?"

"তক্ষশীলা!"

"তক্ষশীলা! খুব প্রসিদ্ধ নগর, বিদ্যার জন্য খ্যাতি। তুমি তার রত্ন!"

"না, আমি সেখানকার একজন সাধারণ নতুন বৈদ্য।"

"তুমি যে তরুণ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তারুণ্য গুণের বৈরী হয়। তোমার নাম কি, বৈদ্যরাজ (ডাক্তার শ্রেষ্ঠ)?"

"নাগদত্ত কাপ্য।"

"পুরো নাম বলা আমার পক্ষে কষ্টকর। নাগ বলাই যথেষ্ট কেমন?"

"যথেষ্ট! মহাক্ষত্রপানী!"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"এখন তো যাচ্ছি পর্শুপুরী (পর্শপোলিস)।"

"তারপর?"

"পথ চলার অভিপ্রায়েই আমি ঘর ছেড়ে যাত্রা করেছি।"

"আমিও পর্শুপুরী যাচ্ছি তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি সব রকমে তোমার তদারক করব; রোশনা! তুমি নিজে বৈদ্যরাজের আরামের ব্যবস্থা কর। দাসরা (ভৃত্যরা) মোটে যত্ন করবে না।"

"না, মা! আমি নিজেই দেখব, সোফিয়াকে আমি এ কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।"

"যে সোফিয়া যবনীকে (উনানী) ওখান থেকে আমার ভাই এখানে আমার জন্য পাঠিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, মা! তোমার ত কোন কাজ ছিল না এবং মেয়েটিকে বেশ চালাক ব'লে মনে হচ্ছে, তাই আমি তাকেই লাগিয়ে দিয়েছি।"

"তা হ'লে বৈদ্যরাজ! আমার সঙ্গে পর্শুপুরী যেতে হবে, আমি তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল কিছু ক'রব না কিন্তু আমি চাইব যে তুমি আমার পরিবারের বৈদ্য থাক।"

নাগদত্ত কিছুক্ষণ বসে নিজ কাজে চলে গেল।

৩

পৃথিবীর এতো বড় বিশাল রাজ্যের রাজধানী যে এরকম নগ্ন বৃক্ষবনস্পতিবিহীন পাহাড়ে, প্রাকৃতিক দীনতায় বিজড়িত তা নাগদত্তও জানত না। একদা পর্শুপুরী মহানগরী ছিল রাজপ্রাসাদের বিশাল সমুজ্জ্বল পাষাণ-স্তম্ভ, তার গগনস্পর্শী, শিখর, বাইরে থেকে দেখলেই শাহানশাহী প্রতিপত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নগরের সমৃদ্ধি তদনুরূপ। কিন্তু এসবই মানুষের হাতের নির্মিত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে প্রকৃতি নিজে তাকে অত্যন্ত দরিদ্র করে তৈরী করেছিল।

পর্শুপুরী এবং শাহানশাহী (বাদশাহী) বৈভব দেখার জন্য শাহানশাহার বোন অফ্‌শার আশ্রয়ের চেয়ে ভাল সুযোগ বিশেষ মিলবে না। ক্ষত্রপানী পর্শুপুরী পৌঁছে নাগদত্তের আরামের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিলেন এবং যখন তিনি তার পারিশ্রমিক দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন তখন বৈদ্য সোফিয়াকে চেয়ে নিল! যখন সোফিয়ার ভাঙ্গাভাঙ্গা পার্শি ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, তখনও নাগদত্ত একথা জানত যে, ওই চকিত চোখের ভেতর তীক্ষ্ণ প্রতিভা লুকিয়ে আছে। যখন সে তার হ'ল—অর্থাৎ দাসী হিসাবে সে যখন নাগদত্তর কাছে এলো, নাগদত্ত তাকে দাসী বলে মনে করত না। আস্তে আস্তে তার ভাষার সঙ্গে আরো বেশী পরিচিত হ'তে লাগল। নাগদত্ত নিজে যবনী (গ্রীক) লিপি শিখল এবং সোফিয়া তার চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে এথেন্স ভাষা শিখতে লাগল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সে তাতে নিপুন হ'ল। একদিন সোফিয়া তরুণ বৈদ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বলল—

"ভাগ্য কিংবা সংযোগ—যাই বলো না কেন, আমি কি কোন দিনও আশা করতে পেরেছি যে তোমার মত কোমল স্বভাবের স্বামীর দাসী হ'তে পারব!"

"না, সোফিয়া! তুমি যদি ক্ষত্রপানীর সঙ্গে থাকতে তবে বোধ হয় বেশী আরামে থাকতে পেতে। কিন্তু সোফিয়া! তুমি আমাকে স্বামী বল না। দাস প্রথার কথা শুনলে আমার গায় জ্বর আসে।"

"কিন্তু আমি তোমার দাসী।"

"তুমি দাসী নও। আমি ক্ষত্রপ-দম্পতিকে ব'লে দিয়েছি যে, সোফিয়াকে আমি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করলাম।"

"তা হ'লে এখন আর আমি দাসী নই!"

"না, তুমি এখন আমার মতই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এবং এখন তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি তোমায় সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করব।"

"কিন্তু, আমি যদি তোমার কাছেই আরো থাকতে চাই, তা হ'লে তুমি আমাকে বের করে দেবে না তো।"

"সম্পূর্ণভাবে তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।"

"দাসত্ব মানুষকে কতই না খর্ব করে? পিতৃগৃহে আমি আমাদের দাসদের দেখেছি, তারা আমোদ প্রমোদ করত; আমি কখনও বুঝতে পারিনি যে তাদের হাসির মধ্যে এতো ব্যথা লুকিয়ে ছিল। আমি যখন নিজে দাসী হলাম তখন অনুভব করলাম যে দাসত্ব কি রকম নরক।"

"তুমি কেমন ক'রে দাসী হ'লে, সোফী! যদি কষ্ট না হয় তবে বল!"

"আমার বাবা এথেন্স নগরে একজন প্রধান নাগরিক ছিলেন। যখন মকদুনিয়ার রাজা ফিলিপ আমাদের নগর বিজয় করল তখন বাবা পরিবারের লোকদের নিয়ে নৌকোয় ক'রে এসিয়ায় পালিয়ে এলো। আমরা মনে করেছিলাম যে সেখানে আশ্রয় পাব, কিন্তু যে নগরে আমরা গিয়ে অবতরণ করলাম, কয়েক মাস বাদেই পার্শবরা তার ওপর আক্রমণ করল। নগরের পতন হল, আর সে পালানো দৌড়ানির মধ্যে কে কোথায় গিয়েছে, কত নাগরিকদের পার্শবরা বন্দী করেছে জানি না। আমি দেখলাম আমি সেই বন্দীদের মধ্যে একজন, আর আমি অপরূপ সুন্দরী ছিলাম, তার ওপর বয়সে তরুণী বলে তারা আমাকে সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিল। সেনাপতির নিকট হ'তে পরে বাদশার কাছে এলাম। বাদশার নিকট আমার মত শত শত যুবতী তরুণী ছিল, সে নিজের বোন আসছে শুনে আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিল। যদিও আমি দাসী ছিলাম, কিন্তু নিজের রূপের জন্য খাশ জায়গার দাসী ছিলাম। তার জন্যই আমার অনুভূতি সাধারণ দাসীদের মত হ'তে পারে নি, তবুও আমি জানি যে এর কি যাতনা! আমারও মনে হত যে আমি মানবী নয়।"

"তা হ'লে সোফী! বাবার সাথে তোমার আর দেখা হয় নি?"

"এখনো তিনি বেঁচে আছেন বলে আমার মনে হয় না। এখন ত আমি হাওয়ায় ওড়ানো সুখের পায়রা। প্রিয় এথেন্স নগর তো ধ্বংস হ'য়ে গেছে, বাবা যদি এখন জীবিত থাকেন তাহলেও আমাদের মিলনের স্থান কোথায়?"

"এথেন্স কি মহানগরী, সোফিয়া?"

"কোন এক সময় ছিল, স্বামী!—"

"স্বামী নয়, নাগ বল, সোফী!"

"ছিল একদিন নাগ! কিন্তু এখন তো তা ধ্বংসপ্রাপ্ত; আমাদের 'গণ' যে একদিন মহান্ দারয়োশদের দাঁত বিষাক্ত করেছিল, ক্ষুদ্র ফিলিপন তাদের একেবারে অন্তসার করল।"

"কেন এমনি হ'ল সোফিয়া?"

"পার্শবদের অনেক আক্রমণের প্রতিকার ক'রেও এথেন্সের কিছু বিচারকদের (পণ্ডিত) মাথায় এ খেয়াল চাপল যে 'যতদিন পর্য্যন্ত আমরা পার্শবদের তুল্য একটি বড রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করতে পাচ্ছি ততো দিনে আমাদের নিস্তার নেই।"

"আহা, তক্ষশীলা! তুমিও বিষ্ণুগুপ্তের মত লোক সৃষ্টি করেছ!"

"তক্ষশীলা, বিষ্ণুগুপ্ত কি, নাগ!"

"অভিমানিনী তক্ষশীলা আমার জন্মভূমি, আগেকার এথেন্স। আমাদেব 'গণ' ও মহান্ দারয়োশ এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের অনেকবার মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমার সহপাঠী বিষ্ণুগুপ্ত এখনও সে কথা বলে। তার কাছ থেকে ফিলিপের সহাযতা মিলেছে বলে এথেন্স নাগরিকরা বলত।"

"তক্ষশীলাও কি আমাদের এথেন্সের মত 'গণ'?"

"হ্যাঁ, ওই রূপ 'গণ'। আর আমাদের তক্ষশীলায কেউ দাস নেই, সেখানকার জমিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দাস অদাস হয়ে যায়।"

"আহা, করুণাময়ী তক্ষশীলা! তাই নাগ, আমি প্রথমদিন থেকেই দেখছি যে দাসদের সঙ্গে ব্যবহার করতে তুমি জান না।"

"আর আমি কখনও তা তোমাকে জানতে দেব না। আর আমি বিষ্ণুগুপ্তকে বলেছি যে যদি তুমি মগধ অধিকার কর তা হ'লে তক্ষশীলার পবিত্র ভূমিতে দাসত্বের কলঙ্ক মুক্ত থাকবে না!"

"মগধ কোনটা নাগ!"

"হিন্দের (হিন্দুস্থানের) ফিলিপ, তক্ষশীলার পূর্বে এক বিশাল হিন্দুরাজ্য। পার্শবদের আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করে আসছি, জিতে জিতেও আমবা দুর্বল এবং হারার মত হয়ে গেছি। বস্তুত তক্ষশীলা এক পার্শব শাহনশাহের (বাদশার) মোকাবিলা করতে পারে না, কিন্তু আমি এর প্রতিরোধের একমাত্র ঔষধ হিসাবে বলছি নিজেদের সমস্ত গণগুলিকে সংঘবদ্ধ হতে।"

"কিন্তু নাগ! আমাদের দেশে এও করে দেখা হয়েছে। আমাদের মতো হেল্লা জাতিকে দিয়ে 'গণ' সংঘ তৈরী করে পার্শবদের মোকাবিলা করেছে কিন্তু সে সংঘের সভ্য হ'তে পারল না। গণগুলির মধ্যে নিজ নিজ গণের স্বতন্ত্রতার ওপর এতো নজর যে সে সেখানে সংঘকে স্থান ছেড়ে দিতে রাজী নয়।"

"তাহলে কি আমিই ভুল প্রমাণিত হব এবং বিষ্ণুগুপ্ত ঠিক।"

"বিষ্ণুগুপ্ত কি সংঘের সফলতা দেখতে পায় না।"

"হ্যাঁ, সে বলে, 'আমাদের শত্রু যতটা শক্তিশালী তাতে তার মোকাবিলা করা

গণগুলির সঙ্গ দিয়ে হতে পারে না। অনেকগুলি গণের সীমা নষ্ট করে যদি একটি মহান্ 'গণ' তৈরী করা যায় তবে হয়ত সম্ভব হতে পারে, কিন্তু 'গণ' এ কথা স্বীকার করতে রাজী হবে না।"

"হয়ত তোমার বন্ধু ঠিকই বলছে, নাগ! কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্তও এথেন্সের স্বতন্ত্রতা ছেড়ে দেবার কথা মনে আসতে দিইনি।"

"তাহলে সোফীয়া! গণ হয়েও এথেন্স কেন এ দাসত্বকে স্বীকার করল?"

"নিজের পতন শীঘ্র ডেকে আনার জন্য। ধনীর লোভের জন্যই দাসত্বের প্রভাব হল এবং আস্তে আস্তে স্বামীর (প্রভু) চেয়েও দাসদের সংখ্যা বেড়ে গেল।"

"এখানে তোমার পার্শবদের ভেতর সব চেয়ে কোন্ কথা খারাপ মনে হল?"

"দাসত্ব, যা আমাদের ওখানেও ছিল। আর বাদশা এবং ধনীর রমণীবাস।"

"তোমাদের ওখানে এরকম হয় না?"

"আমাদের ওখানে মক্‌দুনিয়ার রাজা ফিলিপও একাধিক বিয়ে করতে পারে না। এখানে তো ছোট ছোট রাজকর্মচারী পর্যন্ত বহু বিবাহ করে।"

"আমাদের এখানে কখন কখন একাধিক বিয়ে করতে দেখা যায়, যদিও তার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমি তাকে স্ত্রীজাতির দাসত্বের নিদর্শন বলে মনে করতাম। এথেন্স যদি দাসত্ব প্রথা চালু করে থাকে তবে তক্ষশীলা অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিয়ে জারি রেখে তা বজায় রেখেছে।"

"আর অল্পসংখ্যক ঘরেই ধন জমা হওয়া।"

"আমি বিষ্ণুগুপ্তকে বলেছিলাম, 'গণে' এতো ধন রত্ন থাকতেও কেন অন্যের শ্রী বৃদ্ধি হচ্ছে না। তুমি রাজার মত জলের ন্যায় ধন ভাসিয়ে দিতে পার না। এখানে তো তুমি দেখছ সোফী! মূল্যবান মৃগচর্ম, দুকুল, মণি, মুক্তা ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হয়। এ গোলাপী গাল, এ প্রবালী অধর একবার মনেও করে না যে এ বস্তুগুলি উৎপন্ন করতে কত সহস্র সহস্র লোক না খেয়ে মরেছে।"

"আমাদের ঘরের পড়ে যাওয়া জল কেড়ে নিয়েই সমুদ্রের এ জলরাশি। মাটিতে যারা সোনা ফলায় তারা মরছে না খেয়ে, আর সোনাকে যারা মাটি করে দেয় তারা খাবার ওড়ায়। আমি তিন বার বাদশার কাছে গিয়েছি প্রত্যেকবারই ফেরবার সময় আমার মাথা ধরেছে। আমি তার সমস্ত সমৃদ্ধির ভেতর শীতে ঠিক্‌রিয়ে, গরমে জল হয়ে মরবার মানুষ ওই কর্মকারদের দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলতে দেখি, আমাকে সতর্ক করে যাওয়া তাদের লাল মদিররা প্রজাদের রক্ত রূপে দেখা যাচ্ছে। পর্শপুরীতে আমার তিক্ততা এসেছে তাই তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই।"

"কোথায় যেতে চাচ্ছ নাগ?"

"প্রথমে তোমার বিষয় জানতে চাই।"

"কোথায় আমি বলব।"

"যবন-লোক (য়ুনান)।"

"পছন্দ হবে।"

"তবে সেদিকেই যাব।"

"কিন্তু, রাস্তায় আবার আমাকে কেউ কেড়ে না নেয় এবং এবার নাগের মত ত্রাণকর্তা যদি না পাই।" সোফীয়ার কণ্ঠস্বর খুবই নরম হয়ে গেছিল। তার সুন্দর আয়ত নয়ন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

নাগদত্ত তার কানের ওপর ঝুলে পড়া সোনালী চুলগুলিকে স্পর্শ করে বলল—

"আমি তার উপায় ঠিক করে রেখেছি কিন্তু তার জন্য তোমারও সম্মতি প্রয়োজন।"

"কি ?"

"ক্ষত্রপ, ক্ষত্রপাণী এবং শাহানশাহার (বাদশার) নিকট হতে আমার জন্য চিঠি নিয়ে নেব যে, এ শাহানশাহের সম্মানিত হিন্দু বৈদ্য (ডাক্তার)।"

"তাহলে আর আমাকে কেউ কেড়ে নেবে না।"

"আর যদি তুমি পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দেখাবার জন্য বৈদ্যের স্ত্রী হতে চাও, তাহলে তো চিঠিতে তোমার নাম লিখিয়ে দেব।"

সোফীয়ার চোখ ছল ছল করে জল পড়তে লাগল। সে নাগদত্তের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—

"নাগ! তুমি কত উদার, তোমার মনের গভীরতা তুমি জানাতে চেষ্টা কর না। তুমি কত সুন্দর, কিন্তু তুমি কখন এখানে তোমার প্রতি আকৃষ্টা পুষ্পরাগ এবং নীলিমা চোখে দেখনি। নাগ! রোশনা কতবার আমার কাছে তোমার জন্য প্রেম নিবেদন করেছে। তার কোন এক মরিয়লসা ভাই আছে তাই বাপ মা চায় রোশনাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে, কিন্তু সে চায় তোমাকে।"

"ভালই হয়েছে যে আমি জানিনি, তা না হলে তো অস্বীকার করতে হত। সোফীয়া! আমি এ প্রসাদপোষিতার জন্য নয়। আমি বোধ হয় কারর জন্যই নয়। কেননা আমার সঙ্গে যে প্রেম করবে তার সুখে নিদ্রা এবং শয়নও জুটবে না। কিন্তু যদি তুমি চাও তবে শাহানশাহের (বাদশার) চিঠিতে—চিঠির স্থান পূর্ণ করবার জন্য—নিজ স্ত্রী বলে লিখিয়ে নেব। যবনদেশে যদি তোমার কোন প্রিয় পাত্র জুটে যায় তাহলে তোমাকে নিজের পথ দেখতে হবে।"

· ·

বৈদ্য নাগদত্তের সব জায়গা থেকেই ডাক পড়তে লাগল। সে হিন্দু বৈদ্য ছিল, পার্শব শাহানশাহের দারয়োশের একদা চিকিৎসক ছিল, আর তার চিকিৎসায় অদ্ভুত রকম অধিকার হ'য়ে ছিল! পর্শুপুরীতে থাকাকালীন সে যবন-ভাষা

শিখেছে, তার ওপর সোফিয়া তার সহচারিণী। সে মক্‌দুনিয়া দেখেছে এবং ফিলিপের পুত্র অলিকসুন্দরের (সিকেন্দার) গুরু অরস্তুকে দেখেছে। নাগদত্ত নিজেও একজন দার্শনিক ছিল—কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অরস্তুর শাহানশাহী পছন্দের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ছিল। তবুও সে অরস্তুর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়ে মক্‌দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। অরস্তুর সব থেকে বড় কথা যা তার পছন্দ হয়েছিল তা হল যে সত্যের পরীক্ষার জন্য বুদ্ধি নয়, জাগতিক পদার্থই প্রকৃতি। অরস্তু প্রয়োগ—প্রমাণিত বস্তুকে উচ্চে স্থান দিত। নাগদত্তের আফসোশ ছিল এজন্য যে ভারতীয় দার্শনিক সত্যকে মন থেকে সৃষ্টি করতে চায়। নাগদত্ত অরস্তুর শিষ্য মনস্বীর অনেক প্রশংসা তার গুরুর মুখে শুনেছে এবং সে নিজেও কতবার তার বিষয় কথাবার্তা বলেছে। সেই তরুণের মধ্যে শুধু মাত্র অসাধারণ শৌর্যই ছিল না বরং অসাধারণ বিচার শক্তিও ছিল।

নাগদত্ত এথেন্স গিয়ে ফিরে আসার জন্য অরস্তুর কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু এ যে যবন দার্শনিকের সঙ্গে তার শেষ দেখা তা সে কি করে জানবে।

বীরের জননী গণতন্ত্রের বিজয়ধ্বজাধারিণী এথেন্স নগরে সে ততটাই শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে প্রবিষ্ট হ'ল যতটা সে তক্ষশীলার জন্য করত। নগর পুনরায় উর্বর হয়েছিল কিন্তু সোফিয়া বলল যে এখন আর সেই পুরনো এথেন্স নেই। বেনস্ জুপিটরের মন্দির এখনও অমর কলাকারীর সুন্দর কীর্তিতে অলংকৃত ছিল। কিন্তু সোফীয়া একদিন প্রথমজীবনে এথেন্স নাগরিকদের প্রাণে যে উৎসাহ, যে জীবনস্পন্দন দেখে ছিল আজ আর তা নেই।

সোফিয়ার বাবার ঘর—না, তার জমির ওপর তৈরী ঘরের মালিক একজন মক্‌দুনিয়ার ব্যবসায়ী। সে ঘর দেখে সোফিয়া এত দূর উদ্বিগ্ন হ'ল যে সে নিজেই তার স্বাভাব গাম্ভীর্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করল। কিন্তু সে কম কথা বলত।

কখনো তার চোখ অশ্রুজলে ভরে যেত আর কখনও সে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে থাকত। নাগদত্ত বুঝতে পারল যে নিজের প্রিয় বাল্যস্থানের ওইরকম অবস্থা দেখেই তার এ বিকার হয়েছে। কিন্তু বড়ই মুস্কিলের কথা হ'ল যে তখন তাকে বুঝাবার অবসর ছিল না এবং শেষটায় সোফিয়ার মর্মান্তিক শোকচ্ছায়া নাগদত্তকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল।

যখন সোফীয়া প্রকৃতিস্থ হল তখন সে একদম বদলে গেল।

নিজের শারীরিক সাজ সজ্জার ওপর তার কখনও বিশেষ খেয়াল ছিল না কিন্তু এখন সে গণতন্ত্রী এথেন্সের তরুণীদের মত নিজের খোলা সোনালী চুলগুলিকে প্রস্ফুটিত ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা বাঁধতে লাগল। তার শরীরের ওপর যবন-সুন্দরীদের পা পর্যন্ত ঝোলান বিশেষ পছন্দ করা সুন্দর কঞ্চুক এবং পায় অনেকগুলি ফিতা যুক্ত স্যাণ্ডেল ছিল। তার সুন্দর সাদা কপাল, গোলাপী কপোল, লাল টুকটুকে ঠোঁটের তারুণ্য সৌন্দর্য এবং স্বাস্থের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। আর প্রফুল্লতা ও মুচকি হাসি তো তার চেহারায় এবং ঠোঁটের উপর লেগে ছিল।

নাগদত্ত তা দেখে আশ্চর্য হ'ল না বরং অপার আনন্দ লাভ করল। তার প্রশ্নে সোফিয়া বলল—

"প্রিয় নাগ! আমি আজ পর্যন্ত জীবনটাকে একমাত্র শোক এবং চিন্তার বস্তু বলে মনে করে এসেছি কিন্তু এখন সে ধারনা আমার ভুল বলে মনে হচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে এরকম এক তরফা দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের মূল্যকে কমিয়ে দেয় এবং কার্যক্ষমতাকেও দুর্বল করে ফেলে। নাগ! শেষপর্যন্ত তুমিও তক্ষশীলার ভবিষ্যতের জন্য কম চিন্তা করছ না, তবে তুমি চিন্তাকে ঠাণ্ডা রেখেই উপায় উদ্ভাবনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছ।"

"সোফি! তোমাকে এতটা আনন্দিত দেখে আমি খুবই খুশী।"

"আমার কেন আনন্দ হবে না, আমি এথেন্সে ফিরে এসে নিজের প্রিয়কে পেয়েছি।"

নাগদত্ত হর্ষোল্লাসে পুলকিত হয়ে বলল—"এখানে আরও আনন্দের কথা হ'ল যে তুমি এতদিন পরে নিজের প্রিয়কে ফিরে পেয়েছ।"

"নাগ! আমি দেখছি যে তুমি মানব নও, দেবতার চেয়েও বড়, ঈর্ষা তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।"

"ঈর্ষা! ঈর্ষার এখানে প্রয়োজন কি? সোফি! আমি কি তোমাকে যবন দেশে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিইনি? আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি সেখানে গিয়ে তোমার প্রিয়কে খুঁজে নিও?"

"হ্যাঁ, বলেছিলে।"

"তোমার এ অস্বাভাবিক হর্ষ দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে তুমি নিশ্চয়ই অসাধারণ কোন প্রিয় বস্তু পেয়েছ।"

"তোমার মনে করাটা ঠিকই নাগ!"

"আচ্ছা তাহলে তোমার প্রিয়তমকে এখানে নিমন্ত্রণ করবার কিংবা যদি সে এখন এখানে না আসতে পারে তবে সেখানে গিয়ে দেখা করবার জন্য আমাকে তুমি অনুমতি দাও।"

"কিন্তু, তুমি এতটা উতলা হচ্ছ কেন?"

"সত্যিই কি আমি অস্থির হচ্ছি? তুমি ভুল বলছ না?" নাগদত্ত নিজেকে সামলিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

সোফিয়ার ভয় হ'তে লাগল যে পাছে সে অশ্রুজল সম্বরণ করতে না পারে। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—

"দেখতে পার কিন্তু তোমাকে এথেন্সের তরুণের বেশ ধারণ করতে হবে, এর চেয়ে তা কিছুটা ভাল।"

"তা তো নতুন, কাল যে তুমি নতুন স্যাণ্ডেল কিনে এনেছ আমি তা পরে নেব।"

"যাও, পরে এসো, ইতিমধ্যে আমি আমার প্রিয়তমের জন্য মালা নিয়ে নিচ্ছি—লিদিয়া তার জন্য মালা গাঁথছে।"

"বেশ," বলে নাগদত্ত অন্য ঘরে চলে গেল। সোফিয়া বৈঠকখানার বড আয়নার সামনে দাঁড়াল। সে নিজের কাপড এবং ফুলের ভূষণের ওপর একবার হাত বুলাল, আর একগাছা মালা আয়নার পিছে রেখে চুপ করে ঘরের দরজায় গিয়ে বলল—

"নাগ! অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আবার আমার প্রিয়তম কোন প্রমোদশালায় চলে না যায়।"

"তাড়াতাডি করছি সোফি! তুমি এ কি রকম?"

"আমি সাহায্য করব?"

"তোমার দয়া।"

আবার নাগদত্ত নতুন স্যাণ্ডেল পরল।

নাগদত্তের মুখের দিকে চাইতে সোফির সাহস হল না। সে তার হাত ধরে বলল—"প্রথমে আয়না দিয়ে নিজের নতুন পোশাক দেখে নাও।"

"তুমি যে দেখে দিয়েছ সোফি! এটই বেশ। বিনীত বেশ প্রয়োজন।"

'হ্যা, আমার তো বিনীত বেশ বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু একবার দেখে নেওয়াটা খারাপ নয়।"

সোফি নাগদত্তকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, সে তার নিজের কাপড় দেখতে লাগল। তখন সোফি মালা বের করে বলল—

"এ মালা আমি প্রিয়তমের জন্য তৈরী করেছি।"

"বেশ সুন্দর মালা সোফি!"

"কিন্তু জানি না, তার কি রকম লাগবে।"

"তার ধূসর চুল, আর এ লাল টুকটুকে গোলাপ ফুলের মালা।"

"সুন্দর দেখাবে।"

"তোমার মাথার ওপর রেখে একটু দেখব।"

"তোমার ইচ্ছা। আমারও চুল ধূসর।"

"তাই তো ঠিক করে নিতে চাই। মালা মাথার ওপর রেখে তাকে সম্মুখে তাকাতে বলল। আবার আয়না থেকে মুখ ফিরাবার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করল—"তা হলে তুমি আজ আমার প্রিয়তমকে দেখতে চাও নাগ? এখুনি দেখতে চাও তো এই দেখ।"

নাগ মুখ ঘুরাল, সোফিয়ার হাতের আয়নায় নাগদত্তের প্রতিবিম্ব পড়ল। সে আনন্দিত চোখে বলল,—"এই আমার প্রিয়তম।" আর পরক্ষণেই সে তার নিজের বাহুপাশে নাগদত্তকে বেঁধে তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দিল। নাগদত্ত কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে রইল। সোফিয়া তখন তার ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে নিজের কপোল নাগদত্তের কপোলের সাথে মিশিয়ে বলল:

"আমার প্রিয়তম! কত ভাল নাগ?"

"সোফি! আমি নিজেকে তোমার যোগ্য বলে মনে করি না।"

"নিজেকে আমি জানি। নাগ! এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তোমার সঙ্গেই থাকব।" নাগদত্তের অশ্রুর-বাঁধ এখন ভেঙ্গে পড়ল, সে বলল—"মৃত্যু পর্যন্ত!"

৫

সেলামীর খাড়ী (বদ্বীপ) যেখানটায় যবন নৌ-সৈন্যরা পার্শবদের বড রকম একটা যুদ্ধে পরাজিত করেছিল নাগদত্তের খুবই ইচ্ছা ছিল যে সেটা দেখে। দুজনই রাস্তা ধবে পথ চলছিল। নাগদত্ত নিজের ভেতর নতুন উৎসাহ পাচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে তার মন তক্ষশীলার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। দুজনই রাস্তায় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিল, তখন সোফিয়া বলল।

"শোননি নাগ! ফিলিপ মারা গেছে, অলিকসুন্দর মকদুনিয়ার রাজা হয়েছে আর সে বড় জবরদস্ত সৈন্য তৈরী করছে।"

"হ্যাঁ, সে সমস্ত যবন (ভুমধ্য) সাগর পার অধিকাব করতে চাচ্ছে। কিন্তু তাব মধ্যে পূর্ব এবং দক্ষিণ (মিশ্রক্য) পার তো পার্শবদের হাতে ছিল।"

"তার মানে হল যে সে পার্শবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়।"

"আর এভাবে গণতন্ত্রী যবনের নিকট হতে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নিতে চায়। এক ঢিলে দু' পাখী মারতে চায় সোফিয়া! শাহানশাহার যবন সাগর থেকে হটে যেতে হবে—যদি আর অগ্রসর হতে না পাবে—এবং অভিমানী যবনগণকে রাজভক্ত করান।"

"অরস্তু তাকে শিক্ষা দিল, তার সাহস বাড়ালো!"

"দার্শনিক অরস্তু!"

"হ্যাঁ, আর তার গুরু অফলাতুন একটি আদর্শ 'গণে'র কল্পনা করেছিল কিন্তু সেও তাতে সাধারণ জনতাকে রাখতে চেয়েছিল। অরস্তু আদর্শ গণের জায়গায় আদর্শ রাজ-চক্রবর্তীর কল্পনা করত। কি জানি এই যবন-চক্রবর্তী পার্শব-শাহানশাহাকে পরাজিত করে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়।"

"একবার পা বাড়িয়ে দিলে পর আর তাকে থামান ক্ষমতার বাইরে সোফি! আর সেখানে আমার সহপাঠী বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যও মগধে রাজ-চক্রবর্তীর অনুসন্ধানে বেরিয়েছে।"

"কেমন, যবন এবং হিন্দু চক্রবর্তীদের সিন্ধুতীরে মিলন হবে না তো?"

"হবে। প্রথম পুরুষে কিংবা দ্বিতীয় পুরুষে হবে সোফি! কিন্তু পৃথিবী তখন কত ছোট হয়ে যাবে।"

* * *

সমুদ্রতীর হতে সে নৌকায় করে সেলামীর দিকে রওনা হল। সমুদ্র শান্ত ছিল,

বাতাস একেবারেই বন্ধ ছিল। সোফি এবং নাগদত্ত দুজনই বিগত শতাব্দীর ইতিহাসবাহিনী সমুদ্রকে বড় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে দেখেছিল। এ সমুদ্রই পার্শবদের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল।

সমুদ্রের ভেতর অনেক দূর চলে যাওয়ার পর খুব বড় তুফান আসল। দুজনই মনে করছিল যে এ শতাব্দীর আগেকার তুফান কিন্তু তখনই তাদের নজর ভয়ভীত নৌকার ওপর পড়ল। আর দেখল যে পাল ছিঁড়ে গেছে এবং নৌকা ডুবতে লাগল। অবস্থান খুবই অস্পষ্ট ছিল। সোফিয়া তখন নাগদত্তকে নিজের বাহুপাশে বেঁধে বুকে বুক মিলিয়ে রইল। তার চেহারার ওপর মুচকি হাসি দেখা গেল যখন সে বলল—"মৃত্যু পর্যন্ত।"

"হ্যাঁ, মৃত্যু পর্যন্ত"—বলে নাগদত্ত সোফিয়ার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দিল আর দুজনই চার বাহুতে আবদ্ধ হল।

পর মুহূর্তেই নৌকা উল্টে গেল। সত্যিই মৃত্যু পর্যন্ত সাথী হয়ে রইল তারা।

প্রভা

কাল—৫০ খৃষ্টাব্দ

১

সাকেত (অযোধ্যা) কখনো কোনো রাজার প্রধান রাজধানীতে পরিণত হয়নি। বুদ্ধের সমসাময়িক কোশলরাজ প্রসেনজিতের এক রাজমহল এখানে ছিল ঠিকই কিন্তু তা এখান থেকে ছয় যোজন দূরে অবস্থিত শ্রাবস্তীতে (সহেট মহেট)। প্রসেনজিতের জামাতা অজাতশত্রু কোশলের স্বাধীনতা হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবস্তীরও সৌভাগ্য রাশি বিলুপ্ত হয়ে গেল। অতীত কালেও সরযূতটে অবস্থিত সাকেত পূর্ব (প্রাচী) থেকে উত্তরের (পাঞ্জাব) যোগাযোগ পথে অবস্থিত থাকার দরুণ শুধু জলপথের বাণিজ্য। জন্যই নয় স্থলপথের বাণিজ্যেরও এক বড় কেন্দ্র ছিল। বহুদিন পর্যন্ত তার এই অবস্থা অটুট ছিল। বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধ রাজ্যকে প্রথমে তক্ষশিলা পর্যন্ত, পরে যবনরাজ শৈলাক্ষ (সেলুকাস)কে পরাজিত করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা (আফগানিস্থান) থেকে সুদূর পশ্চিমে হিরাত এবং আমু সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও তার মৌর্য্য বংশের শাসনেও সাকেত বাণিজ্যকেন্দ্রের বেশী আর কিছু হতে পারে নি। মৌর্যবংশধ্বংসকারী সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রথম প্রথম সাকেতকে রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু তাও সম্ভবতঃ পাটলীপুত্রের প্রাধান্যকে ক্ষুন্ন করে নয়। পুষ্যমিত্র অথবা তার শুংগ বংশের শাসনকালে বাল্মিকী যখন তার রামায়ণ রচনা করে তখন অযোধ্যা নাম প্রচারিত হল। এইভাবেই সাকেত অযোধ্যা বলে পরিচিত হয়। এতে কোনো সন্দেহই নেই যে অশ্বঘোষ বাল্মিকীর মধুর কাব্যের রসাস্বাদন করেছিল। কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত কবি ছিল, তেমনি বাল্মিকীও যদি কখনো শুংগ বংশের আশ্রিত কবি থেকে থাকে; অথবা কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং কুমারগুপ্ত এই দুই পিতা পুত্রকে তার 'রঘুবংশে' রঘু এবং 'কুমার সম্ভবে' কুমার রূপে চিত্রিত করেছে, তেমনি বাল্মিকী যদি শুংগ বংশের রাজধানীর মহিমাকে উন্নীত করবার জন্যই তার জাতকের দশরথের রাজধানীকে বারানসী থেকে সরিয়ে সাকেত বা অযোধ্যায় এনে থাকে এবং শুংগসম্রাট পুষ্যমিত্র বা অগ্নিমিত্রকেই রামরূপে মহিমান্বিত করে থাকে—তবে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

সেনাপতি পুষ্যমিত্র আপন প্রভুকে নিধন করে সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্যকে অধিকার করতে সমর্থ হয়নি। সারা পাঞ্জাব যবনরাজ মিনান্দরের দখলে চলে গেল; এবং পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ব্রাহ্মণ পতঞ্জলির বিবরণ অনুযায়ী একবার ত মিনান্দর

সাকেতকেও অধিকার করে ফেলেছিল। এ থেকে এটা-ই বোঝা যায় যে পুষ্যমিত্রের শাসনকালের সূচনাতেও সাকেতের বিশেষ একটা মাহাত্ম্য ছিল এবং পতঞ্জলি—পুষ্যমিত্রের সময়ে এই নগরের নাম সাকেতই ছিল—অযোধ্যা নয়।

পুষ্যমিত্র, পতঞ্জলি এবং মিনান্দরের সময় থেকে আমরা আরও তুশ বছর পিছিয়ে আসছি। এই সময়েও সাকেতে বড় বড় শ্রেষ্ঠী (শেঠ) বসবাস করত। লক্ষ্মীর বসতির ফলে সরস্বতীরও অল্পবিস্তর আগমন হতে লাগল এবং ধর্ম ও ব্রাহ্মণের বেশ স্বভাবতঃই এসে পড়ল। এই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধন-বিদ্যা সম্পন্ন একটি কুল ছিল। এই কুলাধিপতির নাম মুছে গিয়েছে কালের প্রবাহে, কিন্তু কুলাধিপত্নীর নাম অমর করে রেখেছে তার পুত্র। এই ব্রাহ্মণীর নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী তার চোখ ছিল সোনার মত কাঁচাহলুদ রংএর। তৎকালে কাঁচাহলুদ রং বা নীল রংএর চোখ সারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যেত এবং কাঁচাহলুদ রংয়ের চোখ থাকা কোনো দোষের ছিল না। ব্রাহ্মণী সুবর্ণাক্ষীর এক পুত্র তার মতই সুবর্ণনেত্র এবং পিঙ্গল কেশধারী ছিল। তার গায়ের রং ছিল মায়ের মতই সুগৌর।

২

বসন্তকাল। আমের মঞ্জরী চারিদিকে আপন সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বৃক্ষরাজি পুরানো পত্রসমূহ ত্যাগ করে নতুন পত্রাবলীতে ভূষিত হয়েছে। চৈত্রের শুক্লানবমী তিথি। সাকেতের নরনারী সন্তরণ প্রতিযোগিতার জন্য সরযূতীরে সমাবিষ্ট হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সাকেতবাসিগণ বসন্তোৎসব পালন করে থাকে। এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় তরুণ তরুণী উভয়েই একঘাটে নগ্নদেহে একত্রে অংশ গ্রহণ করে। তরুণীদের মধ্যে বহুসংখ্যক কর্পূরশ্বেত অঙ্গশালিনী যবনী (গ্রীক স্ত্রী) ছিল, যাদের সুন্দর-সুডৌল দেহ যবন চিত্রকর নির্মিত অনুপম মর্মরমূর্তির অনুরূপ, যার উপর পিঙ্গলকেশরাজি এক মনোরম রূপে প্রতিভাত হচ্ছিল।

আর ছিল নীল বা পীত কেশধারিণী সুবর্ণাক্ষী ব্রাহ্মণকুমারীগণ, সৌন্দর্যের দিক থেকে তারা যবনীদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এ ছাড়া ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশবিশিষ্টা ধূসরবর্ণা বহুসংখ্যক বৈশ্য তরুণী, তাদের তারুণ্যের মাদকতাও কম আকর্ষণীয় ছিল না। আজকের এই দিনে সাকেতের প্রতিটি কোণ থেকে কৌমার্যরূপরাশি সরযূতীরে এসে একত্রীভূত হয়েছে। তরুণীদের মত নানা কুলের তরুণেরাও গাত্রাবরণ উন্মোচন করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের ব্যায়ামপুষ্ট সুডৌলসুন্দর দেহ কর্পূরশ্বেত ধূসর প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট ছিল। তাদের সবারই

কেশ পাশে মুখমণ্ডলে এবং নাসিকায় নিজ নিজ কুলের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তরুণ তরুণীদের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য আজকের এই প্রতিযোগিতা মহোৎসবের চেয়ে বড় আর কোনো উৎসবেরই অনুষ্ঠান হত না। প্রতিবছর এই উৎসবের ভিতর দিয়ে কতজনেই না স্বয়ংবরা হয়ে উঠত। বাপ-মায়েরা এ বিষয়ে তরুণ তরুণীদের উৎসাহিতই করতেন। তখনকার দিনে এমনি ছিল শিষ্টাচার।

নৌকা থেকে প্রতিযোগী তরুণ-তরুণীরা সরযূর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরযূর নীল জলে কেউ কেউ নীল বা কালো কেশরাশিকে জলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে দু হাতে জল কেটে কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। এদের কাছে কাছে থেকে বহু ক্ষুদ্র নৌকা চলেছে। নৌকার আরোহীরা তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দিচ্ছে বা কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে নৌকায় তুলে নিচ্ছে। হাজার হাজার সন্তরণকারীর মধ্যে কারও কারও পক্ষে ক্লান্ত হয়ে হার স্বীকার করাই স্বাভাবিক ছিল। সকল প্রতিযোগীই সর্বাগ্রে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। নদীতটে পৌঁছুবার যখন কিছুটা মাত্র বাকী এক তৃতীয়াংশ নদী, তখন বহু প্রতিযোগীই শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। শেষে দুজন প্রতিযোগী—একজনের কেশরাশী পিঙ্গল, অপরজনের পাণ্ডুশ্বেত, সবার আগে যাবার চেষ্টা করছে দেখা গেল। নৌকার আরোহীরা রুদ্ধশ্বাসে তাদের দেখতে লাগল। তারা দেখল যে পিঙ্গল এবং পাণ্ডুশ্বেতকেশী দুজনেই সকলের আগে গিয়ে সমগতিতে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করেছে। তীরের দিকে আরও এগিয়ে গেল তারা, সকলেই ভাবছিলো, এদের ভেতর থেকে একজন আগে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেখল দুজনের গতিই সমতালে চলেছে। সম্ভবতঃ নৌকাআরোহীদের কেউ কেউ এ-ও শুনল যে, ওদের মধ্যে একজন অপরকে আগে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে।

দুজনে একসাথেই তীরে এসে পৌঁছুল। এদের মধ্যে একজন তরুণ অপরজন তরুণী। উপস্থিত সকলেই হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাল। ওরা দুজন আপন আপন পরিধান তুলে নিয়েছে। দর্শকেরা সোৎসাহে পুষ্পবর্ষণ করছে তরুণ-তরুণী দুজন পরস্পরকে কাছ থেকে দেখছিল। উপস্থিত সকলে তাদের শুধু সন্তরণ কৌশলেরই নয়, সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করতে লাগল। কে একজন প্রশ্ন করলো—"কুমারীকে ত আমি চিনি, কিন্তু কে এই তরুণ সৌম্য?"

"সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষের নাম শোননি?"

"না, আমি নিজ পুরোহিত কুলকেই শুধু জানি। আমরা হলাম ব্যবসায়ী, এত খবর রাখবার ফুরসৎ কোথায়?"

তৃতীয়জন বলল—"আরে সাকেত থেকে অশ্বঘোষের বিদ্যার খ্যাতি দূরদূরান্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সমস্ত বেদ এবং সকল বিদ্যাতেই পারদর্শী।"

প্রথম—"কিন্তু এর বয়স ত চব্বিশের বেশী হবে না।"

তৃতীয়—"হ্যাঁ, এইরকমই হবে। এর কবিতা লোকে সুর করে করে পড়ে আর গায়।"

দ্বিতীয়—"এই কি সেই কবি অশ্বঘোষ যার প্রেমগীতি আমাদের তরুণ-তরুণীদের মুখে মুখে ফেরে ?"

তৃতীয়—"হ্যাঁ, এই সেই অশ্বঘোষ। কিন্তু কুমারীর কি নাম সৌম্য ?"

প্রথম—"সাকেতে আমাদের যবন-কুল-প্রমুখ এবং কোশলের বিখ্যাত স্বার্থবাহী দত্তমিত্রের পুত্রী প্রভা।"

দ্বিতীয়—"তাই বল। এরকম সৌন্দর্য অন্যের ভিতর কমই দেখা যায়। দেহের গড়ন কি কোমল মনে হয়, অথচ সাঁতারে কি পটু !"

প্রথম—"এর মা-বাপ দুজনেরই চমৎকরার স্বাস্থ্য, দুজনেই বেশ বলিষ্ঠ দেহ।"

নগরোদ্যানে গিয়ে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে লোকের সামনে এই দুই প্রতিযোগীর পবিচয় দেওয়া হল, এবং এরা দুজনে লজ্জাবনত মুখে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হল।

৩

সাকেতের পুষ্যোদ্যান (পুষ্পোদ্যান) ছিল পুষ্যমিত্রের শাসনের স্মারক। এর নির্মাণ কাজে সেনাপতি প্রচুর অর্থ এবং শ্রম নিয়োগ করেছিলেন। যদিও আজ পুষ্যমিত্র বংশের রাজ্য আব নেই, সাকেতও অন্য কোনো শ্রেণীর রাজধানীতে পরিণত হয়নি তবু নৈগম (নগর-সভা)কে সাকেতের গৌরব মনে করে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, যেমন রাখা ছিল দুশ' বছর আগে পুষ্যমিত্রের শাসনকালে। উদ্যানের মধ্যস্থলে এক সুন্দর পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীল জলে পদ্ম, সরোজ, পুণ্ডরীক ইত্যাদি নানাবর্ণের কমল প্রস্ফুটিত হয়ে থাকতো এবং হংস মিথুনেব দল সাঁতার কেটে ফিবতো, চাবিদিকে শ্বেতপাথরের ঘাট বাঁধানো ছিল যার সোপানশ্রেণী স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। সরোবরের ধার ঘেঁষে সবুজ দূর্বাচ্ছাদিত প্রশস্ত তটভূমি। এর উপর কোথাও গোলাপ, জুঁই, বেল ইত্যাদি ফুলের কেয়ারি, আবার কোথাও তমাল, বকুল, অশোকরাজিব ছায়া আর কোথাও বা লতাগুল্মে ঘেরা কুমার-কুমারিগণেব ক্রীড়া ক্ষেত্র। উদ্যান মধ্যে মাটি-পাথর আর সবুজে আচ্ছাদিত কয়েকটি মনোরম ক্রীড়া পাহাড়। উদ্যানের কোনো কোনো জায়গায় ফোয়ারা থেকে ঝরণা ধারায় জল উৎসারিত হচ্ছে।

অপরাহ্ণে প্রায়ই এক লতাগুচ্ছের কাছে সাকেতের তরুণ-তরুণীদিগের ভিড় লেগে যেত, যারা ভিতরে স্থান পেত না তারাই এখানে ভিড় জমাতো, আজও এখানে ভিড় ছিল, কিন্তু চারিদিককার নীরবতার মাঝে। সকলেই লতাগুচ্ছের দিকে কান পেতে ছিল, আর লতাগুচ্ছের একেবারে ভিতরে। শিলাচ্ছাদিত আসনে বসে রয়েছে সেই তরুণ, একমাস আগে যে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করেছিল।

তার দেহে মসৃণ সূক্ষ্ম কাপড়ের জামা। তার দীর্ঘ পিঙ্গল কেশরাশি মাথার উপরে জটার আকারে বাঁধা, হাতে তার মুখর বীণা—তরুণের আঙ্গুল স্বচ্ছন্দ গতিতে মনোহর সুরসৃষ্টি করে চলেছে! অর্ধমুদ্রিত নয়নে ঢিমা লয়ে স্বরচিত কোন গীত গেয়ে চলেছে তরুণ, সবে সে "বসন্ত-কোকিলের" গীত সংস্কৃতে গেয়ে শেষ করল, সংস্কৃতের পরে প্রাকৃত গীত গাওয়ার তাগিদ ছিল, কারণ গায়ক-কবি জানে যে তার শ্রোতাদের মধ্যে প্রাকৃত-প্রেমিকের সংখ্যাই বেশী। কবি নিজের নবরচিত "উর্বশী-বিয়োগ" গেয়ে শোনাল—উর্বশী লয়প্রাপ্ত হয়ে গেল আর পুরূরবা উর্বশীকে অপ্সরা (জলবিহারিণী) বলে ডাকতে ডাকতে পর্বত, সরোবর, বন, গুল্ম সকল জায়গায় খুঁজে ফিরতে লাগল, অপ্সরার দর্শন সে পেল না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বায়ুভরে ভেসে গেল তার কানে। পুরূরবার অশ্রুবর্ষণের জায়গা গাওয়ার সময় গায়কের চোখ থেকেও জল গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সেই সাথে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীও অভিভূত হয়ে পড়ল।

সংগীত শেষ হবার পর এক এক করে সবাই চলে যেতে লাগল। অশ্বঘোষ বাইরে এলে কিছু তরুণ-তরুণী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে আর্দ্র আরক্ত নয়না প্রভাও ছিলো। একজন তরুণ এগিয়ে এসে বলল, "মহাকবি!"

"মহাকবি! আমি যে কবিই নই সৌম্য!"

"আমাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করেতে দাও কবি! সাকেতে আমাদের যবনদের ছোট মত এক নাট্যশালা রয়েছে।"

"নাচের জন্য? আমারও নাচের সখ আছে।"

"নাচের জন্যই শুধু নয়, ওখানে আমরা অভিনয়ও করে থাকি।"

"অভিনয়!"

"হ্যাঁ কবি, কিন্তু যবন-রীতির অভিনয়ে এক বিশেষত্ব আছে। তাদের অভিনয়ে বিভিন্ন স্থান-কালের পরিচায়ক বড় বড় চিত্রপট থাকে আর সমস্ত ঘটনাকেই বাস্তবের রূপে দেখবার চেষ্টা করা হয়।"

"কি আফসোসের কথা, সৌম্য! সাকেতে জন্মগ্রহণ করেও আমি এমন অভিনয় দেখলাম না!"

"আমাদের অভিনয়ের দর্শক এখানকার যবন পরিবার এবং কিছু ইষ্ট মিত্র—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এজন্য বহু সাকেতবাসী যবন-অভিনয়,—"

"নাটক বলা উচিৎ, সৌম্য!"

"হ্যাঁ, যবন-নাটক। আজ আমরা এক নাটক করব। আমরা চাই যে তুমিও আমাদের নাটক দেখ।"

"নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সঙ্গে। তোমাদের মত মিত্রমণ্ডলীর অসীম অনুগ্রহ।"

অশ্বঘোষ এদের সংগে চলল। নাট্যশালায় রঙ্গমঞ্চের কাছে তাকে স্থান দেওয়া হল। অভিনয় হচ্ছিল কোনো এক যবন (গ্রীক) বিয়োগান্ত নাটকের এবং তা হচ্ছিল প্রাকৃত ভাষায়, যবন কুলপুত্র-পুত্রীগণ বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করছিল।

অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের পোষাক পরিচ্ছদও ছিল যবন-দেশীয়দের মত। বিভিন্ন দৃশ্যপটগুলোও যবনরীতি অনুযায়ী অঙ্কিত ছিল। নায়িকার চরিত্র অভিনয় করছিল অশ্বঘোষের পরিচিতা প্রভা। তার অভিনয় কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। অভিনয়ের মাঝে একবার সুযোগমত বিরতির সময় পূর্বপরিচিত যবন তরুণ "উর্বশী-বিয়োগ" গানের অনুরোধ জানাল। কোনোরকম আপত্তি না করে বীণা হাতে অশ্বঘোষ রঙ্গ-মঞ্চের উপর উঠে এল। তারপর স্বরচিত গানের গভীরতায় স্বয়ং কাঁদল অপরকেও কাঁদাল। এই সময় তার দৃষ্টি একবার প্রভার করুণ দৃষ্টিতে গিয়ে মিলেছিল।

নাটক শেষ হয়ে যাবার পর নেপথ্যে সমস্ত অভিনেতা কুমার-কুমারীদের সঙ্গে কবির পরিচয় করান হল। অশ্বঘোষ বলল—"সাকেতে থেকেও আমি এই অনুপম কলা সম্বন্ধে অজ্ঞ রয়ে গেছি। মিত্রমণ্ডলীর কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞ যে তোমরা আমাকে এক অজ্ঞাত প্রভালোক দর্শন করালে।"

"প্রভালোক" কথাটি উচ্চারণ করার সময় কয়েকজন তরুণী প্রভার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। অশ্বঘোষ পুনরায় বললো—

"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। তোমরা যেমন আজ যবন-নাটকের প্রাকৃত রূপান্তর অভিনয় করলে, আমার মনে হয়, তেমনিভাবে আমরা স্বদেশের কথা নিয়ে চমৎকার নাটক সৃষ্টি করতে পারি।"

"আমাদেরও পূর্ণ আস্থা আছে কবি, তুমি ইচ্ছা করলে মূল যবন-নাটক থেকেও ভালো নাটক রচনা করতে পারো।"

"এতটা বলো না, সৌম্য! যবন-নাট্যকারের শিষ্য হওয়ার যোগ্যতাই যথেষ্ট, আমি তাই হতে চেষ্ট করব। আচ্ছা আমি যদি উর্বশী-বিয়োগ নিয়ে এক নাটক লিখি?"

"তাহলে আমরা তার অভিনয়ও করতে প্রস্তুত, কিন্তু পুরূরবার চরিত্র তোমাকেই অভিনয় করতে হবে।"

"আমার আপত্তি হবে না, আর মনে হয় সামান্য অভ্যাস করে নিলে আমি কিছু খারাপও করব না।"

"আমরা চিত্রপটও তৈরী করিয়ে নেব।"

"চিত্রপটের উপর আমাদের পুরূরবার দেশের দৃশ্য অঙ্কিত করতে হবে। চিত্র অঙ্কণ আমিও কিছু কিছু করি। সময় পেলে এতেও আমি সাহায্য করতে পারব।"

"তোমার নির্দেশমত দৃশ্য অঙ্কণ করাই ভালো হবে। পাত্র-পাত্রী বেশভূষা সম্বন্ধেও তোমাকেই নির্দেশ দিতে হবে, সৌম্য! আর পাত্র-পাত্রী নির্বাচন?"

"পাত্র-পাত্রী তো এখনই ঠিক করা যাবে না, সৌম্য! তবে তাদের সংখ্যা কম রাখতে হবে। কত রাখা উচিত?"

"ষোলো থেকে কুড়ি পর্যন্ত আমরা নির্বিঘ্নেই তৈরী করতে পারব।"

"আমি ষোলো পর্যন্তই রাখবার চেষ্টা করব।"

"পুরূরবা তো তুমিই সাজবে, সৌম্য! আর উর্বশী-চরিত্র আমাদের প্রভাকে দিয়ে কেমন হবে? আজ ত তুমি দেখেছ তার অভিনয়।"

"আমার অনভ্যস্ত চোখে ত নিখুঁতই মনে হয়েছে তার অভিনয়।"

"তাহলে প্রভাকেই উর্বশী হতে হবে। আমাদের দলে যাকে যা দেওয়া হবে তাকে তাই করতে হবে।"

প্রভার চোখ কুঞ্চিত হয়ে উঠছিলো একটু, কিন্তু দলপতি তরুণের "কি প্রভা!" বলার পর সংযত হয়ে জবাব দিলো সে, "হ্যাঁ"।

৪

অশ্বঘোষ, যবন তরুণ দল প্রমুখ বুদ্ধপ্রিয়ের সাথে কয়েকটি যবন নাটকের প্রাকৃত রূপান্তর পড়লো এবং তাদের স্থান ইত্যাদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করল। যবন (গ্রীক) কলাবিদ্যাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য নাটকের চিত্রপট সমূহের নামকরণ করল সে যবনিকা। সংস্কৃত-প্রাকৃত, গদ্যপদ্য দুরকমভাবেই লিখল সে। এই সময় প্রাকৃত-সংস্কৃতের এতটা আবেদন ছিল যে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে তা অনায়াসবোধ্য ছিল। এই "উর্বশী-বিয়োগ" হল প্রথম ভারতীয় নাটক এবং অশ্বঘোষ হল প্রথম ভারতীয় নাট্যকার। এটাই ছিল কবির প্রথম প্রয়াস, তবু তা তার পরবর্তী "রাষ্ট্রপাল," "সারিপুত্ত" ইত্যাদি নাটক থেকে কম সুন্দর হয়নি।

রঙ্গমঞ্চ তৈরীর সময় অভিনয় অভ্যাসকালে খাওয়াদাওয়ার কথাও মনে থাকত না তরুণ কবির। এই সময়গুলোই সে-জীবনের সুন্দরতম সময় বলে মনে করত। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভা আর সে পরস্পরের সঙ্গলাভ করত। সাঁতারের প্রতিযোগিতার দিন তাদের হৃদয়ে যে প্রেমবীজ রোপিত হয়েছিল এখন তাই অঙ্কুরিত হতে থাকল ধীরে ধীরে, যবন তরুণ-তরুণীগণ অশ্বঘোষকে আত্মীয়র মতই দেখতে চাইত, কাজেই এ ব্যাপারে সহায়ক হওয়াই তারা সৌভাগ্য মনে করত। একদিন অশ্বঘোষ নাট্যশালার বাইরে অবস্থিত ক্ষুদ্র উদ্যানে এসে একটা আসনের উপর বসল। এই সময় প্রভাও সেখানে এল। প্রভা তার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলল—

"উর্বশী-বিয়োগ গীত রচনা করবার সময় তোমার মনে কি ছিল কবি?"

"উর্বশী আর পুরূরবার কাহিনী।"

"কাহিনী ত আমিও জানি, কিন্তু উর্বশীকে অপ্সরারূপে তুমি বার বার সম্বোধন করছিলে!"

"উর্বশী যে অপ্সরাই ছিল, প্রভা!"

"তা ছাড়া তুমি উর্বশীর বিয়োগের পর নদী, সরোবর, পর্বত, বন সব কিছুতে পুরূরবাকে বিহ্বল অন্বেষণকারীরূপে চিত্রিত করেছ।"

"পুরূরবার ঐ অবস্থায় এই-ই স্বাভাবিক ছিল।"

"সব শেষে উর্বশী-বিয়োগের গায়ক লতাকুঞ্জে বসে অশ্রুধারাকেও বীণার মত গীতসঙ্গী করে নিয়েছিলে।"

"গায়ক ও অভিনেতার এমনি তন্ময়ভাব এসে যাওয়াই স্বাভাবিক, প্রভা!"

"উঁহু, তুমি আমাকে ঠিক সত্যি কথাটাই বলতে চাইছ না।"

"কেন? তোমার কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয়, তুমি পুরাণের কোন উর্বশীর গান করনি।"

"তবে?"

"তোমার উর্বশী ছিল—উর-বশী (হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী), আর সেই অপ্সরা ছিল—অপ = সরযুর জল, সরা = সন্তরণকারিণী।"

"তারপর?"

"তোমার উর্বশীকে পুরূরবা হিমালয়ের মত পর্বত বা কোনো বনভূমি, নদী, সরোবর, লতাকুঞ্জ এসবে খুঁজে ফেরেনি, তোমার পুরূরবা উর্বশীকে খুঁজে ফিরেছিল সাকেতের সরযূ নদীতে, পুষ্পোদ্যানের ভিতরকার সরোবর, ক্রীড়া পাহাড়, বনরাজি আর লতাগুল্মের ভিতরে।"

"তারপর?"

"পুরাণোল্লিখিত কোনো পুরূরবার দুঃখে বিগলিত হয়ে তোমার চোখের জল ঝরেনি, জল ঝরেছিল সে দিন তোমার নিজেরই তপ্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করতে।"

"এবারে আমিও একটা কথা বলব প্রভা!"

"বল, এতক্ষণ ত আমিই অনর্গল কথা বলে গেলাম।"

"সেদিন লতাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আমি তোমার এই মনোহর নীল নয়ন দুটি আমার চেয়েও আরক্ত এবং সিক্ত দেখেছিলাম।"

"তোমার গান দিয়ে আমাকে কাঁদিয়েছিলে তুমি।"

"তোমার বিরহ দিয়েই আমাকে গীত রচনায় তুমি উদ্বুদ্ধ করেছ।"

"কিন্তু, তোমার গানের উর্বশী পাষাণী ছিল কবি! অন্তত তুমি সেই ভাবেই তাকে চিত্রিত করেছিলে।"

"তার কারণ আমি ব্যাকুল হয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম।"

"কি ভেবে?"

"আমি কোনোদিন এই অচিরপ্রভা (বিদ্যুত)কে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করব না সে কবেই হয়ত ভুলে গেছে আমাকে।"

"তুমি এতটা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলে কবি?"

"যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসের অন্য কোনো অবলম্বন না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিজেকে নিঃস্ব ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না প্রভা।"

"তুমি শুধু সাকেতরই নও, আমাদের এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মহিমান্বিত কবি। সাকেতের সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিজেতা বীর তুমি। তোমার বিদ্যার খ্যাতি সাকেতবাসীর মুখে মুখে। আর তোমার সম্পর্কে নারীর মনোভাব বলতে গেলে বলতে হয় সাকেতের সুন্দরিগণ তোমাকে নিজ নিজ চোখের তারা করে ধরে রাখতে চায়।"

"কিন্তু ওসবে কি হবে? আমার কাছে ত আমার উর্বশীই সবটুকু ছিল। যখন দু সপ্তাহ তার দেখা পেলাম না, আমার মনে হতে লাগলো যেন এ জীবনের কোনোই মূল্য নেই। সত্যি বলছি, প্রভা আমি আমার হৃদয়কে এত দুর্বল হয়ে পড়তে আর কখনো দেখিনি। আর এক সপ্তাহ যদি তোমাকে দেখতে না পেতাম ত কি করে বসতাম বলতে পারিনা।"

"এত স্বার্থপর তুমি হয়ো না কবি। তুমি তোমার দেশের এক অমর গায়ক-কবি। দেশ তোমার কাছে এখনও কত আশা রাখে, তুমি জানো তোমার এই 'উর্বশী-বিয়োগ' নাটকের কত খ্যাতি?"

"আমি ত শুনিনি।"

"গত সপ্তাহে আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু ভরুকচ্ছ (ভড়ৌচ) থেকে এখানে এসেছিল ভরুকচ্ছতে যবন নাগরিকেরা বহু সংখ্যায় বাস করে। আমরা সাকেতের যবনেরা (য়ুনানী) ত হিন্দু বনে গেছি, কিন্তু ভরুকচ্ছবাসী যবনেরা আপন ভাষা বিস্মৃত হয়নি। যবন দেশগুলো থেকে ভরুকচ্ছতে ব্যবসায়ী এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের আগমন হয়ে থাকে। আমার এই বন্ধুটি যবন সাহিত্যের এক ভক্ত পণ্ডিত, সে তোমার এই নাটকের অনুলিপি শ্রেষ্ঠ দুই যবন নাট্যকার এমস্পীদোকল এবং য়ুরোপিদ্‌-এর প্রতিভার কাছে সমর্পণ করে। তাঁরা এই নাটক নিয়ে গেছেন, বলেছেন মিশ্রের রাজা তুরমায় (তালেমী) একজন বড় নাট্যপ্রেমিক তাঁর কাছে এটা যবন ভাষায় অনুবাদ করে পাঠাবেন তাঁরা, ভরুকচ্ছ থেকে মিশ্র রাজার ওখানে অনবরতই জলপোত যাতায়াত করে। এইসব কথা যখন আমার কানে এল, তখন অসীম গর্বে আমার বুক ভরে উঠ্‌ল।"

"তোমার হৃদয়ের এই গর্বটুকুই আমার জীবন সর্বস্ব, প্রভা!"

"তোমার নিজের মূল্য তুমি জানো না কবি।"

"আমার এই মূল্যের উৎস তুমিই ছিলে প্রভা! এখন আর আমার অজানা নেই তা'।"

"না, না, এরকম করা উচিৎ নয় তোমার। প্রভার প্রেমিক অশ্বঘোষ আর মহান্ যুগ-কবি অশ্বঘোষকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখাই তোমার কর্তব্য। প্রভার প্রেমিক অশ্বঘোষের জন্য যা কিছু চাও করো, কিন্তু মহান্ কবিকে এর অনেক উর্ধ্বে উঠতে হবে, সমগ্র বিশ্বের দরবারে তার প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

"তুমি যেমন বলবে তেমনি আমি মেনে চলবো প্রভা।"

"নিজেকে আমি এত বড় সৌভাগ্যশালিনীরূপে কখনই কল্পনা করতে পারিনি।"

"কেন ?"

"মনে হত, তুমি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকবে।"

"এত সাধারণ ছিলে তুমি ?"

"তোমার সামনে তাই ছিলাম, এখনও আছি।"

"তোমার ভেতর কবিতার এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলাম আমি। আমার কবিতায় এখন নতুন প্রেরণা, নতুন আনন্দ লাভ করব আমি। 'উর্বশী-বিয়োগ' গীত আর এই নাটক দুই-ই তোমার প্রেরণায় প্রাণবন্ত। নাটককে আমি দেশের নিজস্ব বস্তুরূপে গড়ে তুলছি প্রভা! কিন্তু তুমি কি দিয়ে বুঝলে প্রভা যে তোমাকে আমি ভুলে যাব ?"

"কোনোদিক থেকেই আমি নিজেকে তোমার কাছে উপস্থিত করবার উপযুক্ত ভাবতে পারিনি। তারপর এক এক করে যখন তোমার গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ-পরিচয় লাভ করলাম তখন তোমার সাথে সাক্ষাতের আশা একেবারেই ত্যাগ করলাম। সাকেতের সুন্দরীদের একে একে শুধু তোমার নামেই উন্মাদ হয়ে উঠতে দেখলাম—এথেকেও নিশ্চয়ই আশা করবার কিছু ছিল না। তাছাড়া, শুনেছিলাম তুমি উচ্চকুল, জাত ব্রাহ্মণ। যদিও আমি ব্রাহ্মণকুলের পরবর্তী উচ্চকুলজাত যবন-রাজপুত্রের কন্যা, তবু যে ব্রাহ্মণকুল মাতা-পিতা থেকে সাত পুরুষ উর্ধ্বপর্যন্ত সম্পর্কিতের ভিতর বিবাদানুষ্ঠান করে না। সেই কুলজাত ব্রাহ্মণ কি করে আমার প্রেমকে স্বাগত জানাবে ?"

"বড় দুঃখের বিষয় প্রভা যে, অশ্বঘোষ তোমার হৃদয়কে এইভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল।"

"তাহলে তুমি—" প্রভা বলতে বলতে থেমে গেল।

প্রভার অশ্রুপূর্ণ নয়ন চুম্বন করে, তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে অশ্বঘোষ বলল—

"অশ্বঘোষ চিরদিন তোমারই থাকবে প্রভা। কাল থেকেই তুমি আর তাকে পর ভাবতে পারবে না।"

প্রভার দুই চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর অশ্বঘোষ তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সেই জল মুছে দিতে লাগল।

"উর্বশী-বিয়োগ" একাধিকবার অভিনীত হয়ে গেল অতি চমৎকার ভাবে। সাকেতের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নরনারী এই নাটক দেখল। এর আগে তারা কোনো দিন ভাবতেই পারেনি যে নাট্যকলা এত পূর্ণ, অভিনয় এত উচ্চ শ্রেণীর হতে পারে। শেষ দৃশ্যে যবনিকা পতনের পর কয়েকবারই অশ্বঘোষ উঠে বলেছেন যে আমি এই নাটকের সবকিছুই যবন রঙ্গমঞ্চ থেকে সংগ্রহ করেছি; কিন্তু তার নাটক এতটা স্বদেশী প্রভাবাপন্ন ছিল যে কেউ-ই তার কোনখানে বিদেশী প্রভাবের এতটুকুও গন্ধ পায়নি।

অশ্বঘোষের সংস্কৃত-প্রাকৃত গীত এবং কবিতা সাকেত এবং কোশলের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার নাটক ছড়িয়ে পড়ল আরও অধিক দূর অবধি। উজ্জয়িনী, দশপুর, সুপ্পারক, ভরুকচ্ছ, শাকলা (শিয়ালকোট), তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র ইত্যাদির

মত মহানগরীর যেখানে বহুল সংখ্যায় যবন এবং তাদের নাট্যশালা রয়েছে, সে সব জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অশ্বঘোষের নাটক এবং রাজা-রাজড়া, ব্যবসায়ী সকলের দ্বারা সমানভাবে, সমাদৃত হল।

৫

রঙ্গমঞ্চে অশ্বঘোষের অভিনয় এবং যবন কন্যার সাথে তাঁর প্রেমের ব্যাপার অশ্বঘোষের পিতা-মাতার কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। কথাটা শুনে অশ্বঘোষের পিতা রীতিমত চিন্তিত হলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে সুবর্ণাক্ষীকে বুঝিয়ে বললেন। মাতা যখন বললেন যে, আমাদের ব্রাহ্মণকুলের পক্ষে এমন সম্বন্ধ করা অধর্ম, তখন ব্রাহ্মণধর্মের সমগ্র বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অশ্বঘোষ মাতাকে পুরাণ থেকে ঋষিদের আচরণের শত শত প্রমাণ দিল (যার থেকে কিছু অংশ পরে সে নিজের 'বজ্রছেদিকা'য় লিপিবদ্ধ করেছে—যা আজও বজ্রচ্ছদিকোপনিষদ নামে উপনিষদাবলীর অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে।) কিন্তু মা বললেন, "এসব ত ঠিকই বাবা, কিন্তু আজকের ব্রাহ্মণেরা এই পুরাণোক্ত আচরণকে মানতে চায় না।"

"তা হলে ব্রাহ্মণদের জন্য আমি এক নতুন সদাচার উপস্থিত করব।"

মা অশ্বঘোষের যুক্তিসমূহতে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, কিন্তু যখন সে বলে বসল যে প্রভাব আর আমার জীবন কখন স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না, তখন তিনি পুত্রের পক্ষে রায় দিয়ে বললেন,—

"তুই-ই আমার যথাসর্বস্ব বাবা।"

অশ্বঘোষ একদিন প্রভাকে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিল। মা তার রূপ আর গুণের সমান পরিচয় পেয়ে এবং তাব বিনম্র স্বভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু অশ্বঘোষের পিতা একে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না। তিনি একদিন অশ্বঘোষকে সোজা বললেন,—"পুত্র, আমাদের শ্রোত্রীদের শ্রেষ্ঠ হল ব্রাহ্মণকুল। পঞ্চাশ পুরুষ থেকে শুধু কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যারাই আমাদের ঘরে বধূরূপে আসছে। আজ যদি তুমি এই সম্বন্ধমত বিবাহ কর ত আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা চিরকালের জন্য জাতিভ্রষ্ট হয়ে থাকব। আমাদের সমস্ত মান-মর্যাদা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।"

কিন্তু অশ্বঘোষের পক্ষে প্রভাকে ত্যাগ করা ছিল একেবারেই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

এরপর অশ্বঘোষের পিতা প্রভার পিতামাতার কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করলেন, কিন্তু তাঁদের কিছুই করবার ছিল না। পরিশেষে তিনি প্রভার কাছেই তাঁর আর্জি পেশ করলেন। প্রভা শুধু এইটুকুই বলল যে, "আমি অশ্বঘোষের কাছে আপনার কথা বলব।"

প্রভা আর অশ্বঘোষ পরস্পরের অভিন্ন ।থী ছিল। কি সরযূতীর, কি পুষ্পোদ্যান, কি যাত্রা-উৎসব, কি নৃত্যশালা-নাট্যশালা কি অপর কোনো জায়গায় একজন থাকলে আর একজনও থাকবেই, সূর্যের প্রভার মতই প্রভা অশ্বঘোষের হৃদয়-পদ্মকে বিকশিত করে রেখেছিল। রূপালী চাঁদের আলোয় প্রায়ই তারা সরযূতীরে যেত। সেখানে তারা শুধু প্রণয় লীলাতেই সময় অতিবাহিত করত না, জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। এমনি এক জ্যোৎস্নালোকে একদিন সরযূর কালো জলের ধারে শ্বেত শিলাসনে উপবিষ্ট হয়ে অশ্বঘোষ আপন মানসপটে প্রভার চিত্র অঙ্কন করছিল, তার মুখ থেকে পর পর বেরিয়ে এল—"প্রভা তুমি আমার কবিতা। তোমারই প্রেরণা পেয়ে আমি উর্বশী-বিয়োগ লিখেছি। তোমার এই রূপরাশি আমাকে বহু সুন্দর কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করছে। কবিতা হল অন্তরের অভিব্যক্তি, বাইরের জিনিস নয়; কিন্তু বাইরের অভিব্যক্তিই যে অন্তরে বিকশিত হয় এ তত্ত্ব তুমিই আমাকে শিখিয়েছ প্রিয়ে।"

অশ্বঘোষের কথা শুনতে শুনতে প্রভা সেই শীতল শিলাসনের ওপর শুয়ে পড়ল। তার পরিচ্ছন্ন দীর্ঘ কেশরাজি বালুর উপর লতিয়ে পড়তে দেখে অশ্বঘোষ সযত্নে তার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল।—উপর দিক তাকিয়ে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে প্রভা অশ্বঘোষের শ্রীমণ্ডিত মুখখানা দেখতে লাগল। অশ্বঘোষের কথা শেষ হলে প্রভা বলল—"তোমার সব কথাই আমি মেনে নিতে রাজী। সাকার সৌন্দর্য থেকে প্রেরণা না পেলে কাব্য কখনো পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। আমি তোমার—কাব্যের মূর্তিময় প্রকাশ, আবার আমিই বিকশিত করছি তোমার অন্তরের কাব্যরূপকে। কিন্তু কবিতা ত শুধু আমার সৌন্দর্যের কথা নয়। সেদিন আমি বলেছিলাম যে তোমার ভিতরে দুজন অশ্বঘোষকে উপলব্ধি করতে হবে তোমায়, যাদের ভিতর মহান্ যুগকবি অমর অশ্বঘোষকেই মুখ্য হয়ে উঠতে হবে। কারণ সে শুধু একটি ব্যক্তির নয়, সমগ্র বিশ্বেরই প্রতিনিধি। কালকারামের সেই বিদ্বান্ ভিক্ষুর কথা মনে আছে না, পরশু যাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা!"

"অদ্ভুত মেধাবী মনে হয় তাঁকে।"

"হ্যাঁ, আর বহু বহু দেশও ঘুরেছেন। তাঁর জন্ম মিস্রের অলসন্দা (সেকেন্দ্রিয়া) নগরে।"

"তা আমি শুনেছি। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারিনা প্রভা, যবন কেন সমগ্র বৌদ্ধধর্মকে মেনে চলে!"

"তার কারণ, বৌদ্ধধর্মকে তাঁর স্বতন্ত্র প্রকৃতি এবং মনোবৃত্তির অনুকূল মনে হয়েছে।"

"কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ত সকলকেই বিরাগী, তপস্বী এবং ভিক্ষুতে পরিণত করতে চায়?"

"বৌদ্ধদের মধ্যে গৃহী অপেক্ষা ভিক্ষুর সংখ্যা অনেক কম এবং বৌদ্ধ গৃহীগার্হস্থ্য জীবনেব বস গ্রহণে কারও অপেক্ষাই পশ্চাৎপদ নয়।"

"এই দেশে ত আরও কত ধর্ম প্রচলিত বযেছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিই যবনদের এত পক্ষপাতিত্ব কেন? একথাও ঠিক বুঝতে পারি না।"

"এখানে বৌদ্ধধর্মই সবচেযে উদার মতাবলম্বী। আমাদেব পূর্বজগণ যখন ভারতে এল, তখন সকলেই ম্লেচ্ছ বলে আমাদেব ঘৃণা কবত। আমি কিন্তু আক্রমণকারী যবনদেব কথা বলছি না, এখানে যাবা বসতি স্থাপনকল্পে এসেছিল বা ব্যবসায সূত্রে যাবা এখানে যাতায়াত করত, তাদের সম্বন্ধেই এই মনোভাব বজায ছিল। কিন্তু বৌদ্ধবা তাদেব মোটেই ঘৃণা কবত না। যবনেবা বস্তুতঃ নিজ দেশেও বৌদ্ধধর্মেব সঙ্গে পবিচিত হযে গিযেছিল।"

"স্বদেশেও?"

"হ্যাঁ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব পৌত্র অশোকের সময় বহু বৌদ্ধভিক্ষু যবনদেব (যূনানী) ভিতব ছডিযে পডে। আমাদেব ধর্মবক্ষিত এদেশে এসে ভিক্ষু হননি, মিশ্রতে অলসন্দাব (সেকেন্দ্রিযা) বিহাবেই তিনি ভিক্ষুতে পবিণত হযেছিলেন।"

"আমি তাঁব সঙ্গে দেখা করতে চাই প্রভা।"

"নিশ্চযই দেখা কববে। তিনি তোমাকে আরও গভীর বিষয সম্পর্কে বলতে পাববেন—শুধু বৌদ্ধধর্মেব সম্বন্ধেই নয, যবন-দর্শন সম্বন্ধেও।"

'যবনদেব ভিতরও দার্শনিক রযেছেন?"

"অনেক মহান্ দাশনিক আছেন, যাঁদেব সম্বন্ধে ভদন্ত ধর্মরক্ষিত তোমাকে সব বলতে পাববেন। কিন্তু কোথাও বৌদ্ধ-দর্শনের কথা শুনে প্রভার প্রতি যেন তোমাব বৈরাগ্য না আসে প্রিযতম।"—এই বলে প্রভা আপন বাহুপাশে এমন কবে বেঁধে ফেলল, যেন তাকে কেউ ছিনিয়ে নিযে যাচ্ছে এখনই।

"কালকারামের কিছু কিছু কথা আমাব কাছেও খুব আকর্ষণীয মনে হযেছে। ভাবছিলাম, যদি আমাদেব সমগ্র দেশ কালকারামেব মত হত।"

উঠে বসে প্রভা বলল—"না প্রিযতম, আমাকে ছেডে কখনো তুমি কালকারামে চলে যেও না।"

"প্রাণ থাকতে তোমাকে ছেডে যাব সে যে অসম্ভব প্রিয়ে! আমি বলছিলাম ওখানকার ভেদ-ভাব-শূন্যতাব সম্বন্ধে। ওখানে যবন ধর্মরক্ষিত, পারশী সুমনের মত দেশ-দেশান্তবের বিদ্বান ভিক্ষু বাস করেন আর সেই সাথেই আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত কুলের ভিক্ষুরাও বাস করেন। এঁরা সব একসাথেই খাওয়া দাওয়া করেন, একসাথেই জ্ঞানার্জনে সমাবিষ্ট হন। কালকারামের সেই কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধ ভিক্ষুর নাম কি প্রভা?"

"মহাস্থবির ধর্মসেন। ইনি সাকেতের সমস্ত বিহারবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে প্রধান।"

"শুনেছি, চণ্ডাল কুলে তাঁর জন্ম। আরও শুনেছি যে আমার আপন কাকা ভিক্ষু

শুভগুপ্ত তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে বন্দনা করতেন। ভেবে দেখো, কোথায় এক সমৃদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলজাত বিদ্বান পুত্র শুভগুপ্ত আর কোথায় চণ্ডালপুত্র ধর্মসেন!"

"কিন্তু মহাস্থবির ধর্মসেনও অতিবড় বিদ্বান ছিলেন।"

"আমি ব্রাহ্মণ-ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, প্রভা!……"

"তবে ধর্মসেন মানুষও হতে পারেন, দেবতা……"

"বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু-সংঘকে সমুদ্র আখ্যা দিয়েছেন, যিনিই এই সংঘে যান, তিনিই তার নাম-রূপ ছেড়ে সমুদ্রে লীন হয়ে যান।"

"বৌদ্ধ গৃহীরাও কেন অমনি করে না?"

"বৌদ্ধ গৃহীরা দেশের অন্যান্য গৃহী লোকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া তাদের ঘাড়ে পারিবারিক বোঝাও থাকে।"

"আমার ত মনে হয় যে কালকারামের ভিক্ষুদের মত নগর এবং জনপদের (গ্রাম) সমস্ত লোক যদি ভেদ-শূন্য হয়ে পড়ে তবেই ভালো। জাতি-ভেদ শূন্য বর্ণভেদ শূন্য।"

"একটা কথা তোমাকে আমি বলিনি প্রিয়তম। তোমার পিতা একদিন আমার সামনে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, প্রভা, অশ্বঘোষকে তুমি মুক্ত করে দাও।"

"যেন তুমি মুক্ত করে দিলেই তিনি তাঁর পুত্রকে ফিরে পাবেন। তুমি কি জবাব দিয়েছিলে প্রভা?"

"আমি বলেছিলাম, আপনার কথা আমি অশ্বঘোষের কাছে বলব।"

"আর তাই আজ বললে তুমি। ব্রাহ্মণদের পাষণ্ডতাকে আমি অসীম ঘৃণা করি—ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। এদিকে তারা বলে বেড়ায় যে আমরা আপন বেদ-শাস্ত্রকে অনুসরণ করি, কিন্তু বহু পরিশ্রম এবং পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি সমগ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যা অধ্যয়ন করেও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে কি তারা অনুসরণ করে চলে। যদি পুরাণের কোনো ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে তাদের সামনে তুলে ধরো ত বলবে—আজকাল আর এসবের প্রচলন নেই। হয় রীতি মেনে চল, নয়ত ঋষিবাক্য অনুসরণ কর। পুরাতন বেদনীতি যদি কেউ ভঙ্গ করে, তবেই না নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়। ভণ্ড, কাপুরুষ, স্বার্থপর একেই বলে। পুষ্ট বাছুরের মাংস আর মোটা দক্ষিণা পেলেই এরা খুশী, আশ্রয়দাতা রাজা এবং সামন্তগণ যাতে প্রসন্ন হয় সে সব কাজ করতেই এরা সদা প্রস্তুত।"

"দরিদ্র, এবং যাদের নীচজাতি বলে এরা অভিহিত করে—অবশ্যই দরিদ্র হলে তাঁদের কাকেও ধর্মে স্থান দেয় না এরা—"

"হ্যাঁ, অন্যান্য দেশ থেকে আগত যবন, শক, আভীর ইত্যাদি জাতি সমূহকে এরা ক্ষত্রিয় বলে, রাজপুত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কারণ তাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, অর্থ ছিল। তাদের কাছ থেকে এরা মোটা-মোটা দক্ষিণা পেত। কিন্তু স্বদেশের শূদ্র, চণ্ডাল, দাসদের চিরতরে দাস করেই রেখেছে এরা। যে ধর্ম মানুষের হৃদয়কে উদার করে তুলতে

পারে না, যে ধর্মের বিকাশ শুধু মানুষের টাকার থলি বা শাসন ক্ষমতার অপেক্ষায় পড়ে থাকে, আমি তাকে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের বলে মনে করি। জগৎ পরিবর্তনশীল; ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে আজকের গ্রন্থাবলী পর্যন্ত সমস্ত পড়ে তাদের আচার-ব্যবহারেও পরিষ্কার পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। কিন্তু আজ এদের সঙ্গে কথা বল, দেখবে এরা সমস্ত কিছুকেই শাশ্বত সনাতন প্রতিপন্ন করতে চাইবে। একে শুধু জড়তাই আখ্যা দেওয়া যায় প্রভা।"

"তোমার এই সমস্ত বিষোদ্গারের কারণ আমি ত নই, প্রাণ!"

"কারণ হওয়া ত প্রশংসারই কথা প্রভা! তুমি আমার কবিতায় নতুন প্রাণ নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছ। আমার অন্তর্দৃষ্টিতেও নতুন প্রাণ, নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে তুমি আমার বিরাট উপকার করেছ। একদিন ভাবছিলাম যে জ্ঞানের সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করে গেছি আমি, এই মিথ্যা দম্ভের সহজ স্বীকার হল ব্রাহ্মণকুল, কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি যে জ্ঞানমণ্ডলের পরিধি ব্রাহ্মণদের শ্রুতি আর তাদের তাল এবং ভূর্জপত্রের পুঁথিতেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এসবের চেয়ে অনেক বিশাল তা।"

"অমি সামান্য এক স্ত্রীলোক মাত্র।"

"আর সামান্য স্ত্রীলোক বলেই যদি কেউ তাকে নীচ বলে, তবে তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখব আমি।"

"যবনকুলে স্ত্রীলোকের সম্মান কিন্তু তা হলেও অন্য কুল থেকে অধিক থাকবে। তাদের ভিতর যদি কেউ নিঃসন্তান থেকে মরেও যায় তবু এক স্ত্রী বর্তমানে সে দ্বিতীয় কোন বিবাহ করতে পারবে না।"

"আর এই ব্রাহ্মণেরা শত শত বিবাহ করে বেড়ায় শুধু দক্ষিণা লাভের আশায়, ছিঃ! কোন যবন যে ব্রাহ্মণ-ধর্মকে মানে না, এতে আমি খুব খুশী।"

"বৌদ্ধ হলেও পূজাপাঠের জন্য আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা আসে।"

"স্বার্থরক্ষার জন্য যবনদের যখন ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছে, তখন দক্ষিণার আশায় এটুকুই বা করবে না কেন।"

"তবে কি আমি তোমার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ভেঙে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়ালাম?"

"তাতে মন্দ কিছু হয়নি। ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ যদি তোমার আমার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় ত সে দম্ভ আমার কাছে তুচ্ছ, ঘৃণার বস্তু।"

"তুমি আমাকে এত ভালবাস জেনে বড় সুখী হলাম, ঘোষ।"

"তোমার প্রেমে বঞ্চিত থাকলে অশ্বঘোষ এক নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডে পরিণত হবে প্রিয়ে।"

"তা হলে আমার প্রেমের পুরস্কার, বরদানও করতে চাও তুমি?"

"ওই প্রেমটুকু বাদে আর সব কিছু দিতে পারি।"

"আমার প্রেম যদি আমার অমর অশ্বঘোষ, মহান্ যুগকবি অশ্বঘোষকে এতটুকুও নিচে নামিয়ে এনে থাকে, তবে ঠিক আমার সে প্রেমে।"

"পরিস্কার করে বল প্রিয়ে!"

"প্রেমের পথে আমি বাধাসৃষ্টি করতে চাই না, কিন্তু আমি তাকে তোমার অমর-প্রতিভার সহায়ক রূপে দেখতে চাই। আর যদি আমি না থাকি—"

(বিক্ষিপ্ত আবেগে উঠে দাঁড়িয়ে অশ্বঘোষ যখন প্রভাকে দৃঢ়ভাবে বুকে চেপে ধরল, তখন তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে প্রভা দেখল যে তার দুই গণ্ড ভিজে রয়েছে। অশ্বঘোষকে পুনঃপুনঃ চুমু দিতে লাগল সে আর ডাকতে থাকল 'ঘোষ আমার' এই বলে বলে, তারপর কিছুটা শান্ত হলে প্রভা বললে,—"শোন প্রিয়তম, আমার প্রেম তোমার কাছে একটি বড় জিনিসের প্রত্যাশা রাখে, সেটা তোমাকে দিতে হবে।"

"তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই প্রিয়ে।"

"কিন্তু তুমি আমার কথাও সমাপ্ত করতে দাও নি?"

"তুমি যে বজ্রবাক্য উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলে।"

"কিন্তু এই বজ্রবাক্য অমর অশ্বঘোষের হিতকল্পে বলতেই হবে। আমার প্রেম চায়, মহান্ কবি অশ্বঘোষ আপন অমর কবি-প্রতিভার মত প্রভার প্রেমকেও যেন অমর বলে মনে করে, তাকে যেন প্রভার দেহ দিয়ে বিচার না করে সে। অমর অশ্বঘোষের প্রভা শাশ্বত তরুণী, শাশ্বত সুন্দরী। শুধু এইটুকুই আমি তোমাকে দিয়ে উপলব্ধি করাতে চাই।"

"তাহলে মূর্তিমতী প্রভার বদলে কাল্পনিক প্রভাকে আমার সামনে উপস্থিত করতে চাও তুমি?"

"আমি উভয়কেই মূর্তিমতী মনে করি ঘোষ, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে দুজনের মধ্যে একজন এক'শ অথবা পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকবে আর অন্যজন থাকবে শাশ্বত হয়ে। তোমার প্রভা তোমার 'উর্বশী-বিয়োগে' অমর হয়ে থাকবে। আমার প্রেমকে অমর করে রাখতে হলে তোমাকে অমর অশ্বঘোষের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রাত অনেক হয়ে গেছে, সরযূর কূল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, আমাদেরও ঘরে ফেরা উচিত।"

"অমর প্রভার এক চিত্র আমি আমার মানসপটে অঙ্কিত করে নিলাম।"

"শুধু এইটুকুই আমি চাই প্রিয়তম"—এই বলে রেশমের মত কোমল কেশপাশ অশ্বঘোষের কপোলতলে বুলিয়ে দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো প্রভা।

৭

প্রশস্ত এক অঙ্গন। অঙ্গনের চারদিকে বারান্দা এবং পিছনে তিনতলা এক অট্টালিকা। বারান্দার রেলিংএ ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে। অঙ্গনের এক কোণে একটি কূয়ো এবং স্নানের ঘর। অঙ্গনের অন্যান্য স্থানে বহুরকমের গাছপালা। তার

মধ্যে একটি ছিল পিপুল গাছ। গাছেব মূলে এক বাঁধানো বেদী আর-একটু দূর ঘিবে পাথবেব দেয়াল। যার উপর সহস্র দীপক বাখবাব স্থান রয়েছে। হাঁটু গেড়ে এই সুন্দর বৃক্ষ বন্দনা কবে প্রভা বলল—"প্রিয়, এহলো সেই জাতেব বৃক্ষ যাব নিচে বসে সিদ্ধার্থ গৌতম আপন সাধনা, আপন চিন্তা দ্বাব। মনকে ভ্রান্তিমুক্ত কবে বোধপ্রাপ্ত হযেছিলেন, এবং সেই থেকে এ বুদ্ধেব নামে প্রখ্যাত হযেছে। শুধু সেই মধুব স্মৃতি স্মবণ কবে আমি এই বৃক্ষেব সামনে শিব নত কবি।"

"আপন সাধনা অপন চিন্তা দ্বাবা মনকে ভ্রান্তিমুক্ত কবে বোধপ্রাপ্ত কববাব প্রতীক! এ বকম প্রতীককে পূজা কবা উচিৎ প্রিয়ে! এবকম প্রতীকেব পূজা আপন সাধনায আত্ম-বিজযেবই পূজা।"

এবপব দুজনেই ভদন্ত ধর্মরক্ষিতেব কাছে গেল। সে সময় তিনি অঙ্গনেব এক বকুল বৃক্ষেব নিচে উপবিষ্ট ছিলেন। নবপুষ্পিত ফুলেব মধুব সৌভ ছড়িয়ে পড়েছে এখানটায। বৌদ্ধ উপাসিকাব ন্যায প্রভা পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত (হাটু গেড়ে হাতেব পাতা এবং কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে) হযে তাঁকে বন্দনা কবল। অশ্বঘোষ দণ্ডায়মান অবস্থাযই শ্রদ্ধা নিবেদন কবল। তাবপব দুজনে মাটিব উপব বক্ষিত চর্মাসনে বসে পড়লো। অশ্বঘোষ আলাপ-আলোচনা কবতে এসেছে বুঝে ভদন্তেব শিষ্য সেখান থেকে উঠে গেল। সাধাবণ শিষ্টাচাবেব কথাবার্তাব পব অশ্বঘোষ দর্শনেব কথা তুলল। ধর্মবক্ষিত বললেন,—'ব্রাহ্মণ-কুমাব, বুদ্ধধর্মে দর্শনকেও বন্ধন এবং দৃঢবন্ধন (দৃষ্টি-সংযোজন) বলা হয়েছে।"

"তবে কি বুদ্ধধর্মে দর্শনেব স্থান নেই, ভদন্ত?"

"স্থান কেন থাকবে না। বুদ্ধেব ধর্মই দর্শনময, কিন্তু বুদ্ধ একে নদী পাব হবাব সেতু বলে মনে কবতেন না?"

"কি বললেন, সেতু বলে?"

"হ্যা, নৌকাবিহীন নদী পাব হতে হলে লোক যে সেতু বেঁধে, তাব সাহায্যে পাব হয। কিন্তু পাব হযে যাবাব পব সেই সেতু খুলে তাকে মাথায কবে নিয়ে যায না।"

"আপন ধর্মেব সপক্ষে যে পুরুষ উচ্চকণ্ঠে এতবড কথা বলবাব স্পর্ধা রাখেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্য এবং তাব অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি কবেছেন। ভদন্ত, বুদ্ধেব দর্শন থেকে এমন কোনো কথা বলুন যাব সাহায্যে আমবা নিজে থেকেই অনেক কিছু বুঝতে পাববো।"

'অনাত্মবাদ, কুমাব! ব্রাহ্মণেরা আত্মকেই নিত্য, ধ্রুব, এবং শাশ্বত তত্ত্ব বলে মনে কবে। কিন্তু বুদ্ধজগতের ভিতর-বাহিব কিছুই এমন কোনও নিত্য, ধ্রুব বা শাশ্বত তত্ত্বকে স্বীকার কবে না, এজন্যই তাদের দর্শনকে অনাত্মবাদ, অর্থাৎ অবিবাম উৎপত্তি আর বিনাশের সংঘর্ষে যে অনিত্যতা তারই দর্শন বলা হয়।

"এই একটা কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ভদন্ত! ধর্ম এবং অনাত্মবাদ সাঁকোর

ন্যায়, এই বাণী প্রচার করেছেন যে বুদ্ধ,—তাঁকে শত শত অশ্বঘোষ প্রণাম জানাচ্ছে। অশ্বঘোষ যা খুঁজে মরছিল তা সে পেয়ে গেছে। আমি নিজের ভিতরে এমনি এক চিন্তা লহরী অনুভব করেছিলাম; কিন্তু তার নাম দেবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাইনি এর আগে। লোকে বুদ্ধের শিক্ষাকে যথাযথ পালন করলে পৃথিবীর রূপ আজ বদলে যেত।”

“ঠিকই বলেছো কুমার! আমাদের যবন দেশগুলোতেও মহান্ দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের ভিতর পাইথাগোরাস এবং হেরাক্লিটাস ছিলেন ভগবান্ বুদ্ধের সমসাময়িক আর সক্রেটিস্, প্লেটো অ্যারিষ্টটল-এঁরা জন্মগ্রহণ করেন কিছুকাল পরে। এইসব যবন দার্শনিকদের সকলের ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি। কিন্তু একমাত্র হেরাক্লিটাস্ ছাড়া আর কেউই শাশ্বতবাদ, নিত্যবাদের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। বর্তমান সম্বন্ধে তাঁদের চেয়েও বেশি মোহ ছিল। তার কারণ ভবিষ্যৎকেও তাঁরা বর্তমানের নাগপাশে বেঁধে রাখতে চাইতেন। হেরাক্লিটাসও অবশ্য বুদ্ধের মতই, জগৎকে এক মুহূর্তের জন্যও স্থির অচঞ্চল বলে স্বীকার করতেন না, বুদ্ধের মতই চির চলমান বলে মনে করতেন তিনি জগৎটাকে।

“কিন্তু এর পেছনে ছিল তাঁর এক ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন।”

“দর্শন-বিচারে ব্যক্তিগত স্বার্থ!”

“উদর নামক জিনিসটি সকলেরই আছে কুমার! হেরাক্লিটাসের সময়ে আমাদের এথেন্স নগরে গণশাসন কায়েম ছিল, অর্থাৎ এথেন্স কোনও রাজার অধীন রাজ্য ছিল না। প্রথমে হেরাক্লিটাস্ পরিবারের মত বড় বড় সামন্ত পরিবারেরা গণশাসনের কর্ণধার ছিলেন। পরে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে ব্যবসায়ী শেঠেরা শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। হেরাক্লিটাস্ মোটেই খুশি ছিলেন না। তিনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু এগিয়ে চলবার পথে নয়, পিছনে ফিরবার পথে।

“পরিবর্তন আমাদের চাই, কিন্তু তা এগিয়ে যাবার জন্য, পিছিয়ে পড়ার জন্য নয়—আমার মনে হয় ভদন্ত, অতীত চিরকালই মৃত।”

“খুব খাঁটি কথা বলেছো কুমার! বুদ্ধ পরিবর্তন চাইতেন উন্নততর জগত প্রতিষ্ঠার জন্য। এই ভবিষ্যৎ জগতের প্রতীক এক নমুনা জগতে তিনি ভিক্ষুসংঘকে সংগঠিত করেছেন।”

যেখানে জাতিভেদ-শ্রেণীভেদ নেই উঁচুনিচু ভেদ নেই।”

“যেখানে সকলেই সমান আহার পাবে, যেখানে সবাইকেই সমান শ্রম করতে হবে। তুমি আমাদের মহাস্থবির ধর্ম সেনকে বাইরে ঝাড়ু হাতে কাজ করতে দেখনি কি?”

“ওই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকটি?”

“হ্যাঁ, উনিই আমাদের ভেতরে শ্রেষ্ঠ, আমরা প্রতিদিন পঞ্চ-প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে বন্দনা করি। সমগ্র কোশল দেশের ভিক্ষুসংঘগুলোর ইনিই নায়ক।”

"শুনেছি, উনি নাকি চণ্ডাল-কুলজাত?"

"ভিক্ষু সংঘ কুল-বিচার করে না, কুমার। তারা বিচার করে গুণের। নিজ বিদ্যা এবং গুণের জোরেই আজ উনি আমাদের নায়ক, আমাদের পিতা। শুধু নিজের পেট ভরাবার মত সামান্য ভিক্ষাও যদি তিনি লাভ করেন, তবু সঙ্গীদের ভাগ না দিয়ে কখনোই তা আহার করেন না তিনি। এবং এই হলো বুদ্ধের শিক্ষা। পরণের তিন টুক্‌রো কাপড়। মাটির তৈরি এক ভিক্ষাপাত্র, একটি সূচ, জল পান করবার একটি পাত্র, একটি চিরুণী আর এক কোমর বন্ধনী—এ কটি জিনিস ছাড়া আমাদের আর সব কিছুই সংঘের সাধারণ সম্পত্তি। এই বাড়ি, বাগান, মঞ্চ, বেদী—সবই সংঘের সম্পত্তি। আমাদের কোন কোন বিহারে যে জমি রয়েছে, তাও সংঘেরই। কাকেও ভিক্ষুতে পরিণত করতে হলে সংঘ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা করে, কিন্তু একবার যে সংঘতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ভিক্ষুতে পরিণত হয়েছে, সে সংঘেব আর সবাবই সমান।"

"সারা দেশটাই যদি এমনি এক সংঘতে পরিণত হত!"

"সে কি করে হবে কুমার? রাজা বা ধনীর দল কেন অন্যকে তাদেব সমান হতে দেবে! এখানকার ভিক্ষুরা একবার এক দাসকে এই সংঘে ঢুকিয়েছিল। সংঘে আসবার পরই সে আর দাস রইল না হয়ে গেল সকলেব সমান। কিন্তু এরপবই তার প্রভু এসে হল্লা শুরু কবে দেয়, সংগে তার অন্য একজন দাসপ্রভুও ছিল। রাজা নিজে ত হাজার হাজার দাসের প্রভুত্ব কবেন। তিনিই বা তাঁব সম্পত্তির উপব এ ধরণের হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন কেন?" এসবের বিরুদ্ধে বুদ্ধ কি করতে পাবতেন, কাজেই তাঁকে নির্দেশ দিতে হল যে এখন থেকে কোন দাসকে আর সংঘেব ভিতব নেওয়া হবে না। অসাম্যের বিশাল সমুদ্রের মাঝে আমাদের সংঘ এক ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্র, জগতময় দারিদ্র্য এবং দাসত্ব যতদিন অটুট থাকবে, ততদিন আমাদের সংঘগুলোকে নিরাপদ ভাবা চলবে না।"

৮

শরতের পূর্ণিমা। সন্ধ্যাথেকেই চাঁদের থালা পূর্বদিগন্ত থেকে উঠে আসছে। অস্তমিত সূর্যের লাল আভা যেমন নীল দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, চাঁদের শীতল রূপালী আলোও তেমনি নীল আকাশকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

আজকাল বেশির ভাগ সময়ই প্রভাদের বাড়ি থাকে অশ্বঘোষ। দু'জনে ছাদের উপর বসেছিল, প্রভা বলে উঠল—"সরযূর তরঙ্গ লহরী আমাকে কাছে ডাকছে প্রিয়তম! সেই লহরী, প্রথম যা তোমাকে আমাব কাছে টেনে এনেছিল এবং প্রথমে আমরা

প্রেমডোরে বাঁধা পড়েছিলাম। সেদিন গত হয়ে গেছে দু'বছর আগে, কিন্তু আজও মনে হয় যেন গতকালের ঘটনা সে, কত চাঁদনীরাতই না আমরা সরযূতীরে কাটিয়েছি, কী মধুর ছিলো সেই সব রাতগুলো! আজও তেমনি মধু যামিনী প্রিয়! এস আমরা সরযূতীরে যাই।"

দু'জনে চলতে লাগল। নদী এখান থেকে দূরে প্রবাহিত। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বালুকারাশির উপর দিয়ে অনেক দূর হাঁটল তারা। প্রভা তার চটি জোড়া আগেই হাতে তুলে নিয়েছে, পায়ের নীচে কোমল বালুরাজির সুখস্পর্শ অনুভব করতে লাগল। দু'হাতে অশ্বঘোষের কটি বেষ্টন করে প্রভা বলল,—"সরযূ সৈকতে এই বায়ুর স্পর্শ কি অপূর্ব, না, প্রিয়তম?"

"হ্যাঁ, পায়ের নিচে বেশ চমৎকার সুড়সুড়ি দেয়।"

"এক অদ্ভুত অনুভূতি না? রোমাঞ্চ লাগে যেন!"

"আমি কতবার ভেবেছি প্রিয়ে যে আমরা দু'জনে পালিয়ে যাই! চলে যাই সেই দেশে যেখানে আমাদের প্রেমকে ঈর্ষা করার কেউ থাকবে না। যেখানে তুমি আমাকে প্রেরণা জোগাবে আর তাই নিয়ে আমি রচে তুলবো সুন্দর গীত। তারপর বীণা বাজিয়ে সেই গীত একসংগে গাইব দু'জনে। এখানে এমন রাত্রে আমার বীণা ত সঙ্গে আনতে পারি না প্রভা, লোক জমে যাবে। তাহলে আর তাদের মধ্যে হয়ত দেখব বহু ঈর্ষাকলুষিত নয়ন।"

"আমাকে মন্দ ভেব না প্রিয়তম—মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যদি আমি না থাকি…"

প্রভাকে দৃঢ়ভাবে বুকে চেপে ধরে অশ্বঘোষ বলল, "না না প্রিয়ে, কখনই হতে পারে না তা, আমরা এমনি থাকবো চিরদিন।"

"অন্য কিছু ভেবে আমি একথা বলছিলাম প্রিয়তম। ধর, তুমি মরে গেলে আমি একা থেকে গেলাম। জগতে এরকম ঘটনা ঘটে ত নিশ্চয়ই।"

"ঘটে।"

"আমার মৃত্যুর কথায় ত অধীর হয়ে উঠলে না তুমি! তোমার অবর্তমানে আমার উপরেই শুধু শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এই ভেবে না?

"তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা কেনো শোনাচ্ছ প্রভা!"

অশ্বঘোষের অধর চুম্বন করে প্রভা বলল—"জীবনের অনেক দিক রয়েছে। পূর্ণিমাই শুধু নয়, জীবনে অমানিশারও আগমন হয়। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছিলাম যে, একের অবর্তমানে অপরের কর্তব্য কি হবে। তুমি না থাকলে আমি কি করবো জানো?"

মাথা নিচু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অশ্বঘোষ বলল—"বলো।"

"নিজের জীবনকে কিছুতেই শেষ করে দেব না আমি। ভগবান বুদ্ধ আত্মহত্যাকে পাপপূর্ণ মূর্খের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তুমি ত দেখছ, ইতিমধ্যেই বীণার উপর কতটা দখল আমার এসে গেছে।"

"অনেকখানি প্রভা! কতবারই ত তোমার হাতে বীণা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গান গেয়েছি আমি।"

"হ্যাঁ, কোনদিন হয়ত আমার নশ্বর অশ্বঘোষ বিলীন হয়ে যাবে আমার দৃষ্টি থেকে, কিন্তু আমি যুগ-যুগান্তরের অমর কবি অশ্বঘোষের আরাধনা করে চলব। তোমারই বীণায় তোমার রচিত গান গাইব আমি। জীবনভোর গান গেয়ে ফিরব দেশে বিদেশে, যতদিন না আমাদের যুগ্ম জীবন-প্রবাহ অন্য কোনও দেশ-কালে এসে সাকার-সম্মিলনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু, আমি না থাকলে তুমি কি করবে প্রিয়মত?" কথাগুলো শুনে অশ্বঘোষের অন্তস্তল থেকে শুরু করে সারা দেহ কেঁপে উঠ্‌লো থরথর করে, প্রভা অনুভব করল সে কম্পন। কথা বলবার চেষ্টা করল অশ্বঘোষ, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে তার কান্নার ভারে, চোখ দিয়ে জল ঝরছে অঝোর ধারায়। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ক্ষীণকণ্ঠে বলল সে,—"জীবনে এমন দিন সত্যই বড় সাংঘাতিক, কিন্তু আমিও আত্মহত্যা করবো না প্রভা। তোমার প্রেমের প্রেরণা আমার হৃদয়ে যে গানের সঞ্চার করবে, তাই আমি গেয়ে চলবো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমি তোমার অমব অশ্বঘোষ—"অশ্বঘোষেব কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেল।

"সরযূর ধারা ঘুমিয়ে পড়েছে প্রিয়তম, চল আমরাও ফিরি।"

৯

গ্রীষ্মকাল। মাতা স্বর্ণাক্ষী রোগে পড়লেন। অশ্বঘোষ দিনরাত মায়ের কাছে থাকে। দিনের বেলা প্রভাও থাকে। চিকিৎসায় কোনই ফল দিল না, স্বর্ণাক্ষীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল। পূর্ণিমার রাত এসে গেল রূপালী চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আজ এই চাঁদের আলোতেই স্বর্ণাক্ষী ছাদের উপর যেতে চাইলেন। তাঁর চৌকি উঠল সেখানে। দেহটা তাঁর কঙ্কালসার হয়ে গেছে। দেখে দেখে অশ্বঘোষের হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠতে লাগল। ধীর স্পষ্ট কণ্ঠে মা বললেন, —"কি সুন্দর জ্যোৎস্না।"

অশ্বঘোষের কানে প্রভার কথা বেজে উঠল—"সরযূর তরঙ্গ লহরী আমাকে ডাকছে।" বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল অশ্বঘোষের। মা আবার বললেন—

"প্রভা কোথায় বাবা?

"তাদের বাড়িতে মা, সন্ধ্যা পর্যন্ত ত এখানেই ছিল।"

"প্রভা! মা আমার! ওকে তুই কখনো ভুলিস না বাবা···"

কথা শেষ হবার আগেই একটা কাশির ধমকে স্বর্ণাক্ষীর দেহ নিশ্চল হয়ে গেল।

সুবর্ণাক্ষী গত হলেন। সুবর্ণাক্ষী-পুত্রের বুকফেটে হাহাকার উঠছে। রাত দিন সমানে কাঁদল সে।

পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মায়ের দাহকর্মেই কেটে গেল। তারপর প্রভার কথা মনে পড়ল তার। দত্তমিত্রের বাড়িতে গেল সে। প্রভার মা-বাবা ভেবেছিলেন, সে অশ্বঘোষের কাছেই গেছে। গতরাত্রের আঘাতেই অশ্বঘোষের হৃদয় জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, এখন আরও অধীর হয়ে পড়ল সে। প্রভার শয়নকক্ষে ঢুকল অশ্বঘোষ। সব জিনিসই ঠিকমত সাজানো রয়েছে। শয্যার উপর থেকে শাদা চাদরটা টেনে তুলল সে, সেখানে দেখতে পেল নিজের একখানা ছবি। ছবিখানা তৈরি করিয়েছিল প্রভা এক নবাগত যবন চিত্রকরকে দিয়ে। এই ছবির জন্য অনিচ্ছা সত্বেও অশ্বঘোষকে বহু সময় স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। ছবির উপর একটি ম্লান জুঁই ফুলের মালা পড়ে আছে। ছবির নিচে প্রভার হাতে লেখা তালপাতার একখানা ভাঁজ করা চিঠি। অশ্বঘোষ চিঠিখানা তুলে নিল। সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল সেটা। সুতোর বাঁধুনি আটকাবার জন্য যে কালো মাটি লাগান হয়েছিল তা এখনও শুকোয়নি। সুতো কেটে মাটিটুকু রেখে দিল অশ্বঘোষ। চিঠি খুলতেই প্রভার সুন্দর হস্তাক্ষরে লম্বা পাতার উপর লেখা পংক্তিগুলো জলজ্বল করে উঠল—

"প্রিয়তম! প্রভা বিদায় নিয়ে যাচ্ছে সরযূর জলরাশি আমাকে ডাক দিয়েছে, তাই আমি চলেছি। আমার প্রেমের প্রতিদানে তুমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মনে আছে? প্রভার চির-তারুণ্য, শাশ্বত সৌন্দয আমি রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে। পাকাচুল, ভাঙ্গাদাঁত, লোলচর্ম প্রভাকে আর তোমায় দেখতে হবে না। আমার প্রেম, আমার এই অবিনশ্বর যৌবন তোমাকে প্রেরণা জুগিয়ে চলবে। এই প্রেরণাকে তুমি হেলায় নষ্ট ক'র না, প্রিয়তম। এ কথা ভেব না যে আমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কারের ভয়ে আত্মহত্যা করছি। শুধু তোমাকে কাব্য-প্রেরণা জোগাবার জন্যই আমি এই পথে আমার অক্ষুন্ন যৌবনকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। প্রিয়তম, প্রভা তার কল্পনা দিয়ে তোমাকে অন্তিম আলিঙ্গন আর শেষ চুম্বন দিয়ে যাচ্ছে।"

বারে বারে চোখের জল মুছে পত্রপাঠ শেষ করল অশ্বঘোষ। পৃষ্ঠা শেষে চিঠিখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল। খাটের উপর বসে পড়ল সে। হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে তার। তন্ময় হয়ে সে যেন হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হবার প্রতীক্ষা করতে লাগল। মর্মর মূর্তির মত শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সে। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর প্রভার বাবা-মা ঘরে এসে ঢুকলেন। অশ্বঘোষের এই অবস্থা দেখে বড়ই শংকিত হয়ে পড়লেন তাঁরা—তারপর চিঠিখানা তুলে পাঠ করলেন। প্রভার মার কণ্ঠ থেকে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল একটা, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। দত্তমিত্রের চোখ থেকে নীরব অশ্রুধারা নেমে এল। অশ্বঘোষ তাকিয়ে রয়েছে তেমনি স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে। বহুক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই অবস্থায় দেখার পর প্রভার মা-বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা

পেরিয়ে রাত নেমে এল, অশ্বঘোষ বসে রয়েছে সেই একই অবস্থায়। চোখের জল শুকিয়ে গেল। তার হৃদয়ের ভিতরটাও পাথর হয়ে গেছে যেন। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে অনেক রাতে ঘুমে ঢুলে পড়ল সে।

সকালে প্রভার মা এসে দেখলেন, অশ্বঘোষ প্রকৃতিস্থ হয়ে কি যেন চিন্তা করছে বসে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ?" "সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি মা। প্রভা যে কাজ আমাকে সঁপে দিয়ে গেছে এবারে আমি তাই সম্পন্ন করব। আমি বুঝতাম না, কিন্তু প্রভা জানত, সে আমার কর্তব্য বলে দিয়ে গেছে। আত্মহত্যা নয় মা প্রভা আত্মদান করে গেছে। একথা ঠিকই যে এই আত্মদানকে আমি আত্মহত্যায় পরিণত করে দিতে পারি, কিন্তু এত অকৃতজ্ঞ আমি হতে পারব না।"

মা অশ্বঘোষের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের সংগে দেখা করতে আর সরযূকে দেখতেও বটে।"

"ভদন্ত ধর্মরক্ষিত নিচেই বসে আছে। আর সরযূকে দেখতে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।" কথা বলতে বলতে গলা ধরে গেল তাঁর।

নিচে গিয়ে ধর্মরক্ষিতকে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়ে বন্দনা করে অশ্বঘোষ বলল—

"ভদন্ত, এবারে আমাকে সংঘতে গ্রহণ করুন।"

"বৎস, তোমার শোক নিদারুণ।"

"নিদারুণ ঠিকই, কিন্তু শোকের তাড়নায় আমি একথা বলছি না, প্রভা এর জন্য আমাকে তৈরি করেই গিয়েছে। আমি শোকান্ধের আবেগ নিয়ে তাড়াহুড়ো করছি না।"

"তাহলেও তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, সংঘ এত তাড়াতাড়ি তোমাকে গ্রহণ করবে না।"

"প্রতীক্ষা আমি করবো ভদন্ত, কিন্তু সংঘের আশ্রয়ে থেকে।"

"প্রথমে তোমার পিতার কাছ থেকে সম্মতি আনতে হবে। মাতা-পিতার সম্মতি ছাড়া সংঘ কাকেও ভিক্ষু হিসাবে গ্রহণ করে না।"

"তাহ'লে আমি অনুমতি নিয়েই যাব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এল অশ্বঘোষ। প্রভার মা তার সুস্থমস্তিষ্কের কথাবার্তা শোনার পরও শংকিত হয়েই ছিলেন, তাই তিনিও পিছে পিছে এলেন, নৌকা করে সরযূর জলে সারা দিন দু'জনে খোঁজার পরও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না প্রভার। পরের দিন আরও এগিয়ে গিয়ে খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

বাড়ি গিয়ে অশ্বঘোষ পিতার কাছে ভিক্ষু হওয়ার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করল, কিন্তু একমাত্র পুত্রকে কেন তিনি অনুমতি দেবেন এপথে যাবার জন্য। অশ্বঘোষ বলল—"মা আর প্রভার শোকে পাগল হয়ে আমি এ পথ গ্রহণ করতে যাচ্ছি না বাবা। নিজের জীবনে আমি যে কর্মধারা গ্রহণ করেছি, এই-ই তার রাস্তা। তুমি দেখছ না আমার কণ্ঠস্বরে, আমার আচরণে কোথাও চিত্তবিকারের এতটুকু লক্ষণ

নেই। আমি আর একটা কথাই শুধু বলব—যদি আমাকে জীবিত দেখতে চাও তবে সম্মতি দাও বাবা!"

"আচ্ছা, তবে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাববার সময় দাও—"

"আমি সাতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী বাবা।"

পরদিন চোখের জলে ভেসে অশ্বঘোষকে ভিক্ষু হবার সম্মতি দিলেন তিনি।

সাকেতের আর্য সর্বাস্তিবাদ সংঘ অশ্বঘোষকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করল। মহাস্থবির ধর্মসেন হলেন অশ্বঘোষের উপাধ্যায় এবং ভদন্ত ধর্মরক্ষিত হলেন তার আচার্য। এই সময়ে নৌকা করে ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের পাটলিপুত্র (পাটনা) যাবার কথা ছিল, তাঁর সাথে অশ্বঘোষও সাকেত ত্যাগ করল।

১০

পাটলিপুত্রস্থ অশোকারামে (মঠ) ভিক্ষু অশ্বঘোষের দশবছর কেটে গেল। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সাথে বৌদ্ধদর্শন এবং যবন দর্শন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করল সে, মগধের মহাসংঘের বিদ্বান্‌মণ্ডলীতে অশ্বঘোষের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। এই সময় পশ্চিম থেকে শক সম্রাট কনিষ্ক পূর্বাঞ্চল জয় করবার জন্য পাটলিপুত্র এসে পৌছুল। পাটলিপুত্র এবং মগধ এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কনিষ্কের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। গান্ধার নিয়ে যাবার জন্য ভিক্ষু সংঘ থেকে একজন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে চেয়ে পাঠাল। সংঘ অশ্বঘোষকে পাঠিয়ে দিল।

রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) গিয়ে অশ্বঘোষ নিজেকে এমন একস্থানে অবস্থিত দেখল যেখানে শক, যবন, তুরস্ক (তুর্ক), পারশী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির একত্র সমাবেশ রয়েছে। যবন নাট্যকলাকে অশ্বঘোষ আগেই ভারতীয় সাহিত্যে স্থান দিয়েছিল। যবন দর্শনের গভীর অনুশীলনের পর, তার ভেতরকার বহু বিশেষত্ব, বিশ্লেষণ-শৈলী এবং অনুকূল তত্ত্বসমূহকে নিয়ে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে বৌদ্ধদর্শনকে যবনদর্শনের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলে সে। বৌদ্ধদের সামনে যবন-দর্শন গ্রহণ করবার রাস্তা করে দেয় অশ্বঘোষ। তারপর অপরাপর ভারতীয় দার্শনিকেরাও এই প্রচেষ্টা করেছে এবং বৈশেষিক আর ন্যায়ের পথে সকলের আগে আগে চলেছে। পরমাণু, সামান্য দ্রব্য, গুণ, অবয়বী ইত্যাদি তত্ত্ব এরা যবন-দর্শন থেকেই গ্রহণ করেছে।

ভদন্ত অশ্বঘোষের হৃদয়কে বিশাল করে দিয়েছিল প্রভা, কাজেই তার কাছে আত্ম-পর ভেদ ছিলো না। প্রভার প্রেরণায় সে বহু কাব্য আর নাটক কাহিনী লেখে। তার অনেক কিছুই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রকৃতি তার প্রতি অত্যন্ত

প্রসন্ন ছিলো, তাই তো সতেরোশ' বছর পরে মধ্য এশিয়ার মহাবালুকারাশি গোবী অশ্বঘোষের 'মারি-পুত্ত' প্রকরণকে (নাটক) মানুষেব হাতে তুলে দেয়। অশ্বঘোষেব 'বুদ্ধ-চরিত' আর 'সৌন্দরানন্দ' দুই অমর কাব্য।

প্রভার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তাকে যথাযথ ভাবেই পালন করেছিল সে এবং প্রভার অম্লান সৌন্দর্য রাশি তার কাব্যকে সুন্দরতম করে তুলেছিল।

জন্মভূমি সাকেত এবং মাতা স্বুবর্ণাক্ষীকে কখনো সে বিস্মৃত হয়নি। আপন গ্রন্থসমূহে সর্বদাই নিজের নাম লিখত সে, 'সাকেতবাসী আর্য-সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ' এই বলে।

সুপর্ণ যৌধেয়

কাল: ৪২০ খৃষ্টাব্দ

১

আমারও ভাগ্যচক্র যেন কেমন। কখনও একজায়গায় স্থির থাকতে পারি নি। সংসার তরঙ্গ আমাকে সর্বদা চঞ্চল এবং বিহ্বল করে রেখেছে। জীবনে মধুর দিনও এসেছে; যদিও তিক্তাময় দিনগুলো থেকে কম সংখ্যায়, আর পরিবর্তন ত যেন বর্ষাশেষে বাদলদিনের মত, বৃষ্টি আর রৌদ্রে ঘেরা। জানিনা এই পরিবর্তন চক্র কেন ঘুরছে। পশ্চিমী উত্তরাপথ গান্ধারে এখনও মধুপর্কে বাছুরের মাংস দেওয়া হয়। কিন্তু মধ্যদেশে (যুক্তপ্রান্ত-বিহার) গোমাংসের নাম নেওয়াও পাপ, এখানে গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমি বুঝে উঠতে পারি না, ধর্মে এত বৈপরীত্য কেন। এক জায়গার অধর্ম কি অপর জায়গায় ধর্মরূপ চলতে থাকবে; অথবা একজায়গার পরিবর্তন আগে সাধিত হয়েছে, অপর জায়গা তার অনুকরণ করবে?

অবন্তীর (মালবা) এক গ্রামে ক্ষিপ্রা নদীতটে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। আমার কুলের লোকেরা নিজেদের পরিব্রাজক বলে মনে করে, যদিও এদের আপন ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি রয়ে গেছে এবং সেগুলো আপন স্কন্ধে বহন করে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া চলে না। আমার কুলের লোকেদের দেহের গড়ন এবং রং-রূপ গ্রামের অন্যান্য লোকজন থেকে কিছুটা পৃথক প্রকৃতির ছিল। এরা অধিকতর দীর্ঘ গৌর এবং সেইসঙ্গে অপরের উৎকর্ষতা এদের কাছে অসহ্য ছিল। আমার মা গ্রামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন, তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া বাদামী চুল বড়ই সুন্দর লাগত। আমাদেব পরিবারের লোক নিজেদের ব্রাহ্মণ বলত, কিন্তু আমি লক্ষ্য করতাম গ্রামের লোকের তাতে সন্দেহ রয়ে গেছে। সন্দেহের কারণও ছিল। এইস্থানে ব্রাহ্মণদের ভিতর সুরাপান মহাপাপ রূপে গণ্য হত, কিন্তু আমাদের গৃহে তা বরাবর তৈরি হত এবং পান করা হত। উচ্চকুলে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ এখানে অশ্রুতপূর্ব ছিল, কিন্তু আমাদের কুলের সাতটি পরিবার—যারা একই বংশজাত—সন্ধ্যা হতেই খোলাজায়গায় একসাথে জড় হয়ে পড়ত। অতি শিশুকালে আমি ভাবতাম, সকল জায়গাতেই এই একই নিয়ম, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য বালকদের সংগে খেলতে গিয়ে তাদের বিদ্রূপবাণে বুঝতে পারলাম যে তারা আমাদের অদ্ভুত ধরনের মানুষ বলে মনে করে এবং আমাদের কৌলীন্যকে স্বীকার করলেও ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ করে।

আমাদের গ্রামখানা বেশ বড় ছিল। দোকান এবং ব্যবসায়ীদের বাড়িঘরও সেখানে ছিল। গ্রামে কিছু নাগর পরিবার ছিল, লোকে তাদের বেনে বলত, কিন্তু তারা স্বয়ং আমাদের মতই নিজেদের ব্রাহ্মণ বলতো। কিছু নাগর কন্যা বিবাহসূত্রে আমাদের কুলে এসে পড়েছিল, গ্রামের লোকের আমাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার না করবার এও এক কারণ, তাদের বক্তব্য, ব্রাহ্মণের পান-ভোজন-বিবাহ রীতি অবহেলা করেও আমরা কি করে ব্রাহ্মণ থাকতে পারি? আমার খেলার সাথী ছেলেদের যদি কখনও আমার উপর রাগ হত তবে আমাকে 'লড়ায়ে-মোরগ' বলে অবজ্ঞায় মুখ সিঁটকাত। এসম্বন্ধে মাকে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি, কিন্তু তিনি আমাকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

আমি কিছুটা বড় হয়ে উঠ্‌লাম, দশ বছর বয়স হল আমার, এবং গ্রামের এক ব্রাহ্মণ গুরুর পাঠশালায় পড়তে যেতে লাগলাম। আমার সহপাঠীরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ—লোকের কথা অনুসারে সকলেই খাঁটি ব্রাহ্মণ। এরা ছাড়া আমি এবং অপর দুই নাগর বিদ্যার্থী ছিলাম আমরা। সহপাঠীরা আমাদের আধা-ব্রাহ্মণ বলে ডাকতো। গুরুদেবের বিদ্যার্থীগণের মধ্যে আমি সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী ছিলাম এবং আমার প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ছিল। আমাদের কুলের স্বভাব আমার মধ্যেও ছিল, এবং কারো কথা সহ্য না করে তার সংগে ঝগড়া-বিবাদ করতাম। একদিন আমার এক সহপাঠী বিদ্রূপ করে বলল, "ব্রাহ্মণ হয়েছে, লড়ায়ে মোরগ কোথাকার!" আমার কাকার শ্যালকপুত্র আমার পক্ষ নিতে এসেছিল, তাকেও বলল, "যবন কোথাকার, নাগর ব্রাহ্মণ হয়েছে!" শিশুকালেও ছোট ছেলেদের এমনি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুনেছি, কিন্তু তখন সে সব আমাকে এত তীব্রভাবে আঘাত করে নি, অথবা ওতে এত কিছু ভাববারও অবকাশ হয়নি। আমরা তিনজন ছাড়া পাঠশালায় ত্রিশজন বিদ্যার্থী, চারজন বিদ্যার্থিণীও ছিল। এরা দেখতে আমাদের মত গৌর বা দীর্ঘকায় নয়, তবু তারা এমন ভাব দেখাত যেন আমরা তাদের অধীন থাকতে বাধ্য।

সেদিন ঘরে ফিরে এলে আমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আমার শুষ্ক অধর দেখে মা আমার মুখ-চুম্বন করে বললেন—

"আজ এত বিমর্ষ কেন তুই?"

আমি প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু মা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতে বললাম—

"মা, আমাদের কুলে কি এমন কিছু আছে, যে জন্য লোকে আমাদের ব্রাহ্মণ বলে মানতে চায় না?"

"আমরা পরদেশী ব্রাহ্মণ, পুত্র, এজন্য তারা অমনি ভাবে।"

"শুধু ব্রাহ্মণ নয় মা, অব্রাহ্মণরাও আমাদের ব্রাহ্মণত্বে এমনি সন্দেহ প্রকাশ করে।"

"ব্রাহ্মণেরা বলে বলেই অন্যেরাও বলে।"

"আমাদের যজমানীও নেই; অন্য ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত-গিরি করে, ব্রাহ্মণ-ভোজনে

যায়, আমাদের কুলে তাও দেখা যায় না। এছাড়া অন্য ব্রাহ্মণেরা ত আমাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনেও রাজী হয় না। জানো যদি ত বল।"

মা আমাকে অনেক বোঝালো কিন্তু, আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

আমার চিত্ত যখন এমনি চঞ্চল, সে সময় আমার নাগর সহপাঠী এবং আত্মীয়দের আমার উপর সহানুভূতি ছিল। অথবা বলা যায়, আমরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম।

২

সময় আরও অতিবাহিত হল। আমি তের বছরের হয়ে উঠলাম এবং পাঠশালার শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত হয়ে এল। বেদ, ঋগ্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং কিছু কাব্যও আমি পড়েছিলাম। আমার প্রতি গুরুদেবের স্নেহ বেড়েই চলেছিল। তার কন্যা বিদ্যা আমাপেক্ষা চার বছরের ছোট ছিল। পাঠ মুখস্থ করতে আমি তাকে সাহায্য করতাম। গুরুদেব এবং গুরুপত্নীর ব্যবহার দেখে বিদ্যাও আমাকে খুব মান্য করত, আমাকে 'ভাই-সুপর্ণ' বলে ডাকত। গুরু পরিবারে আমার কখনো দুঃসময় আসে নি, কারণ গুরুপত্নীর স্নেহ আমার কাছে মায়ের সমানই ছিল।

এই সময় আবার একদিন এক সহপাঠী আমাকে 'লড়ায়ে-মোরগ' বলে বিদ্রূপ করল, সম্পূর্ণ অকারণেই। নিজেকে আমি তখন সকল দিক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। লেখাপড়ায় আমি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ছিলাম বলে সহপাঠীদের আমার উপর ঈর্ষা হত, এছাড়া বিদ্রূপের আর কোনোই কারণ ছিল না। আমার প্রকৃতি গম্ভীর হয়ে উঠছিলো। মন উত্তেজিত হত না, তা নয়, কিন্তু আমি ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করতে শিখেছিলাম। আমার ঠাকুর্দার বয়স সত্তর বছরের উপর ছিল। বহুবার আমি তাঁর কাছে দেশ-বিদেশ, যুদ্ধ-অশান্তির কাহিনী শুনেছি। এও শুনেছিলাম যে, প্রথমে তিনিই আপন ভাইএর সঙ্গে এই গ্রামে আসেন। ঠাকুর্দার কাছ থেকে আপন কুল সম্বন্ধে আসল কথা জানতে আমি দৃঢ়সংকল্প হলাম গ্রামের পূর্বদিকে আমাদের এক আমবাগান ছিল। যথেষ্ট আম ফলেছিলো সেখানে। যদিও পাকতে তখনও অনেক দেরী, সোনাদাসী ইতিমধ্যেই সেখানে নিজের ডেরা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। শুনেছি, আমার ঠাকুর্দা যখন গ্রামে এলেন তখন সোনাকে তিনি কোনো দক্ষিণদেশীয় ব্যাপারীর কাছ থেকে চল্লিশ রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে কিনেছিলেন। ঐ সময় দক্ষিণ থেকে বহু ব্যবসায়ী বিক্রয় করবার উদ্দেশ্যে দাস-দাসীদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতো। সোনা তখন যুবতী ছিল, না হলে দাসীরা অত মূল্যবান কখনোই হয় না। সোনার দেহের কালো চামড়া ঢিলে হয়ে পড়েছিল, মুখমণ্ডল কুঞ্চিত বলিরেখায় ভরে গিয়েছিল, কিন্তু

লোকে বলে একদিন সে সুন্দরী ছিল। ঠাকুর্দার অত্যন্ত প্রিয় ছিল সে, বিশেষ করে যখন নিরালায় শুধু দুজনে থাকত। লোকে অবশ্য এই ঘনিষ্ঠতার অন্য অর্থ করত। বিপত্নীক স্বাস্থ্যবান এক প্রৌঢ় ব্যক্তির উপর সে সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর্দা বাগানে যেতেন, একদিন আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। ঠাকুর্দা আপন মেধাবী পৌত্রকে বড়ই স্নেহ করতেন। কথা বলতে বলতে আমি একসময় বললাম,—

"দাদু, আমি তোমার কাছ থেকে আমাদের কুল সম্বন্ধে সত্যি কথা জানতে চাই, কেন লোকে আমাদের খাঁটি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না, কেন লড়ায়ে-মোরগ, বলে বিদ্রূপ করে? মাকে আমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু তিনি আমাকে এসম্বন্ধে বলতে চান না।"

"একথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছো ভাই?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে দাদু। যদি আমি আসল কথা সঠিক জানতে পারি, তবে নিজ কুলের অপমানের প্রতিকার করতে পারব। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আমি এখন অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি দাদু। আমার এতখানি বিদ্যাবল আছে যে নিজ কুলের সম্মান আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব।"

"সে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভাই, তোমার মা-বেচারীই আমার কুল সম্বন্ধে কিছু জানে না। কাজেই, সে কিছু বলতে চায় না এমন ভেবো না। পৃথিবীতে আমাদের কুলের স্থিতি এখন নাগরদের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। আমাদের বিবাহ-ইত্যাদি ওদের সঙ্গেই হয়। অবন্তী এবং লাট (গুজরাট)-এ ওদের সংখ্যাও অনেক, এজন্য ওদের সঙ্গেই আমাদের ডুবতে-ভাসতে হয়। তোমার বংশ বস্তুতঃ যৌধেয় অপেক্ষা নাগরের সঙ্গেই অধিক সম্পর্কিত।"

"যৌধেয় কি দাদু?"

"আমাদের কুলের নাম ভাই। এইজন্যেই ত লোকে আমাদের লড়ায়ে-মোরগ বলে।"

"যৌধেয়রা ব্রাহ্মণ ছিল দাদু?"

"ব্রাহ্মণের চেয়েও শুদ্ধ আর্য ছিল।"

"কিন্তু ব্রাহ্মণ ত নয়!"

"এর উত্তরে এককথায় 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার চেয়ে তোমাকে যৌধেয়দের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়াই ভাল। যৌধেয়রা শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী হিমালয় থেকে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী এবং অধিকার ছিল। সমগ্র যৌধেয় পরিবারটাই এই অঞ্চলের অধিকারী ছিল।"

"সমগ্র যৌধেয় পরিবার?"

"হ্যাঁ, তাদের কোন একজন রাজা ছিল না, তাদের রাজ্যকে গণরাজ্য বলা হত। গণ বা পঞ্চায়েতই সকল রাজকার্য চালাত। তারা এক রাজার অধীন রাজত্বের অত্যন্ত বিরোধী ছিল।"

"এমন রাজ্য হওয়ার কথা ত কোনোদিন শুনিনি দাদু ?"

"কিন্তু এমনই হতো ভাই। আমার কাছে যৌধেয় গণরাজ্যের তিনটি মুদ্রা আছে, আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। দেশ ছেড়ে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে যে মুদ্রা ছিল, এগুলো তারই এক অংশ।"

"তুমি যৌধেয়দের দেশে জন্মাওনি দাদু ?"

"আমার বাবা মাকে যখন দেশ ছাডতে হল, আমি তখন দশ-বছরের। আমার দুজন বড়ভাইও ছিল, যাদের বংশীয়দের তুমি এখানে দেখছ।"

"দেশ কেন ছাড়তে হল দাদু ?"

"পুরাকাল থেকে ও জায়গা যৌধেয়দেরই ছিল। বড় বড় প্রতাপশালী রাজা—মৌর্য, যবন, শক—ভারতভূমিতে জন্মেছিল, কিন্তু কেউ-ই সামান্য রাজকর আদায় করা ছাড়া আমাদের গণরাজ্যকে কোন আঘাত করেনি। চন্দ্রগুপ্ত, হ্যাঁ এই চন্দ্রগুপ্ত যিনি নিজেকে বিক্রমাদিত্য বলেন, এবং উজ্জয়িনীতেও কখনো কখনো যাঁর দরবার বসে। সেই চন্দ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষ গুপ্তবংশ যখন সিংহাসনে বসল তখন তারা যৌধেয়দের উচ্ছেদ করে দিল। যৌধেয়রা প্রতাপশালী সম্রাটকে কিছু কিছু কর দিত, কিন্তু গুপ্ত রাজা তাতে খুশী হলেন না। তিনি বললেন, আমি এখানে আপন উপরিক (গভর্ণর) নিযুক্ত করবো, এখানে আমার নিজের কুমারামাত্য (কমিশনার) থাকবে। আমি আমার সমগ্র রাজ্য যে ভাবে শাসন করি, এখানেও তেমনি করব। আমাদের গণ-নায়কগণ অনেক বোঝালো যে যৌধেয়রা অনাদিকাল থেকে গণশাসন ছাড়া অপর কোন শাসন জানে না। কিন্তু ক্ষমতামদমত্ত রাজা সে কথা মানবে কেন ? অবশেষে যৌধেয়রা আপন ইষ্ট গণদেবীর সামনে শপথ গ্রহণ করে তরবারি ধরল। বহুবার তারা গুপ্ত সেনানীকে মেরে হঠিয়ে দিল। যৌধেয়দের তুলনায় চার পাঁচ গুণ বেশী সৈন্য নিয়েও গুপ্তসেনানীরা টিকতে পারত না। কিন্তু, ব্রহ্মপুত্র থেকে মরুঅঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সংগে যুদ্ধে যৌধেয়রা কতক্ষণ আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে ? গুপ্ত সৈন্যেরা আমাদের শহর গ্রাম সমস্ত ধ্বংস করে দিল, নর-নারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করল। আমাদেব লোকেরা ত্রিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েছিল। বেশী কর দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু চেয়েছিল যে, তাদের দেশের গণশাসন প্রণালী অক্ষুণ্ণ থাক।"

"সেই গণশাসন কেমন ছিল দাদু ?"

"সে শাসনে প্রত্যেকটি যৌধেয় শির মাথা উঁচিয়ে চলতো, কারও সামনে দীনতা প্রকাশ করতে তারা জানতো না। যুদ্ধ তাদের কাছে একটা খেলাবিশেষ ছিল, এইজন্যই তাদের বংশের নাম যৌধেয় হয়েছে।"

"আমাদের মত আরও কোনো যৌধেয় এমনি রয়ে যায় নি।"

"আছে ভাই, কিন্তু তারা ছড়িয়ে পড়েছে—হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শুকনো পাতার মত।"

"আর আমাদের মত কেউ নাগর-বংশের সঙ্গে মিলে-মিশে আত্মবিস্মিত হয়ে পড়েনি ? আমরা নিজেদের ব্রাহ্মণ কেন বলি দাদু ?"

"সে আরও প্রাচীন কথা ভাই। প্রথমে সর্বত্রই গণরাজ্য ছিল, রাজা বলে কিছুই ছিল না। সে সময় ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মাঝে কোনো প্রভেদ ছিল না।"

"ব্রহ্ম-ক্ষত্র একই বর্ণ ছিল দাদু ?"

"হ্যাঁ, যখন প্রয়োজন হত লোকে পূজা পাঠ করত, যখন প্রয়োজন হত অস্ত্র ধরত। কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এসে বর্ণবিভাগ সুরু করল।"

"তাহলে ত এক পিতার দুই পুত্রেব মধ্যে কেউ রন্তিদেবের মত ক্ষত্রিয় কেউ গৌরিবীতির মত ব্রাহ্মণ ঋষি হতে লাগলেন।"

"এমন কথা লিখেছে ভাই ?"

"হ্যাঁ দাদু, বেদ এবং ইতিহাসে এমন কথা পাওয়া যায়। সংকৃতি ঋষির ওই দুই পুত্র ছিল। শুধু এই নয়, আরও কত বিচিত্র কথা পুরাণে পাওয়া যায়, যে সব আজকালকার লোকে বিশ্বাস করে না। চর্মনবতীর (চম্বল) পারে দশপুর দেখেছো দাদু ?"

"হ্যাঁ ভাই, অবন্তী (মালাবা) কতবার গিয়েছি, ওখানেই ত ? সেখানে বিয়েতে কতবার না আমি গিয়েছি। ওখানে অনেকঘর নাগর আছে, আব তাদের ভিতর অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীও আছে।"

"এই দশপুর রন্তিদেবের রাজধানী ছিল। আর চর্মনবতী নাম কি করে হলো সে ত আরও আশ্চর্যকাহিনী এক্।"

"কি ভাই ?"

"ব্রাহ্মণ-সংকৃতির পুত্র কিন্তু নিজে ক্ষত্রিয়, রাজা বন্তিদেব অতিথিসেবার জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সত্যযুগের ষোলোজন মহান রাজার মধ্যে একজন ছিল। রন্তিদেবের ভোজনশালার জন্য প্রতিদিন দুহাজার করে গরু মারা হত। তাদের চামড়া রসুইখানায় রাখা হত। তা থেকে যে রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তো তাতেই এক নদী সৃষ্টি হয়ে গেল। চামড়া থেকে উৎপত্তি বলে তার নাম হল চর্মনবতী।"

"বৎস এসব কি সত্যিই পুরাণে লেখা আছে ?"

"হ্যাঁ দাদু, মহাভারতে * পরিষ্কার লেখা আছে।"

---

*"রাজ্ঞো মহানসে পূর্ব রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ।
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা।"
"সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তিরভবন্ন‍্‌পস্য দ্বিজসত্তম।"—বনপর্ব ২০৮।৮-১০
"মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সংসৃজে যতঃ।
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী।"—শান্তিপর্ব ১৯-২৩

"মহাভারতে, পঞ্চম বেদে ? গোমাংস ভক্ষণ !"

"রন্তিদেবের ওখানে অতিথিদের খাওয়ার জন্য এই গোমাংস রন্ধনের কাজে দুহাজার পাচক নিযুক্ত ছিল। আর এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ অতিথিদের সংখ্যাও এত বেড়ে উঠত যে মাংস কম পড়ে যাওয়ার ভয়ে পাচকদের, মাংসের বদলে সুপ বেশী করে নেবার অনুরোধ জানাতে হত।"

"ব্রাহ্মণেরা গোমাংস খেত, কি বলছ ভাই ?"

"মহাভারত হচ্ছে পঞ্চমবেদ,—তা কি মিথ্যা বলতে পারে দাদু ?"

"দুনিয়া কি এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল ?"

"উল্টে-পাল্টেই যায় দাদু, তবু নিজেদের খাঁটি ব্রাহ্মণ বলা এই সব দিবান্ধরা সকলের চোখেই ধূলো দিতে চায়। আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের পূর্বজ যৌধেয়রা ব্রাহ্মণদের এই ছলাকৌশল ছড়াবার আগে যুগের ধর্ম এবং রীতিনীতি মেনে চলত।"

"হ্যাঁ, আর তারা কখনো ব্রাহ্মণকে নিজেদের চেয়ে উঁচু মনে করত না।"

"এখানে এসে তুমি পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ে মাননীয় ব্রাহ্মণদের ছেড়ে নাগরদের সঙ্গে দিলে কেন ?"

"দুটো কারণ ছিল। এক ত, এইসব ব্রাহ্মণেরা আমাদের কুল সম্বন্ধে সন্দেহ করত, কিন্তু তাতে অবশ্য কিছু যেত আসত না, ইচ্ছা করলে আমরা খাঁটি ব্রাহ্মণ কন্যাকেই বিবাহ করতে পারতাম। নাগরদের সাথে আমরা এইজন্যই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলাম যে, তারাও আমাদের মত অতিগৌরবর্ণ এবং ব্রাহ্মণেরা স্বীকার না করা সত্ত্বেও আমাদের মতই তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে থাকে।"

"নাগর কারা দাদু ?"

"ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ বললেই ত লোকে মানবে না, তারা জিজ্ঞাসা করবে কোথাকার ব্রাহ্মণ, কি গোত্র। আমাদের কুটুম্ব নাগররা নগরে বাস করত, এইজন্যই এরা নিজেদের নাগর ব্রাহ্মণ বলতে আরম্ভ করে। আমরা যেমন নিজেদের যৌধেয় ব্রাহ্মণ বলে থাকি।"

"কিন্তু বস্তুতঃ তারা কে দাদু ?"

"সমুদ্রতীরের যবন। এদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণধর্মের বদলে বৌদ্ধধর্মকে মেনে চলে। উজ্জয়িনী গেলে এসব বোঝা যাবে। এমনও বহু আছে যারা নিজেদের খাঁটি যবন বলে থাকে।

"সাংকৃতি রন্তিদেবং চ মৃতং সঞ্জয় ! শুশ্রুম।
আসন্ দ্বিশতসাহস্রা তস্য সূদা মহাত্মনঃ ॥
গৃহানভ্যাগতান্ বিপ্রাণ্ অতিথীন্ পরিবেষকাঃ ।—দ্রোণপর্ব ৬৭।১-২
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশান্তি সুমৃষ্টমণি কুণ্ডলা ॥
সূপং ভূয়িষ্টমশ্নীধ্বং নাদ্য মাংসং যথা পুরা ॥—দ্রোণপর্ব, ৬৭।১৭-১৮
—শান্তিপর্ব ২৭-২৮

"ব্রাহ্মণরা এদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছে।"

"তাহলে বর্ণ এবং জাতি এই মানা এবং মানাবার উপরই চলছে?"

"দেখে ত সেইরকমই মনে হয় ভাই।"

৩

আমি এখন বিশ বছরের বলিষ্ঠ সুন্দর তরুণ, গ্রামের পাঠ সমাপ্ত করে উজ্জয়িনীর বড় বড় বিদ্বানগণের শিক্ষার্থী হলাম। আমার মায়ের পিতামহের পরিবার উজ্জয়িনীর এক ধনাঢ্য নাগর পরিবার। তারা আগ্রহ করে আমাকে নিজেদের কাছে রেখেছে। আমার মত গ্রাম্য বিদ্যার্থীর কাছে বিশাল পৃথিবীকে দেখবার গবাক্ষ-পথ হল এই উজ্জয়িনী। কালিদাসের নাম এবং তাঁর কিছু কবিতা আমি পূর্বেই পড়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে কিছুদিন সেই মহান্ কবির কাছে পড়বার সৌভাগ্য লাভ করলাম। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবির অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। এজন্য অনেকসময় তিনি উজ্জয়িনীতে অনুপস্থিত থাকতেন। কবিগুরুর সম্বন্ধে আমার মনে অনেক গর্ব ছিল। কিন্তু রাজার সম্বন্ধে কালিদাসের দাসমনোবৃত্তি আমার বড়ই খারাপ লাগত। এই সময় কবি 'কুমার সম্ভব' লিখছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, "বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তকেই আমি এখানে শংকরপুত্র কুমার কার্তিকেয়-র নামে অমরতা প্রদান করতে চাই।" এবিষয়ে আমার নিঃসংকোচ কটাক্ষ অত্যন্ত তীব্র হলেও কবি বিরূপ হতেন না। আমি একদিন বললাম,—

"আচার্য, আপনার কাব্যপ্রতিভাব রাজ্য অনন্তকালের জন্য, আর চন্দ্রগুপ্ত কুমারগুপ্তের রাজত্ব শুধু তাঁদের জীবনকাল পর্যন্ত, তবে আপনি কেন নিজেকে রাজার সামনে এত অকিঞ্চন করে রাখেন।"

"বিক্রমাদিত্য বস্তুতঃ ধর্ম সংস্থাপক, সুপর্ণ! উনি হূণদের হাতথেকে ভারতভূমিকে মুক্ত করেছেন।

"কিন্তু উত্তরাপথ (পাঞ্জাব) এবং কাশ্মীরে এখনও হূণেরা আছে, আচার্য!"

"বহু অঞ্চল থেকেই তারা বিতাড়িত হয়েছে।"

"এমনি ভাবেই এক রাজা অপরকে বিতাড়িত করে তার জায়গায় নিজ রাজ্য স্থাপন করে নেয়।"

"কিন্তু গুপ্তবংশ গো-ব্রাহ্মণের রক্ষক।"

"আচার্য, মূঢ়ব্যক্তিদের ধোঁকা দেবার মত এইসব কথা আমি আপনার মুখথেকে শুনব আশা করি নি। আপনি জানেন, * আমাদের পূর্বজ ঋষিরা গোরক্ষা করতেন

* ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যণ্,
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবিপরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্।—মেঘদূত ১।৪৫

গোভক্ষণের জন্য। 'মেঘদূতে' আপনিই চর্মনবতীকে গো-হত্যা থেকে উদ্ভূত রন্তিদেবের কীর্তি বলে বর্ণনা করেছেন।"

"তুমি ধৃষ্ট সুপর্ণ, প্রিয় শিষ্য আমার!"

"তা শুনতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি এ সহ্য করতে রাজী নই যে আমার অনন্ত কালের গুরু এ ধর্মধ্বংসকারী গুপ্তরাজার সামনে চাটুকারের মত পড়ে থাকবে।"

"তুমি ওদের ধর্মধ্বংসকারী বলছো সুপর্ণ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নন্দ, মৌর্য, যবন, শক আর হূণেরাও যে পাপ করেনি এই গুপ্তরা তাও করেছে। ভারতভূমি থেকে এরা, গণরাজ্যের নাম মুছে দিয়েছে।"

"গণরাজ্য এ যুগের অনুকূল নয় সুপর্ণ। যদি সমুদ্রগুপ্ত এই গণরাজ্যকে কায়েম করে রাখতেন, তবে তিনি হূণ এবং অপরাপর প্রবল শত্রুদের পরাস্ত করবার সফলতা অর্জন করতে পারতেন না।"

"সফলতা! নিজ রাজ্য কায়েম করবার! দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য হবার! কিন্তু চাণক্যের বিশ্ববিশ্রুত বুদ্ধির সহায়তায় স্থাপিত এবং ব্যবস্থাপিত মৌর্য সাম্রাজ্যও বেশীদিন টেঁকে নি। বিক্রমাদিত আর কুমার গুপ্তও যাবৎচন্দ্রদিবাকর শাসন করবে না। কিন্তু এরা যে গণশাসনের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়েছে তা কোন্ ধর্মকর্মের জন্য? অনাদিকাল থেকে চলে আসা গণরাজ্যের গণশাসনকে উচ্ছেদ করা কি মহা অধর্মের কাজ নয়?"

"কিন্তু রাজা বিষ্ণুর অংশ-বিশেষ।"

"কুমারগুপ্ত আপনার সাথে ময়ূরের চিত্র অংকিত করবে এবং কালকের কোন কবি তাকে কুমারের অবতার বলবে। এই ধোঁকাবাজী, এই বিকৃতি কিসের জন্য? সুস্বাদু, সুগন্ধ চাল, আর মধুর মাংসস্তূপের জন্য, রাষ্ট্রের সমস্ত সুন্দরীকে আপন প্রমোদপুরে ঢোকাবার জন্য, কৃষি আর শিল্পকর্মে নিষ্পেষিত মানুষের কষ্টোপার্জিত অর্থ আপন সুখের আশায় জলের মত খরচ করবার জন্য! আর এজন্য আপনি গুপ্তদের ধর্ম সংস্থাপক রাজা বলছেন। বিষ্ণু? হ্যাঁ গুপ্তরা নিজেদের বৈষ্ণব বলে প্রচার করবার কড়া-কৌশল বের করেছে। ব্রাহ্মণেরা তাদের বিষ্ণুর অংশ বানাচ্ছে। তাদের মুদ্রার উপর লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করা হচ্ছে। বিষ্ণুর মূর্তি আর মন্দির তৈরীর জন্য প্রজাদের ভাতে মেরে, তাদের সর্বস্ব লুটে প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে, এই আশায় যে গুপ্তবংশের রাজত্ব অনন্তকাল ধরে কায়েম থাকবে।"

"কিন্তু এসব তুমি কি বলছ সুপর্ণ! রাজার বিরুদ্ধে এত কঠোর কথা বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, আচার্য, আজ আপনার সামনে বলছি। কোনোদিন পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তর সামনেও বলবো। জীবিতাবস্থায় আমার পক্ষে এই ধোঁকাবাজী বরদাস্ত করা মুস্কিল। কিন্তু এ ভবিষ্যতের কথা, দূরের কথা। আমি চাই আপনিও অশ্বঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।"

"কিন্তু সুপর্ণ, আমি নিছক কবি, অশ্বঘোষ কবি এবং মহাপুরুষ দুই-ই ছিলেন। তাঁর কাছে সংসারের সুখভোগের কোনই মূল্য ছিল না, আমি চাই বিক্রমাদিত্যের প্রমোদশালার

সুন্দরীদের মত সুন্দরী, চাই রক্তবর্ণ দ্রাক্ষাসুরা, চাই প্রাসাদ এবং পরিচারক। আমি কেমন করে অশ্বঘোষ হতে পারি? আমার 'রঘুবংশে' ছদ্মনামে আমি গুপ্তবংশেরই প্রশংসা করেছি যাতে প্রসন্ন হয়ে বিক্রমাদিত্য এই প্রাসাদ দিয়েছেন, কাঞ্চনমালার মত যবনসুন্দরী আমাকে প্রদান করেছেন—পনেরো বছর আমার সঙ্গে থেকেও যে আমাকে তার সোনালী কেশ-পাশে বেঁধে রেখেছে। আমি এখন 'কুমারসম্ভব' রচনা করছি, দেখো এ এখন আরও কত কি এনে দেয় আমার হাতে।"

"আমি বিশ্বাস করি না আচার্য, আপনি যদি বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ লিখতেন তবে আপনাকে বুভুক্ষায় মরতে হত বা সর্বতোভাবে ভোগ সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হত। এ আপনার ভুল ধারণা আচার্য যে, রাজার স্তুতি না করলে আপনার জীবন সম্পূর্ণ নিরস হয়ে যাবে। আগামীদিনের কবিদের জন্য আপনি অত্যন্ত কু-উদাহরণ রেখে যাচ্ছেন। সকলেই কবি কালিদাসকে অনুকরণের নামে নিজের দোষ ঢাকতে চাইবে।"

"ও রকমের কাব্যও আমি লিখবো।"

"কিন্তু এমন কিছুই ত লিখবেন না যাতে গুপ্তদের পাপকাজকে আঘাত হানা হয়।"

"সে আমার দ্বারা হবে না সুপর্ণ, আমি বড় নরম হয়ে পড়েছি।"

"আর রাজানুষ্ঠিত সকল পাপের স্বপক্ষে ধর্মের দোহাইও ত দেবেন?"

"তারও ত প্রয়োজন আছে। এছাড়া রাজশক্তি দৃঢ় হতে পারে না, বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রও এমনি করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন।"

"বশিষ্ঠ আর বিশ্বমিত্রও কবি কালিদাসের মত প্রাসাদ এবং সুন্দরীর লোভে এই পাপে পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন।"

"সুপর্ণ, পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও শুনলাম, যুদ্ধ-বিদ্যাও তুমি শিখছো, যদি তোমার সম্মতি থাকে ত মহারাজাধিরাজকে বলি। তোমাকে কুমারামাত্য বা সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত দেখলে বড়ই খুশী হবো আমি, মহারাজাও খুশী হবেন!"

"আমি কারও কাছেই নিজের দেহ বিক্রয় করবো না আচার্য!"

"আচ্ছা, রাজপুরোহিতগণের মধ্যে একটা স্থান যদি পাও?"

"ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতায় আমার ঘৃণা ধরে গেছে।"

"কি করবে তাহলে?"

"আপাততঃ আরও পড়াশুনা এবং বিদ্যার্জন করব।"

৪

উজ্জয়িনীতে থাকার সময় আমি শুধু নিজের জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করবার সুযোগই পাই নি, পরন্তু; আগেই যেমন বলেছি, বিস্তৃত এই সংসারকে জানবার সুযোগও

আমার হয়েছে, সেখানে থাকতে কাছে থেকে আমি দেখেছি, কেমন করে ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছে। এমন সময় ছিল যখন অপরে স্বীকার না করলেও ব্রাহ্মণত্বের গর্ব আমার অত্যন্ত প্রবল ছিল। গ্রাম ছেড়ে আসবার আগেই এই গর্ব মিলিয়ে যাচ্ছিল। গ্রাম ছেড়ে নগরে আসবার পর আমি খাঁটি যবনদেব দেখলাম, যারা প্রায়ই ভরুকচ্ছ (ভরোচ) থেকে উজ্জয়িনী আসত। সেখানে তাদের বড় বড় অনেক দোকান ছিল, আমি বহু শক—আভীর পরিবারে গিয়েছি, যাদের পূর্ব-পুরুষেরা একশতাব্দী আগেও উজ্জয়িনী, লাট (গুজরাট) এবং সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়)-র শাসক মহাক্ষত্রক ছিল। পাকা নারংগী রংএর গাল, রোমহীন মুখমণ্ডল এবং গোলাকার আঁখিযুক্ত হূণদেরও আমি দেখেছি। যুদ্ধে এরা অত্যন্ত নিপুণ, কিন্তু অন্যদিকে এদের তেমন প্রতিভা নেই। এইসব রকমারি লোকদের দেখবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হল বৌদ্ধ বিহার (মঠ), একাধিক সংখ্যায় যা উজ্জয়িনীর বহির্দেশে স্থাপিত রয়েছে। আমার মাতুল কুলের লোকেরা বৌদ্ধ ছিলেন, আর বহু নাগর ভিক্ষু এইসব মঠে থাকতেন। এজন্য আমাকে প্রায়ই সেখানে যেতে হত। ভরুকচ্ছতেও আমি একবার গিয়াছিলাম।

পুস্তকের পাঠ সমাপ্ত করে আমি দেশভ্রমণের সাহায্যে আমার জ্ঞান প্রসারিত করতে চাইলাম। এই সময় আমি জানতে পারলাম যে বিদর্ভে অচিন্ত (অজন্তা) বিহার নামে এক প্রসিদ্ধ বিহার আছে। যেখানে পৃথিবীর সকল দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এসে থাকেন।

আমি সেখানে গেলাম।

এতদিন পর্যন্ত আমি যেখানেই গিয়েছি, আমার সঙ্গে প্রচুর সম্বল এবং সহায়-সঙ্গী নিয়ে গিয়েছি। এবারেই প্রথম আমি নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় বেরিয়ে পড়লাম। পথে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না; গুপ্তদের এই ব্যবস্থার প্রশংসাই করতে হবে। কিন্তু গুপ্ত-শাসন কি দেশের প্রত্যেক পরিবারকে এতই সমৃদ্ধ করে রেখেছে যে বাটপারি-রাহাজানি সম্পূর্ণ উঠে গেল? না। গুপ্তরাজেরা কর আদায় ব্যাপারে পূর্বতন সকল শাসককেই হার মানিয়েছে। রাজপ্রাসাদ তৈরীর কাজে কখনো এত অর্থ ব্যয়িত হয় নি। আর এই প্রাসাদ সজ্জিত করতে আরও কত অর্থই না ব্যয় হয়েছে। পাহাড়, নদী, সরোবর সমুদ্রকে সশরীরে উঠিয়ে এনে এরা আপন সুরম্য প্রাসাদের সংলগ্ন করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছে। এদের ক্রীড়ণক সত্যিকারের বনের মতই মনোরম। এখানে পিঞ্জরে আবদ্ধ হিংস্র পশু আর খোলাজায়গায় মৃগ-হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়। ক্রীড়াপর্বতে স্বাভাবিক পার্বত্য বন-উপবন, জলপ্রপাত তৈরী করা হয়েছে। সরোবরের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম জলস্রোতের উপর সেতু আর নৌকার বহর দেখা যায়। হাতির দাঁত, সোনা, রূপা নানারূপ রেশমী বস্ত্র এবং মহার্ঘ গালিচায় প্রাসাদের অন্তর্দেশ সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদকে সজ্জিত করতে চিত্রকর তার তুলির সৌন্দর্য সবটুকুই ঢেলে দিয়েছে। ভাস্কর তার মর্মর এবং ধাতু নির্মিত মূর্তি সুন্দররূপে বিন্যাস করেছে। বিদেশী যাত্রী এবং রাজদূতের মুখে আমি এই সব চিত্র এবং মূর্তির ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনেছি, যাতে সত্যিই আমার শির গর্বোন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু যখন আমি ক্ষুদ্র গ্রামের পর্ণ কুটিরের অবস্থা দেখেছি, তখন উজ্জয়িনীর

এই প্রাসাদ আমার দেহের রক্ত চঞ্চল করে তুলছে। মনে হয়েছে, গ্রামের দেওয়াল এবং টিলা যেমন আপনাদের গরথাইগুলোর কারণ, তেমনি এই দারিদ্র্যের কারণ এইসব প্রাসাদ। নগর-সহরেই শুধু নয়, গ্রামেও নিপুণ শিল্পীরা নানা রকমের জিনিষ তৈরী করে থাকে। স্ত্রীলোকেরা মিহি সূতা কাটে এবং তন্তুবায়রা তা' দিয়ে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করে। স্বর্ণকার, লৌহকার, চর্মকার আপন আপন শিল্পতৈরীতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে রাজপ্রাসাদে কলাচাতুর্যময় আসবাব পত্রের নির্মাতারা এদেরই আত্মীয়স্বজন। কিন্তু যখন আমি এদের দেহ এবং বাসগৃহের অবস্থা দেখেছি তখন বুঝেছি যে, এদেরই হস্তনির্মিত দ্রব্যসম্ভার এদের কাছে স্বপ্নমায়া স্বরূপ। এরা গ্রাম থেকে অদৃশ্য হয়ে নগর-সহরের সৌধ, প্রাসাদ এবং অন্য নগরে চলে যায়। আবার সেখানে থেকে এদের অনেকে পশ্চিমী সমুদ্রতীরে ভরুকচ্ছ আদি তীর্থ হয়ে পারস্য বা মিশরের পথ ধরে, অথবা পূর্ব সমুদ্রতীরে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হয়ে যবদ্বীপ, সুবর্ণ দ্বীপ পৌঁছে যায়। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য এত শক্তিশালী কোনদিনই হয়নি, এবং আপন পণ্যের বিনিময়ে সমুদ্রপারের লক্ষ্মীও এত বেশী মাত্রায় কখনও ভারতে আসেনি। কিন্তু এতে লাভ কার? সকলের চেয়ে বেশী গুপ্তরাজাদের, তারা সকল পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক আদায় করে থাকে; তারপর সামন্ত প্রভুদের মধ্যে যারা বড় বড় রাজপদ বা জায়গীরের অধিকারী, তারা কারিকর এবং ব্যবসাদার দু'য়ের কাছে থেকেই লাভের অংক লোটে; এবং ব্যবসাদারের নাম সবশেষে করলেও এই লুটে তারাও নেহাত ছোট অংশীদার নয়। এদের সবাইকে দেখে আমাব কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে, গ্রামের কৃষক এবং কারিগরেরা এত গরীব কেন, এবং ছোট বড় রাজপথ সমূহকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য গুপ্তরাজাদের এত তৎপরতা কেন? গ্রামে দারিদ্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু হৃদয় বিদারক দৃশ্য এখানে কমই দেখা যায়। এখানে পশুর মত বিকিয়ে যাওয়া দাসদাসীর হাট বসে না, ওদের নগ্ন শরীরে চাবুকের দাগ চোখে পড়ে না। আমার গুরু কালিদাস কোন এক কথার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পূর্বজন্মের কর্মফলস্বরূপ লোকে দাস হয়। যে দিন তাঁর মুখে আমি এই কথা শুনি, সেইদিনই পূর্বজন্ম সম্বন্ধে আমার সমস্ত বিশ্বাস উবে গেল। গুপ্তরা যেভাবে দ্রুত ধর্মকে সকল রকমে আপন সত্বা দৃঢ় করবার কাজে লাগিয়াছে, তাতে এখন সকল চিন্তাশীল লোকের মনেই এই ভাব আসা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আমি সাধারণ প্রজাদের দেখতাম, এ বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ উদাসীন মনে হত। কেন? সম্ভবতঃ তারা নিজেদের অসহায় মনে করত। গ্রামবাসীরা শুধু আপন গ্রামের গণ্ডীরই খোঁজখবর রাখত। গ্রামের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ভূমির জন্য তারা লড়াইও করত। সম্ভবতঃ কুমারগুপ্তাও নিজের কোন ভুক্তির প্রদেশের জন্য এত বিক্রমের সঙ্গে লড়তে পারত না। কিন্তু গ্রামের সীমানার বাইরে যাই ঘটে থাক, এরা তার সম্বন্ধে কোনই খোঁজ রাখত না। একটি গ্রামের ঘটনা আমার মনে আছে। সেখানে প্রায় চল্লিশটি কুটির ছিল, সবই খড়ের ছাউনি দেওয়া! গরমের দিনে উনুন থেকে একটা ঘরে আগুন লেগে যায়। সারা গ্রামের লোক জল নিয়ে নিয়ে সেই ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু একটি ঘরের এক দম্পতী

ঘড়ায় জল ভরে আপন ঘরের কাছে বসে রইল। সৌভাগ্য বশতঃ গ্রামে এমন গৃহ ঐ একটিই মাত্র ছিল, না হলে গ্রামের একটা ঘরও সেদিন রক্ষা পেত না। সে সময় আমার যৌধেয় গণরাজ্যের কথা মনে পড়ে গেল, সেখানে রাষ্ট্রের সকল গৃহের লোক আপন রাষ্ট্রের জন্য জীবন-মরণ পণ করতেও কুণ্ঠিত হত না এমনিতে ত সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, কুমার গুপ্তের দিগ্বিজয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু দাসের মত সে শুধু অপরের লাভের জন্য। স্বাধীন মানুষের মত নিজের এবং নিজ নিজ জনগণের হিতার্থে নয়। জনসাধারণে মাত্র একশ' বছরের এই গুপ্তশাসনের প্রভাব লক্ষ্য করে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। আমি ভেবে দেখলাম, যদি এমন শাসন কয়েক শতাব্দী ধরে চলতে থাকে তবে এই দেশ সম্পূর্ণ ভাবে দাসের দেশে পরিণত হ'য়ে যাবে। যারা শুধু আপন রাজার জন্যই লড়তে-মরতে জানবে, যাদের মন থেকে এই চিন্তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে যে, মানুষেরও কিছু অধিকার আছে।

অচিন্ত্যবিহার বড়ই রমণীয় বিহার। অর্ধচন্দ্রকার এক নদীপ্রবাহ হরিৎবসনা পাহাড়ী উপত্যকার পাশ কেটে বয়ে চলেছে। এই ক্ষুদ্র অথচ মদানীরা পাহাড়ী নদীর বামতটে অবস্থিত পাহাড় কেটে শিল্পীরা কত গুহাময় সুন্দর মন্দির, নিবাসস্থল এবং সভাগৃহ তৈরী করেছে। এই সব গুহাভ্যন্তরেও রাজপ্রাসাদের মত চিত্র, মূর্তি ইত্যাদি সজ্জিত করা হয়েছে। যদিও তা বহুপুরুষের পরিশ্রমের ফলে এবং সম্ভবতঃ আগামী কয়েক শত পুরুষের জন্য। অচিন্ত্যবিহারের দেওয়াল-চিত্র সুন্দর, মর্মর শিল্প সুন্দর। কিন্তু এগুলো গুপ্ত-রাজপ্রাসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না আর এইজন্য আমাকে তত অকর্ষণ ও করতে পারে না। হ্যাঁ, আমার কাছে আকর্ষণ ছিল এখানকার ভিক্ষুমণ্ডলী। এর ভিতরে দেশদেশান্তেরে লোক প্রেমভাবে এক হয়ে এক পরিবারের মত রয়েছে। এখানে আমি সুদূর চীনের ভিক্ষুদের দেখেছি, পারসিক এবং যবন ভিক্ষুদের দেখেছি, সিংহল, যব এবং সুবর্ণ দ্বীপের লোকও এখানে যথেষ্ট রয়েছে। চম্পাদ্বীপ, কম্বোজ-দ্বীপের নাম আমি এখানে এসে শুনলাম এবং তাদের সজীব, মূর্ত অধিবাসীদের সচক্ষে দেখলাম; কপিসা, উদ্যান, তুষার এবং কুচা-র গেরুয়া কৌপীনধারী পীতকায় ভিক্ষুপুরুষদেরও এখানে দেখলাম।

বাহিরের দেশগুলো সম্বন্ধে জানবার আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি এইসব বিদেশী ভিক্ষুদের এক এক করে পেতাম, তবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি এক এক বছর ক'রে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এক সঙ্গে এত অধিক সংখ্যায় জড়ো হওয়ার জন্য বিপুল বৈভবের মাঝে পড়া দরিদ্রনিধির মতই আমি নিজেকে অসহায় মনে করতে লাগলাম!

নিজ গুরুর মুখে আমি দিঙ্‌নাগের নাম শুনেছিলাম। কালিদাস গুপ্তরাজ, রাজতন্ত্র এবং তাদের পরম সহায়ক ব্রাহ্মণধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আর কি অভিপ্রায় থেকে তা ছিলেন, সেকথা আগেই বলেছি। দিঙ্‌নাগকে তিনি তাঁর কাজের পরাক্রান্ত

বিরোধী বলে মনে করতেন। বলতেন, "এই দ্রাবিড় নাস্তিকের সামনে শুধু বিষ্ণু নয়, তেত্রিশকোটি দেবতারই সিংহাসন টলে ওঠে। রাজা এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থের জন্য ধর্মের নামে আমি যা কিছু কূটকলাকৌশল বের করি, তার রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, মুস্কিল এই ছিল যে, বৃদ্ধ বসুবন্ধুর মত গুরু সে পেয়েছিল।" বসুবন্ধুকে কালিদাস জ্ঞানবারিধি বলতেন। ভদন্ত বসুবন্ধু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী অযোধ্যায় বছর কয়েক কাটিয়েছিলেন—রাজদরবারী হয়ে নয়, পরন্তু স্বাধীন, সম্মানিত গুরুর মর্যাদা নিয়ে।

পরে গুপ্তদের নীচতায় নিরাশ হয়ে আপন জন্মভূমি পুরুষপুরে (পেশোয়ার) চলে যান। লৌহতীর অথবা খড়্গ নয়, পরন্তু তার চেয়েও তীক্ষ্ণ জ্ঞান এবং তর্কের অস্ত্র বিতরণ করবার ব্রত দিঙ্‌নাগ গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে আধঘণ্টা আলাপ করলেই চোখের সামনে ব্রাহ্মণত্বের সমস্ত মায়াজাল তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে। আমি ছয়মাসকাল অচিন্ত্যবিহারে ছিলাম, এই সময়ে প্রতিদিন দিঙ্‌নাগের মুখ থেকে তাঁর সর্বব্যাপী উপদেশাবলী শুনতাম, এতে আমার গর্বই হত যে, দিঙ্‌নাগের মত গুরু আমি পেয়েছি। তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত গভীর আর বচন জ্বলন্ত অংগারের মত ছিল। সংসারের বিস্তীর্ণ মায়াজাল দেখে আমার মতই তিনিও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠতেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, "সুপর্ণ, প্রজাশক্তির সহায়তায় হয়ত কিছু করা যেত, কিন্তু জনসাধারণ এখন পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেছে। তথাগত (বুদ্ধ) জাতিবর্ণ ভেদ উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অতীব প্রয়াস করেছিলেন। দেশের বাইরে থেকে যবন, শক, গুর্জর, আভির—যারাই আসত, ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করত। কিন্তু তথাগতের সংঘ তাদের মানুষ বলেই স্বীকার করে নিত। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মনে হয়েছিল, এদেশে জাতিভেদ মুছে যাবে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ গুপ্ত রাজসত্তা এখন ব্রাহ্মণেদের হাতে এসে গেছে স্বয়ং গুপ্তরা যখন প্রথম এলো, তখন ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ বলত। কিন্তু কালিদাস তাদের গৌরব বাড়াবার জন্য রঘুবংশ আর কুমার সম্ভব লিখলেন! গুপ্তরা আপন রাজবংশকে অনন্তকাল কায়েম রাখবার চিন্তায় পাগল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণরা তাদের এই আশায় ইন্ধন যোগাল। আমাদের ভদন্ত বসুবন্ধু এমন কোন আশাই তাদের দিলেন না। তিনি লিচ্ছাবী গণতন্ত্রের ছাঁচে নির্মিত ভিক্ষু-সংঘের পাকা অনুগামী ছিলেন। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। তারা জানে যে, সারাদেশের বৌদ্ধরা গোমাংস খায়। এরা কিছুতেই তা ছাড়বে না। এইজন্য ব্রাহ্মণরা ভারতে ধর্মের নামে গোমাংস বর্জন—গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার প্রচার সুরু করে। বৌদ্ধ জাতিবর্ণভেদ তুলে দিতে চায়। ব্রাহ্মণেরা তাই বর্ণবহির্ভূত যবন, শক ইত্যাদিকে উচ্চবর্ণে অভিষিক্ত করতে থাকে। এই ফাঁদ এত জটিল যে, অনেক বৌদ্ধ গৃহস্থ এতে জড়িয়ে আছে। এই ভাবে প্রজাদের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে তারা রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ শক্তিকে দৃঢ় করতে চায়। কিন্তু এর পরিণাম

আত্মঘাতী হবে সুপর্ণ, কারণ দাসের শক্তির উপর ভিত্তি করে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।"

আমি আপন যৌধেয়কুলের আত্মোৎসর্গের কাহিনী বলতে আচার্যের হৃদয় অভিভূত হয়ে গেল, যখন আমি যৌধেয়গণকে পুনরুজ্জীবিত করবার আপন ইচ্ছা তাঁর সামনে প্রকাশ করলাম, তখন তিনি বললেন, "আমার সদিচ্ছা এবং অশীর্বাদ তোমার সঙ্গে রইল। উদ্যোগী পুরুষসিংহের বিঘ্নবাধাকে ভয় করা উচিত নয়।"

তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমি চলেছি যৌধেয়র রাজ্যাভিমুখে। তাদের মৃতরাজ্যকে হয় পুনরায় উদ্ধার ক'রব, নয়ত বালুতটে অংকিত পদচিহ্নের মত মিলিয়ে যাব।

দুর্মুখ

কাল : ৬৩০ খৃষ্টাব্দ

আমার নাম হর্ষবর্ধন। শীলাদিত্য বা সদাচারের সূর্য্য আমার উপাধি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজের জন্য বিক্রমাদিত্য (পরাক্রমের সূর্য্য) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন; আমি এই কোমল উপাধি স্বীকার ক'রে নিয়েছি। বিক্রমে অপরকে দমন করে রাখার, অপরকে জয় করার চিন্তা পেয়ে বসে : শীলসদাচারতায় কাকেও দাবিয়ে রাখার বা কারও উপর অত্যারা চাকরার চিন্তা মনে আসে না। গুপ্তরা নিজেদের পরম বৈষ্ণব বলেছে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধন—যাঁকে গৌড়-শশাংক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তারুণ্যেই হত্যা করে ফেলে এবং যাঁকে স্মরণ করে আজও আমার হৃদয় অধীর হয়ে ওঠে—পরম সৌগত (পরম বৌদ্ধ) ছিলেন তিনি। সুগত (বুদ্ধ) যেমন ক্ষমা-মূর্তি ছিলেন, তিনিও তেমনি! নিজেকে সর্বদা তাঁর চরণসেবী মনে করেও আমি পরম মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব হওয়া পছন্দ করেছি। কিন্তু শৈব হলেও আমার হৃদয়ে বুদ্ধ-ভক্তি প্রবল ছিল, শুধু এই ভারতেই নয়, ভারতের বহির্জগতও জানে। আমি, আমার রাজ্যের সকল ধর্মকেই সম্মান করেছি—প্রজারঞ্জনের জন্যই শুধু নয়, আপন শীল (সদাচার) সংরক্ষণের জন্য। প্রতি পঞ্চম্ বৎসরে আমি রাজ কার্যের উদ্বৃত্ত ধন প্রয়াগে ত্রিবেণীতীরে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের মধ্যে বণ্টন করতাম। এ থেকেও প্রমাণিত হবে, যে আমি সকল ধর্মের সমান সমৃদ্ধি চেয়েছি। হ্যাঁ, আমি সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা করেছিলাম সত্যি কিন্তু সে এই শীলাদিত্য নাম ধারণ করার পূর্বে। তাই বলে একথা ভাববেন না যে, যদি দক্ষিণাপথের রাজা পুলকেশীর বিরুদ্ধে আমি অসফল না হতাম তবে বিক্রমাদিত্যের মতই কেনো পদবী আমিও ধারণ করতাম। আমি সারা ভারতের সম্রাট হয়েও, চন্দ্রগুপ্ত নয়, অশোকের কলিংগবিজয়ের ন্যায় পশ্চাত্তাপ ক'রে শীলতা দ্বারা মানুষকে জয় করতাম—আমার প্রকৃতি এমনই বিনয়নম্র, কোমল।

রাজ্য গ্রহণ করতেও আমি অস্বীকার করেছিলাম, কেন না স্থান্বীশ্বরপতি মহারাজ প্রভাকর-বর্ধনের পুত্র, কাণ্যকুব্জাধিপতি পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ রাজ্যবর্ধনের অনুজ হয়ে, আমি শুধু রাজ্যভোগ দেখে নয়, নিজে ভোগ করে তার অসারতা উপলব্ধি করেছি। যদি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের ক্ষত্রিয়োচিত শুভবুদ্ধি মনে জাগ্রত হয়ে না উঠতো, তবে সম্ভবতঃ কাণ্যকুব্জের সিংহাসনে আমি একেবারেই বসতাম না। এর ফল কি হোত তা আমার জানা আছে। আমার বোন রাজ্যশ্রীর প্রতিপক্ষ মৌখরি বংশ এই রাজ্যের শাসক হোত। আর বস্তুতঃ আমার ভ্রাতার পূর্বে, গুপ্তরা চলে যাবার পর তারাই রাজ্যশাসন করতো। এ সব আমি এইজন্যই বলছি যে

আমার পরবর্তীগণ যেন বুঝতে পারে যে হর্ষ স্বার্থের দৃষ্টি নিয়ে নিজমস্তকে রাজমুকুট ধারণ করে নি। আমার দুঃখ হয়, আমার দরবারী মোসাহেবরা (রাজা মোসাহেবের সঙ্গ ছাড়তে পারে না, এই বড় মুস্কিল) আমাকেও সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রঙে রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছে; কিন্তু এতে তারা আমার প্রতি ন্যায় করেনি, করেছে অন্যায়।

আমি রাজ্য গ্রহণ করেছি শুধু শীলতা এবং ধর্মপালনের জন্যে, সকল প্রাণীর হিতের জন্যে। বিদ্যাদানকে আমি শ্রেষ্ঠদান বলে মনে করেছি, এজন্যে গুপ্তদের সময় থেকে চলে আসা ক্রমবর্দ্ধমান নালন্দার সমৃদ্ধিকে আমি আরও বাড়িয়ে তুলেছি, যাতে দশ সহস্র দেশী-বিদেশী পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থী নিশ্চিন্ত আরামে সেখানে বিদ্যাধ্যয়ন করার সুবিধা লাভ করে। বিদ্বানের সম্মান লাভ করা আমার কাছে সবচেয়ে সন্তোষদায়ক, এজন্য আমি চীনের বিদ্বান ভিক্ষু হুয়েন সাংকে সমস্ত অন্তর দিয়ে সম্মানিত করেছি। বাণের অদ্ভুত কাব্যপ্রতিভা দেখে আমি তাকে লাম্পট্যের পথ থেকে সরিয়ে এনে সুপথে চালনা করতে চেয়েছি, যদিও সে বেশী উপরে উঠ্‌তে পারে নি এবং কালিদাসের পদানুসরণ করে শুধু চাটুকার কবি হিসাবেই রয়ে গেছে। কিন্তু মগধের এক ছোট গ্রাম থেকে নিয়ে এসে তাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার প্রয়াস আমার বিদ্যা প্রীতিরই দ্যোতক ছিল।

আমি চেয়েছিলাম সকলেই স্ব স্ব ধর্ম পালন করুক। স্বধর্মের পথেই চলা উচিত কারণ এতে সংসারে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজ করে এবং স্বর্গ সৃষ্ট হয়। সকল বর্ণের লোক নিজ বর্ণধর্ম পালন করুক, সকল আশ্রমের লোক আপন আশ্রম পালন করুক, সকল ধর্মমত আপন শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা পাঠ করুক—এজন্য আমি সদা প্রযত্নশীল ছিলাম।

কামরূপ (আসাম) থেকে সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াওয়াড়) এবং বিন্ধ্য থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত নিজ রাজ্যে আমি ন্যায়রাজ্য স্থাপন করেছি। আমার অধিকারীরা (অফিসার) জুলুম করতে না পারে, এজন্য সকল সময় আমি স্বয়ং চক্রভ্রমণে বেরু হতাম। এমনি এক পর্যটনে থাকাকালে ব্রাহ্মণ বাণ আমার আহ্বানে আমার কাছে এসেছিল। আমি জানি আমার কীর্তির মহিমা কীর্তন করতেই সে চেয়েছিল; কিন্তু আমার পর্যটন সময়েও আমার রাজৈশ্বর্য আড়ম্বরের যে বর্ণনা সে করেছে তা আমার নয়, কোনো বিক্রমাদিত্যের দরবারের হতে পারে। গোপনে গোপনে সে আমার জীবনী (হর্ষ-চরিত) লিখেছিলো। আমি একদিন জানতে পেরে তাকে প্রশ্ন করলাম। লিখিত অংশ সে আমাকে দেখিয়েছিল, দেখে আমি খুব অসন্তুষ্ট হলাম এবং তিরস্কারও করলাম, যার এক নিশ্চিত পরিণাম হলো যে, সে আর অত উৎসাহের সঙ্গে লিখে যেতে পারল না। তার 'কাদম্বরী' আমার অপেক্ষাকৃত পছন্দ হয়েছিল। যদিও তাতেও রাজ-দরবার, অন্তঃপুর, পরিচারক-পরিচারিকা, প্রাসাদ, ভোগবিলাস ইত্যাদির এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছিলো যাতে লোকের অযথা ভ্রম হয় যে, এই সমগ্র বর্ণনা আমারই

রাজদরবারের। আমার রাণীদের মধ্যে পারস্য কন্যা অর্থাৎ পারস্য কন্যার সঙ্গেই আমার গভীর প্রণয় ছিল। সে নৌশেরওয়াঁ নাতনিই শুধু নয়, পরন্তু আপন রূপ গুণের দ্বারা যে কোনো পুরুষকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারত! বাণ তাকেই মহাশ্বেতা ব'লে বর্ণনা করেছিল। আমার সৌরাষ্ট্রী রাণীর বয়স পেরিয়ে এসেছিল, তাকে খুশী রাখবার জন্য আমি তার আবাসস্থল সজ্জিত করতে কিছু বিশেষ আয়োজন করেছিলাম। একেই বাণ কাদম্বরী এবং তার নিবাসরূপে অঙ্কিত করল। বাণের রচনায় এই দুটি বিষয় ছাড়া বাকী সমস্ত বিষয় মোটেই আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, অথবা অত্যন্ত অতিশয়োক্তিপূর্ণ।

আমার অন্তিম সময়ে আমি আজ অনুভব করছি যে, বাণ আমার হিতৈষী ব'লে প্রমাণিত হবে না। বাণের 'হর্ষচরিতেই' শুধু নয়, 'কাদম্বরী'তেও রাজ্য আর তার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, লোকে সে সব আমার বিষয়ে বর্ণনা বলেই ধরবে। আমার 'নাগানন্দ' 'রত্নাবলী' এবং প্রিয়দর্শিকা' নাটককে আমার নামে লিখে সে ত আরও অনর্থ করেছে। লোকে বলবে কীর্ত্তির জন্য লালায়িত হয়ে অপরের গ্রন্থ নিজ নামে চালানোর জন্য টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে তা। সত্যি বলছি, বহুকাল পরে এই বিষয় আমি জানতে পেরেছি হাজার হাজার বিদ্যার্থী আমার নামে এই গ্রন্থাবলী প'ড়ে ফেলেছে এবং অনেকবার এগুলো অভিনীতও হয়ে গেছে।

আমি আপন প্রজাদের সুখী দেখতে চেয়েছিলাম, তা আমি দেখেছি। নিজের রাজ্য শান্ত এবং নিরাপদ দেখতে চেয়েছিলাম, সে সাধও অবশেষে পূর্ণ হয়ে এসেছে। আজ আমার প্রজারা সোনা বোঝাই ক'রে নিশ্চিন্তে একজায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতে পারছে।

আমার কুল সম্বন্ধে এখনই লোকে বলতে সুরু করেছে যে এটা বেণেদের কুল। একথা সম্পূর্ণ ভুল। আমি বৈশ্য-ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-বেণে নই। এক সময় আমাদের শাতবাহন কুলের হাতে সমগ্র ভারতের রাজ্য ছিল। শাতবাহন রাজ্যের ধ্বংসের পর আমার প্রজাগণ গোদাবরী তীরস্থিত পৈঠন ছেড়ে স্থানবীশ্বর (থানেশ্বর) চলে আসে। শাতবাহন (শালিবাহন) বংশ কখনও বেণে ছিল না, সমগ্র জগৎ একথা জানে শক ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তাদের বিবাহাদি হতো। রাজাদের কাছে যা উচিত তার বিরোধী কিছু ছিল না। আমার প্রিয়া মহাশ্বেতাও পারসীক রাজবংশোদ্ভূতা।

২

আমারই নাম বাণ। বহু কাব্য নাটক আমি লিখেছি, যার কষ্টিপাথরেই শুধু লোকে আমাকে কষে দেখতে চাইবে, এই জন্য আমাকে এই লেখা লিখে রেখে যেতে হচ্ছে। রেখে যেতে হচ্ছে, কারণ আমি স্থির জানি যে বর্তমান রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই লেখা

প্রকাশিত হবে না। আমি এগুলো নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করেছি। ভবিষ্যৎ মানুষের আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণার হাত থেকে রেহাই পাব, যদি তারা আমার প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী পড়বার আগে এই লেখা পড়ার সুযোগ পায়।

রাজা হর্ষ একদিন সারা সভার মাঝে আমাকে ভুজংগ লম্পট বলে বসলেন—আর এ এমন একটা কথা, যার ফলে লোকে আমায় ভুল বুঝতে পারে।

আমি ছিলাম ধনী পিতার আদুরে ছেলে। ভাস ও কালিদাসের রচনাবলী পড়ে পড়ে আমার মন রঙীন হয়ে উঠেছিল, সন্দেহ নেই। আমার ছিল রূপ, ছিল যৌবন ; আর দেশ ভ্রমণের সখও ছিল। আমি চেয়েছিলাম যৌবনের আনন্দ উপভোগ করতে, অবশ্য ইচ্ছা করলে পিতার ন্যায় নিজের ঘরে বসেই তা করতে পারতাম। কিন্তু আমার কাছে তা ভণ্ডামী মনে হলো। ভেতরে যখন লালসাকামী স্বেচ্ছাচরী হয়ে ওঠে তখন নিজেকে জিতেন্দ্রিয় সংযমী পূজারী মহাত্মা রূপে প্রকট করা আমার খুবই খারাপ লাগত। সারা জীবনেও আমি এসব পছন্দ করিনি। জীবনে যা কিছু করেছি সামনা সামনি করেছি। আমার বাবা অবশ্য একবার মাত্র সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের অসবর্ণ পুত্রকে স্বীকার করে, কিন্তু তাকেও তারুণ্যের পাপ বলে গণ্য করা যায়।

আমি বুঝেছিলাম, যৌবনের আনন্দ যা আমি উপভোগ করতে চাই, নিজের জন্মভূমিতে তা সম্ভব নয়। সকল জাতি ও কুলের লোক এখানে ক্ষেপে উঠবে, আর ধন সম্পত্তিও খোয়াতে হবে। আমার মাথায় এক জবরদস্ত পরিকল্পনা এলো। আমি নিজে এক নাটক-মণ্ডলী গঠন করলাম, আর তা করতে হয়েছিল মগধের বাহিরে গিয়ে। আমার এক গুণী ও কলাকুশলী তরুণ বন্ধু সেখানে ছিল। মূর্খ ধূর্ত ও চাটুকারী বন্ধু আমি কোনাদিন পছন্দ করিনা। আমার নাট্য-মণ্ডলীতে অনেক সুন্দরী তরুণীকে ভর্তি করলাম, এদের সকলেই বারবনিতা ছিল না। "রত্নাবলী" "প্রিয়দর্শিকা" প্রভৃতি নাটক নাটিকা রচনা করলাম এই যাত্রাদলে অভিনয় করার জন্যে। তারুণ্যের আনন্দের সঙ্গে আমি কলার সংমিলন করলাম, আর এতে কলার যে সেবা করা হয় তা দেখে সহৃদয় দর্শকেরা আমার প্রশংসাই করবে। জীবনের আনন্দ আমি গ্রহণ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে "রত্নাবলী" "প্রিয়দর্শিকা" ইত্যাদি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। যারা শুধু নিজের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক আনন্দ পূরণ করবার জন্যই সবকিছু করে তারা ভোগী। লোকে বলবে, রাজা হর্ষকে তোষামোদ করার জন্য আপন নাটক-সমূহ তার নামে প্রকাশ করেছি। কিন্তু তারা এ বিষয় জ্ঞাত নয় যে, যে সময় প্রবাসে বসে এই নাটক লেখা হয়, তখন হর্ষকে আমি শুধু নামেই জানতাম! সে সময় আমি এও জানতাম না যে হর্ষ আমাকে ডেকে নিয়ে তার দরবারী কবি করে রাখবে। আত্মগোপনের তাগিদে শুধু নিজেকে গোপন করার জন্যই এইসব নাটকের রচয়িতা হিসাবে আমি হর্ষের নাম প্রকাশ করেছি। এইসব নাটক যারা পড়ে, মূল্য তারা জানে। এগুলো সম্পূর্ণ মৌলিক। আমার দর্শকগণের মধ্যে গুণীজনও বহুল সংখ্যায় থাকতো ; দলে দলে আসতো পণ্ডিত, রাজা, কলাবিদ্‌গণ। যদি তারা প্রকৃত নাট্যকারের নাম জানতে পারতো, তাহলে আমি আর নাটক মণ্ডলীর

সূত্রধার হয়ে থাকতে পারতাম না, সকলেই মহাকবি বানের পশ্চাদ্ধাবন করতে সুরু করতো। কামরূপ (আসাম) থেকে সিন্ধু এবং হিমালয় থেকে সিংহলের অনুরাধাপুর পর্যন্ত—হর্ষ ছাড়া সকল রাজদরবারেই নাটক দেখিয়েছি। ভেবে দেখুন, যদি কামরূপেশ্বর সিংহলেশ্বর বা কুণ্ডলেশ্বরের গোচরীভূত হতো যে নাটক রচনাকারী মহাকবি এই বাণভট্ট, তবে আমার পর্য্যটন, আমার আনন্দোপভোগের কি দশা হতো ? আমি দরবারী কবি হয়ে থাকতে চাই নি। হর্ষের রাজ্যে যদি আমার বসতি না হত, তবে তার দরবারী কবিও হতাম না, পিতার সম্পত্তি আমার কাছে যথেষ্টই ছিল।

হর্ষের বর্ণনা অনুসারে আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে যে আমি একজন গণিকাশক্ত লম্পট ছিলাম। বস্তুতঃ আমার নাট্যমণ্ডলীর মধ্যে গণিকার স্থান খুবই কম। তবু যারা এসেছিল তারা তাদের নৃত্য-সঙ্গীত অভিনয় কলার সৌষ্ঠব গুণেই এসেছিল, এখানে তার উৎকর্ষতার চর্চা হোত। আমার সময় নাট্য গগনের তারকারা আসত ভিন্ন পথ ধরে। ভাবীকালে কি হবে জানি না, কিন্তু আমার সময় দেশের সব তরুণীরা—তা সে ব্রাহ্মণকন্যা বা বেনিয়ার মেয়ে হোক না কেন—রাজা ও সামন্তবর্গের সম্পত্তি বলে গণ্য হোত। আমার পিসিমাকে মগধের এক মৌখরি সামন্ত বলপূর্বক নিয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিসির আয়ুও শেষ হল বলা চলে। পিসিমা এলেন আমাদের ঘরে। আমার প্রতি অশেষ স্নেহ ছিল তাঁর। আমি কোন দিনেই তাঁর সামন্ত সম্বন্ধের ওপর কটাক্ষ করিনি। আর এই অবলার দোষ কি ? সুন্দরী তরুণীদের ওপর প্রথম অধিকারী হোত গুটিকয়েক সামন্ত। আর সুন্দরী তরুণীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল তা নয়। সামন্ত রাজারা ছলে বলে কৌশলে যুবতীদের পাওয়ার চেষ্টা করত। পতির কাছে যাওয়ার পূর্বরাত্রে কোথাও কোথাও সামন্তদের সাথে রাত্রিবাস করতে হত ; কারণ এরা যে তাদেরই সম্পত্তি। সাধারণ লোকে একে ধর্মমর্যাদা বলে মনে করত। ব্রাহ্মণ ও বেণিয়ারা আপন কন্যা, পত্নী ও বোনেদের ডুলিতে বসিয়ে এক রাত্রের জন্যে রাজান্তঃপুরে পৌঁছে দিত। ডুলি না পাঠাবার অর্থই ছিল সর্বনাশ। আর পছন্দ হলে তো কথাই ছিল না, রাজান্তঃপুরের প্রমোদ গৃহে রাখা হোত। তারা যে রাণী হত—তা মনে করার কারণ নেই, পরিচারিকার সম্মান কপালে জুটত। রাণী হওয়ার সৌভাগ্য শুধু রাজকুমারী এবং সামন্ত কুমারীদের। অন্তঃপুরের এই হাজার হাজার তরুণীর অধিকাংশই এমন ছিল, যারা মাত্র এক রাত্রের জন্যে রাজা অথবা সামন্তের সংগ লাভ করেছে। এই হতভাগিনী নারীদের যৌবন কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলুন ? আমার নাট্যমণ্ডলের অভিনেত্রীরা আসতো এই সব অন্তঃপুরের প্রমোদাগার থেকেই ; পালিয়ে নয়, চুপিচুপি নয়। ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, রাজা ও সামন্তবর্গকে কথার জালে নিজের পক্ষে টেনে আনতে আমি ছিলাম সিদ্ধহস্ত। অবশ্য রাজনীতি আমার বিষয়ভূত ছিল না, তা দিয়ে কোন দরকারও আমার নেই। আমায় তারিফ করে যে শত শত পত্র পাঠাত রাজা ও সামন্তরা তাই আজো সাক্ষী হয়ে আছে, যখন কলা সম্বন্ধে প্রশংসায়

এরা পঞ্চমুখ হোত, আমি তখন কলাবিদ সম্বন্ধে বিলাপ করতে সুরু করতাম, বলতাম, "কি করব বলুন তো দেব! কলাকুশলী তরুণী থাকা সত্ত্বেও পাওয়া যায় না।"

"থাকা সত্ত্বেও পাওয়া যায় না?"

"একবার চুম্বন, পরে আলিঙ্গন বা একরাতের সহবাসের পর যেখানে হাজার হাজার তরুণীকে অন্তঃপুরে বন্দিনী করে রাখা হয়, সেখানে কলাকুশলী তরুণী পাওয়া যাবে কেমন করে?"

"তুমি ঠিকই বলেছ, আচার্য! আমিও অনুভব করছি, কিন্তু একবার অন্তঃপুরে গ্রহণ করার পর এদের আমি বের করে দিই কি করে?"

তারপর কাজটা খুবই সোজা ছিল, আমি তাদের পথ বাৎলে দিতাম। রাজকন্যা, সামন্তকন্যা ও রাজান্তঃপুরিকাগণের জন্য নাচগান আজ অপরিহার্য। আহার ও পানীয়ের মত এসব তাদের প্রয়োজন। আমার চতুর নারীদের আমি পাঠিয়ে দিতাম। রাজা নিজেই কলা শিক্ষার জন্য আপন অন্তঃপুরিকাদের উৎসাহিত করতেন। আমার যাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন হত তার কাছে অন্তঃপুরের দুঃখ কষ্ট এবং কলাবিদের জীবনের আনন্দের স্বরূপ বর্ণনা করা হত! সঙ্গে সঙ্গে একথাও শোনান হত নটীদের সম্মান রাজান্তঃপুরে কত বেশী, তারা যদি কুশলী নটী হতে পারে ভবিষ্যতে সে সুযোগও আছে। এত সব বলার পর অনেক তরুণীর পক্ষেই রাজী হয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল—যদিও আমি তাদের ভেতর থেকে যোগ্যতমাকেই বাছাই করে নিতাম।

জীবনে মাত্র একটি রাত্র সম্ভোগের জন্য যেখানে রাজারা হাজার হাজার তরুণীকে অবরোধ করে রাখে, সেখানে অন্তঃপুরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ করে কিছু আটক করা যায় না। বুড়ো কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ তাদের তারুণ্যের আনন্দবোধ রুখতে পারে না। আনন্দাকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে সমর্থ হত না।

আমি যখন বিধবাদের 'সতী' হওয়ার বিরোধিতা করলাম তখন ভক্তেরা ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের চেয়ে বড় ভণ্ড জগতে আর কেউ হতে পারে না—মহা সোরগোল তুলল। তারা বলতে লাগল—আমি ভ্রূণ হত্যা এবং বিধবাবিবাহের প্রচলন করতে চাই। ভ্রূণ হত্যা আমি একেবারেই সমর্থন করিনি। কিন্তু এখানে এ কথা স্বীকার করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই যে, আমি বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ সমর্থন করি। গুপ্তশাসনে আমাদের প্রাচীন শ্রোত্রীয়গণ যেখানে গোমাংসবিনা কোন আতিথ্যকে স্বীকার করতে চাইতেন না, সেখানে এখন গোমাংস ভক্ষণকে ধর্মবিরুদ্ধ ব'লে গণ্য করা হয়। যেখানে আমাদের ঋষিগণ বিধবাদের জন্য দেবর—দ্বিতীয় বর—সম্পূর্ণ উচিত মনে করতেন এবং কোন ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়া বিধবাতরুণী ছয়মাস বা এক বছরের অধিক পতিবিধুরা থাকতে পারতো না, সেখানে বিধবা বিবাহকে এখন ধর্মবিরুদ্ধ ব'লে গণ্য করা হচ্ছে। গুপ্তরাজবংশের যুগেই এই সমগ্র জঞ্জালের—এই নূতন (হিন্দু) ধর্মের—গোড়া পত্তন হয়—আর এর প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য আপন পাটরাণী করে রেখেছিলেন রামগুপ্তর বিধবা নয় সধবা স্ত্রীকে। তরুণী বিধবাদের স্ত্রী হিসাবে

রাখতে চাইলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আটকাতে পারেন না, আর কোন মুখেই বা আটকাবে, যখন স্ব স্ব পত্নী বর্তমান থাকতেও তাঁরা নিজেরাই পরস্ত্রীর পিছনে ছুটতে দ্বিধা করেন নি। তরুণীদের বিধবা ক'রে রাখার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভ্রূণহত্যা, কারণ সন্তান সৃষ্টি ক'রে তাকে পালন করার অর্থই হ'ল বিধবা বিবাহ স্বীকার করে নেওয়া—যা থেকে লোকে মুক্তি পেতে চায়। এই ভয়ে এখন ব্রাহ্মণ এবং সামন্তরা কৌলিন্য সিদ্ধ করার এক নূতন কৌশল আবিষ্কার ক'রেছে। সে হল বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করা। স্ত্রীলোকদের এইভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাকে এই সব লোক মহাপাপ নয়, মহা পুণ্য ব'লে মনে করে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তরুণীকে বল পূর্বক অগ্নিসাৎ করতে দেখেও যে দেবতাদের হৃদয় বিগলিত হয় না, তারা হয় বস্তুতঃ পাথরে গড়া, নয়, তাদের অস্তিত্বই নেই। এরা বলে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছায়ই সতী হয়। ধূর্ত! ভণ্ড! নরাধম! এর্ত মিথ্যা কেন বল? এই সব রাজঅন্তঃপুরের শত শত স্ত্রীলোক যারা পুরুষের সঙ্গ হয়তো সারা জীবনে একবার পেয়েছে—যাদের তোমরা আগুনে পুড়িয়ে সতী বানাচ্ছ—তাদের মধ্যে ক'জন আছে যারা ঐ নবপশুদের সঙ্গে এতটুকু প্রেম করে ছিল? আজীবনের জন্য বন্দিনী ছিল ওরা! ওদের সঙ্গে প্রেম! আর ওদের বিয়োগে পাগল হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবার যে এক আধটি দৃষ্টান্ত রয়েছে সে পাগলামীও দু'চার দিনে প্রশমিত করা যেতে পারে। আত্মহত্যা ধর্ম। রসাতলে যাক তোমাদের ভণ্ড পুরোহিত আর রাজাদের ধর্ম। প্রয়াগের অক্ষয়বট থেকে যমুনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করাকে এরা ধর্ম আখ্যা দিয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর এমনি হাজার হাজার পাগল মৃত্যু বরণ করে 'স্বর্গে' উপস্থিত হচ্ছে। কেদার খণ্ডের সৎপথে গিয়ে তুষারে জমে যাওয়াকে এরা ধর্ম আখ্যা দিয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর শত সহস্র জন সৎপথের রাস্তায় 'স্বর্গ' যাত্রা করছে! এই সমস্ত আত্মহত্যার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। কারণ আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাজার আশ্রয়ে থাকতে হ'ত।

রাজার আশ্রিত হ'য়ে র'য়েছি; কিন্তু নিজে জেনেশুনে এই আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আমার নিজের এত সম্পত্তি ছিল যে সংযত ভোগপূর্ণ এক জীবন যাপন করতে পারতাম। আমার সময়ের রাজার এবং ব্রাহ্মণদের চেয়ে আমি অনেক বেশী সংযমী হতে পারতাম। হর্ষ এবং অপর রাজাগণের ন্যায় আমি লাখোচুম্বি (লক্ষ সুন্দরীকে উপভোগকারী) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিনি। খুব বেশী হ'লে একশ' সুন্দরী আছে যাদের সংগে কোন না কোন সময়ে আমার প্রণয় ছিল। কিন্তু আমার বাড়ীঘর, সম্পত্তি সব কিছুই হর্ষের রাজ্যে অবস্থিত ছিল। যখন তার কাছ থেকে দূতের পর দূত আসতে লাগল, তখন আর কি ক'রে আমি তা'র দরবারে যেতে অস্বীকার করি? হ্যাঁ, আমিও যদি অশ্বঘোষ হতাম, গৃহদ্বার সম্বন্ধে উদাসীন হতাম—তাহ'লে হর্ষের কোন পরোয়া করতাম না।

হর্ষের সম্বন্ধে যদি আমার গোপন মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলব যে তার সময়ে সে মন্দ লোক বা মন্দরাজ্য ছিল না। আপন ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের সংগে তার

অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। ভাইয়ের জন্য যদি 'সতী' হওয়ারও বিধান আমাদের ধর্মনায়কগণ দিত অথবা তার সামান্য ইংগিত করত, তবে সেও তাই করে বসত। কিন্তু এই সংগে তার মধ্যে দোষও ছিল, এবং সবচেয়ে বড় দোষ ছিল মিথ্যা ঠাট দেখানো—প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সে সম্বন্ধে নিস্পৃহ দেখাত; সুন্দরীদের সম্বন্ধে কামনা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে কামনা-রহিত ব.ল জাহির করা। যশস্পৃহা থাকা সত্ত্বেও যশ থেকে ক্রোশ দূরে দূরে থাকার প্রয়াস দেখান। হর্ষকে না জানিয়ে আপন নাটক-সমূহকে 'নিপুণ কবি হর্ষ'এর নামে আমি কেন প্রসিদ্ধ হতে দিয়েছি সে সম্বন্ধে সবই বলেছি। কিন্তু পরিচয় এবং রাতদিনের সংগ লাভের পরও সে কখনও বলেনি— "বাণ, এখন এই নাটকগুলিকে তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হতে দাও।" এ কাজ একেবারেই সহজ ছিল। তার অধীন সামন্তদরবারে শুধু একবার 'শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ' এই জায়গায় 'শ্রীবাণা নিপুণং কবিঃ' এই নামে নাটকের অভিনয় করলেই হত।

জগত যেমন রয়েছে তাকে ঠিক তেমনি ভাবে চিত্রিত করায় আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। আমি আমার বারোটি বছর যদি পর্যটনে না কাটাতাম, তবে সম্ভবত এই আগ্রহ জন্মাত না, অথবা জন্মালেও আমি তা চরিতার্থ করতে পারতাম না। আমি যেখানে অচ্ছোদ সরোবরের বর্ণনা দিয়েছি, সেখানে হিমালয় পর্ব্বতের এক সুন্দর ভূমি আমাব সামনে ছিল। কাদম্বরী-ভবনেব বর্ণনায় হিমালয়ের কোন দৃশ্য ছিল। বিন্ধ্যাটবীতে নিজেরই দৃষ্ট একস্থানে বৃদ্ধ দ্রাবিড় ধার্মিককে আমি বসিয়েছি। কিন্তু শুধু এইটুকু চিত্রণে আমি আমার লেখনীকে বিশ্রাম দিতে চাই নি। হর্ষ এবং নিজের সুপরিচিত অপর রাজগণের প্রাসাদ, অন্তঃপুর এবং তাদেব ধন-দৌলতের চিত্রণ আমি আমার গ্রন্থে করেছি; কিন্তু আমি পর্ণকুটির এবং তার দুঃখদুর্দশাপূর্ণ জীবনকে চিত্রিত করতে পারিনি, তাদের এই অবস্থা ঐ সব প্রাসাদ এবং অন্তঃপুরের কল্যাণেই হয়েছে। যদি করতাম তবে ঐ সব রাজপ্রাসাদ এবং রাজভোগের উপর এমন গভীর কালিমা লেপন করা হত যে, প্রতি পঞ্চম বছরে প্রয়াগে রাজকোষ—ভুল হল, উদ্বৃত্তকোষ—উজাড়-করা হর্ষ আমাকে শুধু লম্পট উপাধি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকত না।

৩

আমাকে লোকে দুর্মুখ বলে, কেননা কটুসত্য বলার অভ্যাস আমার আছে। আমাদের সময়ে আরও কটুসত্য বলার লোক যখন তখন দেখা যেত; কিন্তু তারা সে সব বলত পাগলামীর ছলে, যায় ফলে অনেকেই তাদের সত্যিকারের পাগল মনে করতো এবং অনেকে মনে করতো শ্রীপর্বত থেকে আগত কোন অদ্ভুত সিদ্ধপুরুষ বলে। আমিও এই শ্রীপর্বতের যুগে এক খাসা সিদ্ধপুরুষ সাজতে পারতাম; কিন্তু তা' হলে আমার নাম

দুর্মুখ হত না। এই লোকবঞ্চনা আমার কাম্য নয়। লোকবঞ্চনার কথা মনে করেই আমি নালন্দা ছেড়েছি, না হলে আমিও সেখানকার পণ্ডিত—মহাপণ্ডিত হয়ে যেতাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে আমি অন্ধকাররাত্রিতে অংগার নিক্ষেপ করতে দেখেছিলাম ; কিন্তু এও দেখেছিলাম যে, কিরকমভাবে তার শত্রুমিত্র সকলেই তার পিছনে লেগেছে। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার হয়ত কৌতূলহ জেগে থাকবে। সে ছিল তার্কিকশ্রেষ্ঠ, হাজার হাজার পুরুষ মেষের মধ্যে একমাত্র পুরুষ-সিংহ ধর্মকীর্তি। নালন্দায় বসে ডংকানিনাদে সে বলেছিল,—'বুদ্ধর উপরে পুঁথিকে স্থান দেওয়া, ঈশ্বরকে সংসারের কর্তা মনে করাতে ধর্মপালনের ইচ্ছা জন্মজাতির অভিমান পাপনাশ করার জন্য শরীরকে সন্তপ্ত করা,—বিবেচনাহীন জড়ত্বের পঞ্চ লক্ষণ এগুলি। *

ধর্মকীর্তিকে আমি বলেছিলাম,—"আচার্য, আপনার অস্ত্র তীক্ষ্ণ, কিন্তু এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, লোকের নজরেই পড়বে না।"

ধর্মকীর্তি বল্‌ল—"আমার অস্ত্রের দুর্বলতার কথা আমি নিজেও বুঝি। আমি যাকে ধ্বংস করতে চাই তার জন্য আমাকে সকল ধর্ম ত্যাগ করে চোখ ঝলসানো প্রচণ্ড অস্ত্র ধারণ করতে হবে। নালন্দার স্থবির (সন্ত-মহন্ত) ইতিমধ্যেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। তুমি কি মনে কর একটি বিদ্যার্থী লাভেও আমি সমর্থ হতে পারব, যদি আমি বলতে আরম্ভ করি—নালন্দা এক প্রহসন বিশেষ, এখানে এমন সব বিদ্যার্থী আসে যারা বিশাল জগতকে আলোকিত করতে পারে না, যারা আপন জ্ঞানালোকে অজ্ঞ স্বল্পজ্ঞদের চোখেই শুধু ধাঁধার সৃষ্টি করতে পারে? শীলাদিত্য, অর্পিত গ্রাম থেকে যারা সুগন্ধি চাল, মশলা, ঘি, খেঁজুর ইত্যাদি পায়, তারা শীলাদিত্যের ভোগ-শিকাররূপী প্রজা সাধারণকে বিদ্রোহী হওয়ার শিক্ষা কেমন করে দিতে পারে?"

"আচার্য, তা' হলে আপনার এই অন্ধকার রাত্রি থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তা কি বের করছেন?"

"রাস্তা? সকল রোগেরই মহৌষধ আছে, সকল রকম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ারও কোন না কোন পথ আছে কিন্তু এই অন্ধরাত্রি থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা অথবা সেই বৈতরণীর সেতু একদিনে তৈরী হতে পারে না বন্ধু! কারণ এই নির্মানকারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অপরদিকে অন্ধকারে দুর্ভেদ্যতা অত্যন্ত প্রবল।"

"তাহলে কি হতাশ হয়ে বসে পড়তে হবে?"

"বসে পড়াটা লোকবঞ্চনা থেকে অন্ততঃ ভাল। দেখছ না, যার পথ-প্রদর্শক হওয়া উচিৎ, সেই কিরকম প্রবঞ্চক? আর এই অবস্থা শুধু মাত্র এক দেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই

---

* বেদপ্রামাণ্যং কস্যচিৎ কর্তৃবাদঃ স্নানে
ধর্মেচ্ছা জাতিবাদাবলেপঃ।
সন্তাপারম্ভঃ পাপহানায় চেতি ধ্বস্ত
প্রজ্ঞানাং পঞ্চলিঙ্গানি জাড্যে।
—প্রমাণ বার্তিক

দেখা যাচ্ছে। সিংহল সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, কম্বোজদ্বীপ, চম্পাদ্বীপ, চীন, তুষার, (মধ্য এশিয়া) পারস্য—কোন জায়গার বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থী আমাদের নালন্দায় নেই? এদের সঙ্গে আলোচনা করলেই বোঝা যায় যে দুনিয়া অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গেছে—'ধিগ্‌ব্যাপকং তমঃ!"

সহস্রাব্দ ধরে জ্বলমান শব্দাংগার সকল নিক্ষেপ করে ধর্মকীর্তি এই নিশান্ধকারকে দূর করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তৎকালে তা থেকে কোন সুফল ফলতে আমি দেখিনি। আমি নিজেই উজ্জ্বল দীপযষ্টি মশাল বহন করে চলতে কৃতসঙ্কল্প হলাম। এর একটা ফল এই হল যে, আমি দুর্মুখ বনে গেলাম। এখানে একথা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে আপন রসনার ব্যবহারে আমাকেও রাজসত্তার উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ না করা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হত, না হলে দুর্মুখের মুখ দশ দিনেই বন্ধ করে দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও নিজেকে বাঁচিয়ে কখন কখন আমি বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতাম।

মরণের পর মুক্তি এবং নির্বাণ-প্রাপ্তির যে কথা তোমরা বল, কি অর্থ আছে তার? এখানে যে লক্ষ লক্ষ দাসকে পশুর ন্যায় আবদ্ধ রেখে বিক্রয় করা হচ্ছে, তাদের কেন মুক্ত করার চেষ্টা কর না? প্রয়াগের মেলায় একবার রাজা শীলাদিত্যকে আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম—"মহারাজ, আপনি যে বড় বড় মূল্যবান মঠে এবং ব্রাহ্মণদের মাঝে প্রতি পঞ্চম বৎসরে এত ধন-দৌলত বিতরণ করছেন, সেগুলি যদি দাস-দাসীদের মুক্ত করার কাজে লাগাতেন, তাহলে কি তাতে কম পুণ্যের কাজ হত?"

অন্য এক সময় আলোচনা করার কথা বলে শীলাদিত্য এ প্রশ্ন এড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই 'অন্যসময়'ও আমি খুঁজে বের করলাম। রাজার ভগ্নী ভিক্ষুণী রাজ্যশ্রী জোর করেই সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিল। রাজ্যশ্রীর সামনে আমি দাস-দাসীদের নরকযন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরলাম! তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তারপর যখন আমি বললাম যে ধন দিয়ে এই সনাতন বংশপরম্পরায় বন্দী মানুষের মুক্তি প্রদান করা সবচেয়ে পুণ্যের কাজ, তার মনে ধরে গেল সে কথা। বেচারী সরল-হৃদয় স্ত্রীলোক, দাসত্বের আবরণে লুক্কায়িত বড় বড় স্বার্থের কথা সে সব কি জানে? সে কি করে জানবে যে, যেদিন মাটিকে স্বর্গে পরিণত করা যাবে, আকাশের স্বর্গ সেদিন হেলে পড়বে। আকাশ-পাতাল, স্বর্গ নরক কায়েম রাখার জন্য, তাদের নামে লাভের কারবার চালানোর জন্য পৃথিবীতে স্বর্গ-নরক, রাজা ভিখারী, দাস-স্বামী এসবের প্রয়োজন হয়।

রাজা নির্জনে আলোচনা করল। প্রথমে সে বলল,—"একবার বহু অর্থব্যয় করে মুক্ত আমি করতে পারি, কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে সে মুক্তি বিকিয়ে যাবে।"

"ভবিষ্যতের জন্য মানুষের ক্রয়-বিক্রয় দণ্ডনীয় করে দিন।"

এরপর সে চুপ করে ভাবতে লাগলো। আমি তার সামনে 'নাগানন্দের' নাগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম, যে অপরের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছিলো। 'নাগানন্দ' হর্ষরাজের সৃষ্ট নাটক বলে কথিত, সুতরাং কি জবাব দেবে সে? শেষকালে সে এই জানালো যে দাস-দাসীদের মুক্ত করায় সে অতটা কীর্তিলাভের আশা রাখে না,

যতটা রাখে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ঝুলি ভরায় বা বড বড মঠ-মন্দিব নির্মাণে। এইদিন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে শীলাদিত্য নয়, শীলান্ধকার।

বেচারা শীলাদিত্যকেই বা আমি কেন দোষ দিই? আজকাল কুলীন নাগরিক হওয়ার লক্ষণই এই যে সকলেই পরস্পরকে বঞ্চনা করুক। পুবাণ বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধকালীন রীতিনীতির কথা পড়ে আমি জেনেছি যে, পূর্বে মদ্যপান জলপানেরই সামিল ছিল। মদ্যপান না করাকে সে সময় উপবাস-ব্রত বলে মনে করা হতো। আজকাল ব্রাহ্মণরা মদ্যপান নিষিদ্ধ মনে করে, এবং প্রকাশ্যে পান করায় শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু এসবের পরিণাম কি? দেবতার নামে, সিদ্ধিসাধনার নামে লুকিয়ে ভৈরবীচক্র চলছে। ব্রহ্মচর্য নিয়ে মহা সোরগোল স্বরু হয়েছে, কিন্তু পরিণাম? ভৈরবী-চক্রে আপনপব সকল স্ত্রী ভোগাধিকারভুক্ত। শুধু এই নয়, দেবতার বরদানেব নামে সেখানে মাতা-ভগ্নী-কন্যা পর্যন্ত ভোগাধিকাবভুক্ত হয়ে উঠেছে। আর পরিব্রাজক, ভিক্ষু এদেব আখড়াগুলি তো অপ্রাকৃতিক ব্যভিচারেব আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। যদি সত্যিই এই জগতকে দেখা-শোনা কবার কেউ থাকত তবে এই বঞ্চনা, এই অন্ধকাব একমুহূর্তেব জন্যও সে বরদাস্ত করত না।

একবার আমি কামরূপে গিয়েছিলাম। সেখানকার রাজা নালন্দার ভক্ত এবং মহাযানেব প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিল। আমি বলেছিলাম—"মহাযাত্রী বোধিসত্ত্বেব ব্রতকে আপনি মান্য করেন, যে ব্রতে বলা হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত একটিও প্রাণী বন্দী হয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণ আমার কাম্য নয়। মহারাজ, আপনার রাজ্যে অনেক চণ্ডাল আছে, যারা দণ্ড হাতে নিয়ে নগরে আসে। আর রাস্তায় আওয়াজ করতে করতে আসে, তারা লোককে সচেতন করে দেয়, যাতে তাদেব ছোঁয়া লেগে কেউ যেন অস্পৃশ্য না হয়। তারা হাতে করে পাত্র বয়ে নিয়ে চলে যাতে তাদেব অপবিত্র থুতু নগরের পবিত্র ধরণীতে না পড়ে। কুকুরকে স্পর্শ করলে মানুষ অপবিত্র হয় না, তার বিষ্ঠাও নগরকে চির দূষিত করে না। তবে কি চণ্ডালেরা কুকুরের চেয়েও অধম।"

"কুকুরের চেয়ে অধম নয়। এদের মধ্যেও সেই জীবন প্রবাহ নিহিত আছে যা কোনদিন বিকশিত হয়ে বুদ্ধের সৃষ্টি হতে পারে।"

"তাহলে কেন রাজ্যে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে দেন না যে আজ থেকে কোন চণ্ডালকে নগরে আসতে দণ্ড অথবা পিক্‌দানী বয়ে আনতে হবে না?"

"এ আমার শক্তির অতীত।"

"শক্তির অতীত?"

"হ্যাঁ, ধর্ম ব্যবস্থা এমনিভাবেই রচিত হয়েছে।"

"বোধিসত্ত্বের ধর্মের—মহামানবের এই ব্যবস্থা।"

"কিন্তু এখানকার সকল প্রজা তো মহামন্ত্র অনুসরণ করে চলে না।"

"গ্রামে, শহরে সর্বত্র আমি ত্রিরত্নের জয়দুন্দুভি বেজে উঠতে দেখছি।"

"হ্যাঁ, কথায় তা ভালোই। যে দিন আমি এ ঘোষণা করবো, সেই দিনই আমার

প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার বিরুদ্ধে এই বলে তুফান সৃষ্টি করবে যে সনাতন কাল থেকে চলে-আসা এক সেতুকে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি।"

"বোধিসত্ত্ব-জীবনের মহিমা সম্বন্ধে অহর্নিশ যে উপদেশ প্রচারিত হচ্ছে, কারও উপর কোন প্রভাবই কি তার পড়েনি। আমি বিশ্বাস করি মহারাজ, কারও উপর নিশ্চয়ই এর প্রভাব পড়েছে, এবং যদি বোধিসত্ত্বের ন্যায় আপনি আপনার সমস্ত কিছু অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হন, তবে আপনাকে অনুসরণ করে চলার মতও অনেককেই পাওয়া যাবে।"

"রাজ্যের ভিতরকার প্রশ্নই তো শুধু নয়, আমাদের পরমভট্টারকদেবও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন।"

"শীলাদিত্য হর্ষ! যে 'নাগানন্দ' নাটকে বোধিসত্ত্বের উজ্জ্বল চিত্র অংকিত করেছে?"

"হ্যাঁ, প্রচলিত রীতি উড়িয়ে দেওয়া কারও ক্ষমতাধীন নয়।"

"এমন কথা যদি তথাগত মনে করতেন? যদি একথা মনে করতেন আর্য অশ্ব ঘোষ? এমন কথা যদি আর্য নাগার্জুন মনে করতেন?"

"তাঁদের সাহস ছিল; তবু রীতি উঠিয়ে দিয়ে তাঁরাও বেশীদূর এগুতে পারেন নি।"

"বেশীদূর নয়, অল্প দূরই আপনি চলুন মহারাজ, কিছুদূর আপনি অগ্রসর হন। কিছুটা ভাবী বংশধরেরা করবে।"

"আপনি কি আমাকে নিজ মুখ দিয়ে কাপুরুষ বলিয়ে ছাড়বেন।"

"কাপুরুষ নয়! তবে একথা পাই যে ধর্ম আমাদের কাছে এক নাগপাশ বিশেষ।"

"আমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করলে আমি 'হ্যাঁ' বলবো। কিন্তু যদি রসনাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সে পরিষ্কার 'না' বলবে অথবা একেবারেই বোবা বনে যাবে।"

ব্রাহ্মণ্যধর্মে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। বস্তুতঃ কামরূপনৃপতির মত বহু সদন্তঃকরণ লোককে কাপুরুষরূপে সৃষ্টি করার অপরাধ এই ব্রাহ্মণ ধর্মের। যে দিন এই ধর্ম এ দেশ থেকে উঠে যাবে, সেদিন পৃথিবীর এক গুরুতর কলংক মুছে যাবে। নালন্দায় এসে বদেশী ভিক্ষুদের কাছে আমি শুনেছি যে, তাদের দেশে ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন সর্বশক্তিমান ধর্মনায়কের জাতি নেই। তাদের কথায় আমি এও বুঝেছি যে, কেন সেই সব দেশে দণ্ড এবং মৃৎপাত্র বহনকারী চণ্ডালের দেখা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেরা আমাদের দেশে মানুষকে ছোট বড় জাতে এমন ভাবে ভাগ করে দিয়েছে যে কেউ-ই নিজের চেয়ে নিচু জাতের লোককে তার সাথে মিশতে দিতে প্রস্তুত নয়। এদের ধর্ম আর জ্ঞান নিছক রাহুকেতুর ছায়া বিশেষ।

নালন্দায় দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র সংবাদ বহুল পরিমাণে পাওয়া যেত, এজন্য আমি দুএকবছর পর্যটন করে পুনরায় ছয় মাসের জন্য নালন্দায় চলে যেতাম। একবার এক পারসীক ভিক্ষু বলেছিলেন যে, তাঁর দেশে কিছুকাল আগে মজ্দক নামে এক বিদ্বান ছিলেন, যিনি এক প্রকারের সংঘবাদের প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের মত এক রকমের সংঘবাদ—(যতদূর পর্যন্ত সম্পত্তির প্রশ্ন রয়েছে)—প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেই সংঘবাদ এখন শুধু বিনয়পিটকে পঠনীয় বস্তু মাত্র। আজ বড় বড় বৈযক্তিক

(পৌদ্‌গলিক) সম্পত্তি ভোগকারী ভিক্ষু রয়েছে। আচার্য মজ্‌দক ব্রহ্মচর্য এবং ভিক্ষুবাদকে মানতেন না। তিনি মানুষের প্রকৃত জীবন—প্রেমিক-প্রেমিকা, পুত্র-পৌত্রের জীবনকেই শুধু স্বীকার করতেন। কিন্তু বলতেন যে, সকল পাপের মূল হল 'আমি' এবং 'আমার'।

তিনি বলেছিলেন—"সম্পত্তি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নয়, সকলে যুক্তভাবে অর্জ্জন করবে এবং যুক্তভাবে ভোগ করবে। পতি-পত্নী সম্পর্কও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নয়, প্রেম স্বেচ্ছানুযায়ী চলবে এবং সন্তান সকলের সম্মিলিত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে"—প্রাণী-দয়া এবং সংযমের শিক্ষাও তিনি দিতেন। তাঁর মতবাদ আমার কাছে সুন্দর মনে হল। আমি যখন শুনলাম যে মজ্‌দক এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুচরকে মেরে এক পারসিক রাজা—নোসেরওয়াঁ—ন্যায়মূর্ত্তি উপাধি ধারণ করেছে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে যতদিন পর্যন্ত রাজা থাকবে,—ততদিন পর্যন্ত ধর্ম এবং তার দানপুণ্যের সাহায্যে বেঁচে থাকা শ্রমণ ব্রাহ্মণও থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে না।

চক্রপাণি

কাল—১২০০ খৃষ্টাব্দ

এই সময় কণৌজ ভারতের সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ নগর ছিল। তার হাট-বাট, চৌরাস্তা ছিল খুবই জমকালো। মিষ্টান্ন, সুগন্ধি, তৈল, পান, অলংকার এবং অন্যান্য বহুবিধ জিনিষের জন্য সারভারতে প্রসিদ্ধ ছিল সে। ছ'শ বছর ধরে মৌখরি, বৈশ্য, প্রতিহার, গহড়বার-এর মত ভারতের তদানীন্তন সর্বোচ্চ রাজবংশগুলোর রাজধানী থাকার ফলে তার প্রতি আর একরকমের শ্রদ্ধার ভাবও লোকের মনে সঞ্জাত হয়েছিল। শুধু এই নয়, জাতিসকল তার নামেই আপন শাখাসমূহের নামকরণ করতো। এজন্য আজ ব্রাহ্মণ, আহীর, কাঁহ্দু ইত্যাদি বহুজাতির মধ্যে কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, কাণ্যকুব্জ অহীর ইত্যাদি দেখা যায়। হিন্দুধর্মের নামে যেমনটি হয়, কাণ্যকুব্জের (কণৌজের নামেও লোকের মনে তেমনি ভাবের উদয় হত! হর্ষবর্ধনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জগতে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে, কিন্তু তখনকার চেয়ে এখন ভারতীয় মনোরাজ্যে অধিক কূপমণ্ডূকতা এসে গেছে।

হর্ষবর্ধনের সময়ে আরবে এক নূতন ধর্ম—ইস্লাম—জন্মলাভ করেছিল। সেই সময় তাকে দেখে কে বলতে পেরেছিল যে তার সংস্থাপকের মৃত্যুর (৬২২ খৃঃ) একশ' বছরের মধ্যেই সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তা। এই সময় পর্যন্ত জাতি এবং রাজার নামে দেশবিজয়ের কথাই শ্রবণে এসেছিল, এবার ধর্মের নামে দেশসমূহের জয়যাত্রা এই প্রথম শোনা গেল। আপন শিকারসমূহকে সতর্ক হবার সুযোগও সে দিল না এবং তাদের একের পর এক গ্রাস করে ফেললে। সাসানিগণের (ইরাণীগণের) শক্তিশালী সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে আরবদের স্পর্শমাত্র কাগজের নৌকার ন্যায় গলে পড়ল, এবং ইস্লাম সংস্থাপকের মৃত্যুর পর দুই শতাব্দী পার হতে না হতে ইস্লামী রাজ্যের ধ্বজা পামীরের উপর উড়তে লাগল।

ইস্লাম প্রথমে সমগ্র দুনিয়াকে আপন আরবী উপজাতিগুলোর বিস্তৃত-রূপে রূপায়িত করতে চেয়েছিল, এবং সেইসাথে উপজাতির সরলতা, সমানতা এবং ভ্রাতৃভাবকে আপন অনুগামীগণের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিল। এই সময় থেকে তিন হাজার বছর পূর্বেই বৈদিক আর্যের পূর্বজগন এই অবস্থাকে অতিক্রম করে এসেছে। অতিবাহিত যুগের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। এইজন্য যেমনই ইস্লাম উপজাতিসমূহের পূর্বযুগে অবস্থিত সামন্ত-যুগের সংস্পর্শে এসেছে এবং তার তরবারির সামনে এর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিলীন হয়ে গেছে তেমনি এইরূপ সংস্পর্শে এসেই ইস্লামী সমাজের উপজাতীয়তার স্বরূপও বিনষ্ট হয়ে গেছে! ইস্লামের প্রধান শাসককে বহুকাল পর্যন্ত কেবল তার সংস্থাপকের খলিফা—উত্তরাধিকারী—বলা হত। বস্তুতঃ সে

সুলতান—নিরংকুশ রাজা হওয়া সত্বেও। এখন অবশ্য নামে নিজেদের সুলতান বলে জাহির করার মত অনেকেই এসে জড় হয়েছে। এদের কাছে ইস্‌লামের পবিত্র উপজাতীয়তা, তার সরলতা, সমানতা বা ভ্রাতৃভাবের কোনই মূল্য নেই কিন্তু নূতন অঞ্চল জয় করতে প্রয়োজন হত অস্ত্রচালনাকারী সৈন্যের, এবং এই অস্ত্রচালনাকারীরা এই সময় আর আরবীজাতের ছিল না, ছিল অপর জাতের অন্তর্ভুক্ত। এইসব সৈন্যদের সুলতানের নামে লড়াই করার জন্য ততটা উৎসাহিত করা যেত না, এজন্য স্বর্গস্থিত নানা প্রলোভনের সাথে সাথে পার্থিব আনন্দের ভাগও তাদের দেওয়া হত। লুটের মাল এবং বন্দীর উপর তাদের অধিকার ছিল, নবজয়লব্ধ ভূমিতে বসতি করার স্বত্ব তাদের ছিল, পূর্বতন অত্যাচারী, প্রভুকুলের কবল থেকে মুক্তি পাবার, এমনকি তাদের অস্তিত্বকেও বিলুপ্ত করে দেবার অধিকার ছিল। বিজেতার ধ্বজাকে আপনজ্ঞানে সগর্বে বয়ে নিয়ে চলার মত এত সৈন্য বিজিতের ভিতর থেকে কেউ কখনো লাভ করেনি। যারা আমাদের ভিতর থেকেই নিজের জন্য যুদ্ধকারী সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম, তাদের মত সৈন্যের সংগে মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়।

হর্ষের মৃত্যুর পর একশ বছরও কাটেনি যখন সিন্ধু ইস্‌লাম শাসনে চলে গেল। বারাণসী এবং সোমনাথ (গুজরাট) পর্যন্ত সারা ভারত ইস্‌লামী অস্ত্রের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলেন। এই নূতন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রয়োজন ছিল নূতন কর্ম পদ্ধতির, কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের পুরাতন পথ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। সমগ্র দেশকে লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত করার জায়গায় ভারতের একমাত্র সৈন্যবাহিনী তৈরী হল রাজপুত (প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং এদের সঙ্গে বিবাহাদিসূত্রে আবদ্ধ শক, যবন, গুর্জর ইত্যাদি) দের নিয়ে। অন্তর্বৈরিতা থেকেই এরা মুক্ত ছিল না এবং রাজবংশ-গুলোর মধ্যে নূতন-পুরাতন শত্রুতার জন্য শেষ পর্যন্তও তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আপোষ-রফার জন্য প্রস্তুত হতে পারলো না।

১

"মহারাজ কোন চিন্তা করবেন না। সিদ্ধগুরু এমন সাধনা সুরু করেছেন যাতে তুর্ক-সেনা শুকনো পাতার মত হাওয়ায় উড়ে যাবে।"

"আমার উপর গুরু মিত্রপাদ (জগন্মিত্রানন্দ)-এর কি অসীম করুণা! আমার বা পরিবারের উপর যখনই কোন সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে, গুরুমহারাজ আপনার দিব্যবলের সাহায্যে তা থেকে রক্ষা করেছেন।"

"মহারাজ, সিদ্ধগুরু হিমালয়ের ওপারে ভোট দেশ থেকে কাণ্যকুব্জের সঙ্কটকে দেখতে পেয়েছেন, এইজন্যই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"কি অপার করুণা!"

"বলেছেন, তারিণী (তারাদেবী) মহারাজের সহায়তা করবেন। তুর্কদের সম্বন্ধে ভাববেন না আপনি।"

"তারামায়ের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তারিণী! বরাভয়দায়িণী! ম্লেচ্ছর হাত থেকে রক্ষা কর মা!"

বৃদ্ধ মহারাজ জয়চন্দ্র ইন্দ্রভবনতুল্য আপন রাজপ্রাসাদে এক কর্পূরশ্বেত কোমল সিংহাসনে বসে রয়েছেন। চারজন অতি সুন্দরী তরুণী রাণী তাঁর পাশে বসে রয়েছে, এদের গৌর মুখমণ্ডল থেকে ভ্রমরের চেয়েও কাল চুলের রাশ টেনে এনে পিছনের দিকে খোঁপা করে বাঁধা রয়েছে। চূড়ামণি, কর্ণফুল, অংগদ, কংকন, হার, চন্দ্রহার, মুক্তাহার, কটিকিংকিনী, নূপুর, ইত্যাদি নানা সুবর্ণরত্নখচিত অলংকারের, ভার এদের দেহের ভার অপেক্ষাও বেশী। পরণে এদের সুক্ষ্ম শাড়ী আর কাঁচুলী, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, দেহ আবৃত করার জন্য এগুলো পরা হয়নি, হয়েছে দেহসৌষ্ঠব সুপ্রকাশিত করে তুলে ধরার জন্যই। কাঁচুলী ভেদ করে স্তনের স্ফীতি এবং অরুণিমা সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে! নিচে নাভি পর্যন্ত সমগ্র উদর অনাচ্ছাদিত। উরু এবং জংঘার আকৃতি ও বর্ণ সুন্দররূপে প্রতিভাত হচ্ছে। চুলের সুগন্ধি তৈল এবং নব প্রস্ফুটিত জুঁই ফুলের মালার সুগন্ধে সমগ্র পুরী ভরপুর হয়ে গেছে। রাণীরা ছাড়াও পঁচিশজনের বেশী তরুণী পরিচারিকা রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ চামর, কেউ মোর্ছল বা ব্যজন দোলাচ্ছে। কারও হাতে পানদান, কারও হাতে আয়না বা চিরুণী, কারও হাতে সুগন্ধ জলের ঝারি, কারও হাতে কাঁচের সুরাপাত্র বা সোনার পেয়ালা, কারও হাতে বা সাপের চামড়ার মত মসৃণ কোমল তোয়ালে। কেউ কেউ মৃদঙ্গ, মুরজ, বীণা, বেণু ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে রয়েছে, এবং কেউ বা স্বর্ণদণ্ড হাতে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অথবা টহল দিচ্ছে। রাজা জয়চন্দ্র এবং আগন্তুক—মিত্রপাদের শিষ্য শুভাকর ছাড়া এখানে আর সবাই রাণী, সবাই তরুণ বয়স্কা সুন্দরী।

মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিক্ষু চলে গেল। রাণীরা এবং রাজা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। এখানে এখন শুধু নারীময় জগৎ। জয়চন্দ্র বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর আধপাকা লম্বা চুল মাঝখান দিয়ে ভাগ করে যেভাবে পিছনের দিকে নিয়ে বাঁধা হয়েছে, বিরাট গোঁফ যেরকম যত্নসহকারে আঁচড়ান হয়েছে, বস্ত্রালংকারে তাঁর দেহ যেভাবে সজ্জিত হয়েছে তাতে এই মনে হয় যে, যৌবনকে তিনি অনবসিত বলে মনে করেন। মহারাজের ইংগিতে এক পরিচারিকা তাঁর সামনে ঝুঁকে পেয়ালা এগিয়ে দিল, এবং জনৈকা রাণী সেই ভরা পেয়ালা মহারাজের সামনে তুলে ধরল। পেয়ালাটি রাণীর ঠোঁটে লাগিয়ে তিনি বললেন,—"রাজলক্ষ্মী, তারা আমার, তোমার উচ্ছিষ্ট না হলে, আমি কেমন করে এ পান করব?"

ঠোঁট এবং জিভের ডগা ভিজিয়ে নিল রাণী, রাজা সেই প্রসাদ পান করলেন। এরপর তাঁর প্রিয়তমা রাণীরা একে একে প্রসাদ দিল তাঁকে। চোখ লাল হয়ে উঠল,

মুখাবয়ব থেকে তুর্ক চিন্তা বিদূরিত হয়ে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। রাজার স্থূল দেহ মসনদের গায়ে ঢলে পড়ল, এবং কোন রাণীকে তাঁর এপাশে কোন রাণীকে ওপাশে টেনে বসালেন তিনি। কারও কোলে মাথা রাখলেন, কারও বুকের উপর হাত রাখলেন। মাঝে মাঝে মদের পেয়ালা চলতে লাগল। কামোদ্দীপক হাসি ঠাট্টা চলতে থাকল রাণীদের সঙ্গে। এবারে নাচের আদেশ দিলেন মহারাজা। বিল্বস্তনা, নিতাম্বিনী সুন্দরীরা ঘাঘ্‌রা পরে ঘুঙুর পায়ে নাচের জন্য উঠে দাঁড়াল। বীণা এবং মৃদংগ ধ্বনিত হতে লাগল। মৃদু গানের তালে তালে নাচ সুরু হোল। একটা গান শেষ হয়ে যেতেই রাজার কাছে নিরস মনে হোল তা, সুন্দরীদের নগ্ননৃত্য করতে আদেশ দিলেন তিনি। নর্তকীরা বেশভূষা সব খুলে ফেলল, পরে রইল শুধু পায়ের নূপুর। পাশে উপবিষ্ট রাণী এবং তরুণী পরিচারিকাদের সাথে আলিংগন, চুম্বন এবং হাস্য পরিহাস চলতে লাগল! মধ্যে মধ্যে চলল নগ্ন নর্তন, যার নগ্নদেহ মহারাজকে আকর্ষণ করল, সে-ই এসে বসতে লাগল মহারাজের পাশে, আর অপর একজন তখন নগ্ন হয়ে তার স্থান পূরণ করল। আরও লাল হয়ে উঠল মহারাজের চোখদুটো। কণ্ঠস্বরের সুরা তার প্রভাব বিস্তার করল——'ধ্‌—ধত্‌—ত্‌—তে—রি- তো-তোর্‌-র্‌ তু—তুর্‌—কী—ঈ—। আ—া—ম্‌-মার ইন্‌—ন্‌—দ্র-ও পুর্‌—র্‌—ঈ—তে—তে তে কো—কো—ওন্‌ শ্‌—শ্‌—শালা—আ—স্‌—সে। স্‌—স্‌—সব্‌ জোর্‌মে ন্‌—ন্‌—না—া—চো।'

প্রাসাদের সকল রাণী আপন আপন বস্ত্রালংকার খুলে ফেললো। ওদের তরুণ সুন্দর দেহের উপর ঘনস্থূল কবরীর ভারে আনত মস্তক রাজার পছন্দ হলো না। কবরী খুলে ফেলতে বললেন তিনি, সব কজনের মাথা থেকে কালনাগিনীর মত দীর্ঘ বেণী এসে নিতম্বের উপর আছড়ে পড়লো। মহারাজকে স্বয়ং কঞ্চুক খুলতে দেখে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এবং অলংকার খুলে ফেললো তরুণীরা। তাঁর লোলচর্ম চিবুক, শীর্ণ চোয়াল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, প্রসূতির স্তনের মত ঝুলে পড়া বুক, মহাকুম্ভের মত উদর এবং শীর্ণ ঢিলে চর্মাবৃত উরু এবং জংঘা আর কর্কশ লোমশ বাহু দেখে সাধারণ তরুণীরাও অবজ্ঞা না করে পারে না, কিন্তু এখানে এদের দেহ প্রাণ সবই এই বৃদ্ধের হাতে। কেউ তাঁর দন্তহীন ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলো, কেউ বা তাঁর দেহে আপন স্তনদ্বয় পীড়িত করতে লাগলো, আবার কেউ তাঁর লোমশ বাহু নিজের কাঁধে বা গালে বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কামোদ্দীপক গানের সংগে সংগে নাচ সুরু হলো, রাণী এবং পরিচারিকাদের মাঝে দাঁড়িয়ে মহারাজও তাঁর বিশাল ভুঁড়ি সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করলেন।

২

"এসো কবি কুল-তিলক।"—এই বলে রাজা এক আধাবয়সী পুরুষকে আসন দেখিয়ে দিলেন, এবং সে বসবার পর বড় দু'খিলি পান সসম্মানে এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

কবির বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু তাঁর সুন্দর সুগৌর মুখমণ্ডলে অতীত যৌবনের ছাপ সুস্পষ্ট রয়েছে এখনও। গোঁফের রং এখনও কালো, পরণে শাদা ধুতি এবং শাদা চাদর ছাড়াও তাঁর গলায় সুন্দর এক রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে ভস্মাংকিত চন্দ্রাকার তিলক কাটা রয়েছে।

সোনার পাতে মোড়া সুগন্ধি পান মুখে দিয়ে কবি বললো, "দেব, যাত্রা কুশলেই সাঙ্গ হয়েছে ত? শরীর সুস্থ ছিল ত? রাত্তিরে ত আরামেই ঘুমিয়েছেন, না?"

"আমি এখন পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছি কবি-পুংগব।"

"মহারাজ, কবি-শ্রীহর্ষকে আপনি খুব ব্যঙ্গ করলেন যাহোক।"

"পুংগব ত ব্যঙ্গ নয়, প্রশংসাসূচক কথা।"

"পুংগব বলদকেই বলে দেব।"

"জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠকেও পুংগব বলে।"

"আমি ত একে বলদ অর্থেই গ্রহণ করি।"

"এবং আমি শ্রেষ্ঠ অর্থে। আর তাছাড়া, তোমার মত অন্তরংগ ইয়ারের সংগে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করা গেলে, কার সংগে করা যাবে কবিবন্ধু?"

"কিন্তু সে ত দরবারে বসে নয়, মহারাজ।" নিচু গলায় শ্রীহর্ষ বলল।

কবির হাত ধরে দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে ক্রীড়োদ্যানের দিকে চললেন জয়চন্দ্র। গ্রীষ্ম সুরু হয়েছে। সবুজ রংয়ের গাছগুলোকে আন্দোলিত করছে মনোরম বাতাস। দীঘির সোপানের উপর অবস্থিত শুভ্র শীলাসনে বসে পাশের আসনে কবিকে বসতে বললেন রাজা, এবং তারপর বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন—"রাত্তিরের কথা তুমি কি জিজ্ঞেস করছো কবি? আমি এখন বেশ অনুভব করতে পারছি যে আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি।"

"কেন?"

"নগ্ন সুন্দরীরাও আমার কাম জাগাতে পারছে না।"

"তাহলে ত আপনি পুরো যোগী হয়ে পড়ছেন, মহারাজ!"

"এই যোগীর কাছে থেকে এই ষোল হাজার সুন্দরী কি করবে?"

"বিলিয়ে দিন মহারাজ, নেবার মত লোক অনেক জুটে যাবে; অথবা গংগাতীরে জলকুশ দিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করে দিন—সর্বেষামেব দানানাং ভার্যাদানং বিশিষ্যতে!"

"তাই করতে হবে। বৈদ্যরাজ চক্রপাণির বাজীকরণ বলও নিষ্ফল হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র তোমার কাব্যরসের আশাতেই আছি।"

"নগ্ন-সৌন্দর্য-রস যেখানে কিছু করতে পারেনি, কাব্যরস সেখানে কি করবে মহারাজ? তাছাড়া আপনি এখন ষাটের উপরে চলে এসেছেন।"

"আমি কনৌজ থেকে আসার পর দুমাস কেটে গেছে, কিন্তু কাশী (বেনারস)তে তুমি আমার সংগে দেখা করনি।"

"মহারাজ, চৈত্রের নবরাত্রিতে আমি ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর চরণ সন্দর্শনে গিয়েছিলাম।"

"বিন্ধ্যবাসিনীর ধামের পথেই ত আমার নৌকা এসেছে, যদি জানতাম ত ডেকে নিতাম তোমাকে।"

"অথবা ওখানে নেমে কুমারী পূজোয় ব্যাপৃত হয়ে যেতেন।"

"তাহলে কবিবর, তুমিও কুমারী-পূজোর জন্যই ওখানে যাওনি ত!"

"আমি ভগবতীর উপাসক শাক্ত, মহারাজ।"

"কিন্তু তুমি যেভাবে রাম-সীতার বন্দনা কর, তাতে মনে হয় যেন খাঁটি বৈষ্ণব তুমি।"

"অন্তঃ শাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।"

"সভামধ্যে তুমি বৈষ্ণব তাহলে?"

"হতেই হয় মহারাজ! আপনার মত অপরের জিভ্‌ টেনে ধরতে ত আমরা পারিনা।"

"ধন্য তুমি বহুরূপী।"

"শুধু এইটুকুই নয় মহারাজ, আমি সুগত (বুদ্ধ)কেও আমার আরাধনার সামগ্রী করে নিয়েছি।"

"সুগত—ভগবান তথাগতকেও?"

"ভগবান!"

"হ্যাঁ, এখানে বসে ও-নাম শুনলে আমার চোখেও লজ্জা দেখা দেয়।"

"মহারাজ, শাক্তদের সুবিধার জন্য সুগতের পূজো আমরা সরল করে দিয়েছি বজ্রযান রূপে।"

"ঠিক বলছ বন্ধু, এইজন্যই ত তাকে সহজিয়া বলা হয়।"

"এই সহজিয়া সিদ্ধগণের দোহা এবং গানে কোনো কবিত্বের স্ফুরণ দেখতে পাইনা আমি; কিন্তু পঞ্চ মকার (মদ, মাংস, মীন, মুদ্রা, মৈথুন) এর প্রচার করে যতটা জন-কল্যাণ এঁরা করেছেন, তারজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আমি।"

"কিন্তু বুঝতে পারছি, আমার পক্ষে এখন আর—এই পঞ্চ মকারের উপাসনা করা দুষ্কর।"

"বজ্রযানের সাথে নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন—একেবারে যেন সোনায় সোহাগা।"

"তোমার কাব্যরস ত তবু চেখে দেখতে পারি আমি, যদিও ওতেও কখনো কখনো

মাথাঘুরে যায়; কিন্তু এই দর্শন যেন পর্বতপ্রমাণ বোঝা হয়ে আমার মাথায় চেপে বসে।"

"তা হলেও মহারাজ, নাগার্জুনের দর্শন বড়ই কার্যকরী, বহু মিথ্যাধারণা ওতে দূর হয়ে যায়।"

"কিন্তু তুমি ত বেদান্ত-বিশারদ কবি!"

"আমার গ্রন্থকে আমি বেদান্ত বলেই প্রসিদ্ধ করে নিয়েছি মহারাজ, কিন্তু 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য'তে নাগার্জুনের চরণধূলিকেই বিতরণ করেছি সর্বত্র।"

"মনে ত থাকবেই না, তবু বলত নাগার্জুনের মূল কথা কি?"

"সিদ্ধরাজ মিত্রপাদ ত নাগার্জুনের দর্শনেই বিশ্বাস করেন।"

"আমার দীক্ষা-গুরু?"

"হ্যাঁ, নাগার্জুন বলেন—পাপ-পুণ্য, আচার-দুরাচার সবই কল্পনা, জগতের সত্তা-অসত্তা কিছুই প্রমাণ করা যায় না। স্বর্গ-নরক, বন্ধন-মোক্ষ এসবই বলে ভ্রম। পূজা-উপাসনা এগুলো সব মূর্খ লোকদের বঞ্চনা করার জন্য। দেবদেবী সম্বন্ধে লোকোত্তর সব ধারণাই অলীক।"

"আমিও ত এই দর্শনকে অনুসরণ করেই জীবন কাটিয়েছি কবি!"

"সকলেই কাটায় মহারাজ, মূর্খেরাই শুধু নগদ ছেড়ে ধারের পেছনে ছোটে।"

"কিন্তু এখন যে আমার নগদকে সামনে রেখে শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয় বন্ধু। কিন্তু তোমার ত এখনও বয়স পেরোয়নি মনে হয়।"

"আপনার চেয়ে আটবছরের ছোটও ত আমি, তাছাড়া একটি ব্রাহ্মণীর বেশী বিয়েও আমি করিনি মহারাজ।"

"বিয়ে করে কি হয়! বেশী বিয়ে করতে গেল ত বিয়ের পাকেই শ্রান্ত হয়ে মরবে মানুষ।

"আমার ঘরে একটি মাত্র ব্রাহ্মণীই আছে মহারাজ।"

"এবং সমগ্র দুনিয়া তাই বিশ্বাস করবে যে কবি শ্রীহর্ষ সেই দাঁতভাঙা বুড়ীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত!"

"বিশ্বাস করবে এবং করছেও মহারাজ! আমার গ্রন্থে আমি আমার সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কথা লিখেছি।"

"তোমাদের মাধ্যমিক দর্শনে তাহলে ব্রহ্ম এবং তাঁর সাক্ষাৎকারের স্থানও রয়েছে কবি!"

"কিসের স্থান ওতে নেই মহারাজ?"

"প্রজাদের দৃষ্টি অন্ধ করে রাখতে হবে, সবকিছুই যাতে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।"

"ধর্মের উপর থেকে আপনার বিশ্বাস তবে উঠে গেল মহারাজ?"

"সে আমি জানিনা কবি, আমি বুঝতেই পারিনা, কখন বিশ্বাস আসে কখন চলে যায়। তোমাদের ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণদের আচরণ-উপদেশ দেখে শুনে মন স্থির করাই আমার

পক্ষে মুস্কিল, আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে দান-পুণ্য, দেবালয়-স্থগতালয় নির্মাণ ইত্যাদি যা কিছু ধর্মে বলে করো ; কিন্তু জীবনের নগদ সম্পদকে হাত থেকে চলে যেতে দিয়ো না।"

প্রেম এবং ধর্ম থেকে এঁদের আলোচনা এবার রাজকার্যে এসে পড়লো। শ্রীহর্ষ বললেন—"মহারাজ কি সত্যিই পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছেন ?"

"তাকে সাহায্য করার কি দরকার আমার ? নিজে গায়ে পড়ে ঝড়ের সংগে লড়াই বাধিয়েছে সে, নিজেই ভুগবে তার ফল ?"

"আমারও সেই মত মহারাজ, চক্রপাণি মিছেমিছি এমনি বিরক্ত করছে।"

"তার কাজ হল চিকিৎসা করা। সেখানেও সে কিছুই করে উঠতে পারে না। তিনবার আমি বাজীকরণ চিকিৎসা করেছি, কিন্তু সবই বিফলে গেছে। এখন উনি এসেছেন রাজকার্যে পরামর্শ দিতে !"

"তা নয় মহারাজ, ও একটা নিরেট মূর্খ, অনর্থক ওকে মাথায় তুলে রেখেছেন যুবরাজ।"

৩

"ঠিক বলেছেন বৈদ্যরাজ ! গহড়বারের মূলে ঘুণ ধরাতে আরম্ভ করেছে শ্রীহর্ষ। বাবাকে সে অন্ধ-কামুক বানিয়ে রেখেছে।"

"বিশবছর থেকে আমি কান্যকুব্জের রাজবৈদ্য কুমার। আমার ওষুধের কিছু গুণ অন্ততঃ আছে।"

"সে গুণের কথা সারা দুনিয়া জানে বৈদ্যরাজ।"

"কিন্তু বাজীকরণের ব্যাপারে মহারাজ খুশী নন। অতিকামুক পুরুষের তারুণ্যকে কতদিন পর্যন্ত জীইয়ে রাখা যায় কুমার ? এইজন্যই আহার-বিহারে সংযম অভ্যাস করার কথা লেখা হয়েছে। আমি ত বলেছি যে আমাকে মল্লগ্রাম (মালব-গোরক্ষপুর) গিয়ে থাকতে দিন। কিন্তু উনি তাতেও রাজী নন।"

"কিন্তু বাবার দোষে আমাকে ছেড়ে যাবেন না মহারাজ। গহড়বারের যা কিছু আশা, এখন শুধু আপনাকে দিয়েই।"

"আমাকে দিয়ে নয় কুমার, হরিশ্চন্দ্রকে দিয়ে। গহড়বার বংশে যদি জয়চন্দ্রের জায়গায় হরিশ্চন্দ্র থাকতেন ত কত ভাল হত। চন্দ্রদেবের সিংহাসনে হরিশ্চন্দ্রেরই প্রয়োজন ছিল।"

"অথবা যদি শ্রীহর্ষের জায়গায় বৈদ্যরাজ চক্রপাণি জয়চন্দ্রের প্রাণবন্ধু হতেন। কিন্তু গহড়বার-সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমার সংগে থাকতে হবে বৈদ্যরাজ।"

"অস্তমিত হওয়ার সংগে সংগে আমিও অস্তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কুমার। কিন্তু গহড়বার-সূর্য শুধু অস্ত যাবে না, পরন্তু হিন্দুদের সূর্যও অস্ত যাবে। আমরা মল্লগ্রামের ব্রাহ্মণের শুধু শাস্ত্র ধর্ম্মাচরণেই অভিজ্ঞ নই, পরন্তু অসি চালনাতেও দক্ষ আমরা। এইজন্য আমরাও তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই কুমার।"

"নিজের জামাইকে সাহায্য করতেও আমার পিতা রাজী নন। পৃথ্বীরাজ আমার আপন ভগ্নীপতি বৈদ্যরাজ। তার সাথে সংযুক্তার প্রণয় ছিল এবং নিজের ইচ্ছামতই তার সাথে চলে গিয়েছিল সে। এতে বাবার অখুশী হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?"

"পৃথ্বীরাজ বীর, কুমার!"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই বৈদ্যরাজ। বীরত্বের জন্যই তুর্কসুলতানের সংগে লড়তে পারছে সে। না হলে আমাদের এই কান্যকুব্জ রাজ্যের তুলনায় কতটুকু তার রাজ্য? সুলতানকে যদি শুধু পথ ছেড়ে দিত সে, সুলতান তাকে পুরস্কৃত করত। সুলতানের দৃষ্টি ত দিল্লীর উপর নয়, কান্যকুব্জের উপর। দু'শ' বছর থেকে ভারতের সব চেয়ে বড় রাজ্য শাসন করে আসছে কনৌজ। কিন্তু তাঁকে বোঝাবে কে? বুঝবার মত বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছেন বাবা।"

"এসময় যদি তিনি যুবরাজের হাতে শাসনভার তুলে দিতেন শুধু!"

"আমার একবার মনে হয়েছিল, বৈদ্যরাজ যে বাবাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিই কিন্তু আপনার শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল। বিশ বছর ধরে আপনার দেওয়া প্রতিটি শিক্ষা আমার কাছে হিতকারী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এইজন্যই তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারিনি আমি।"

"কান্যকুব্জের সিংহাসন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে কুমার। সামান্য একটি ভুল পদক্ষেপেই এই সমগ্র ইমারৎ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। পিতাপুত্রের কলহের সময় ত এ নয়।"

"কি করা যায় বৈদ্যরাজ? আমাদের সমস্ত সেনাপতি ও সেনানায়কেরা ভীরু এবং অযোগ্য। তরুণ সেনানায়কদের মধ্যে অবশ্য যোগ্য এবং সাহসী কিছু আছে, কিন্তু বুড়োরা এদের ঢোকার পথ বন্ধ করে বসে আছে। মন্ত্রীদেরও ওই একই অবস্থা, রাজার প্রশস্তি গাওয়াকেই শুধু আপন কর্তব্য বলে জ্ঞান করে তারা।"

"অন্তঃপুরে নিজের মেয়ে-বোনকে পাঠিয়ে যারা পদলাভ করে তাদের এই অবস্থাই হয়। কিন্তু অতীত নয়, ভবিষ্যতের চিন্তাই আমাদের করতে হবে এখন।"

"আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত ত সমস্ত হিন্দু তরুণের হাতে অস্ত্র তুলে দিতাম আমি।"

"কিন্তু এ হল বংশানুক্রমিক ত্রুটি, যাতে শুধু রাজপুতকেই যুদ্ধের অধিকারী করে রাখা হয়েছে। মহাভারতে দ্রোণ এবং কৃপের মত ব্রাহ্মণও যুদ্ধ করেছে; কিন্তু পরে শুধু একজাতির···"

"আমার মনে হয়, এই জাত-বেজাতের ব্যাপারও আমাদের পথে এক বিরাট বাধা।"

"বাধাই বটে, সবচেয়ে বড় বাধা কুমার। পূর্বজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সৎকাজের জন্য গর্বানুভব করা অন্য জিনিষ। কিন্তু চিরদিনের জন্য হিন্দুদের সহস্রভাগে ভাগ করে রাখা মহাপাপ।"

"এর ফল এখন ভুগতে হচ্ছে। কাবুল এখন আর হিন্দুদের হাতে নেই, লাহোরও গেছে, এবার দিল্লীর পালা।"

"আজ যদি আমরা পৃথ্বীরাজের সংগে এক হয়ে যুদ্ধ করতে পারতাম।"

"উঃ, কি দুর্ভাগ্য, বৈদ্যরাজ!"

"শুধু একটা? দুঃখের বোঝা ভারী হয়ে আমাদের নৌকা ডুবতে যাচ্ছে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন আমরা এতটুকু বোঝা নামিয়ে দিয়ে নৌকা হাল্কা করতে চাইছি না।"

"ধর্ম থেকে অজীর্ণ হয়েছে, বৈদ্যরাজ।"

"ধর্মের ক্ষয়রোগ! কি অত্যাচারই না আমরা করেছি? কোটি কোটি বিধবাকে প্রতিবছর আগুনে পুড়িয়েছি। নবনারীকে নিয়ে পশুব মত বেচাকেনা করেছি। দেবালয় এবং বিহারে সোনাচাঁদি আর হীরামোতিব বাহার বসিয়ে ম্লেচ্ছ লুণ্ঠনকারীদেব আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আর শত্রুদেব সংগে মোকাবিলা করার সময় আত্মকলহে ডুবে গিয়েছি। আপন ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জন্য প্রজাদের শ্রমার্জিত সম্পদকে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করেছি আমরা।"

"শুধু লালসা নয় বৈদ্যরাজ, উন্মত্ততা। নিজের কাম-সুখ চরিতার্থ করতে প্রিয়তমা সহৃদয়া একজন স্ত্রীই যথেষ্ট, আর ইন্দ্রিয়ের উন্মত্ততাকে প্রশমিত করতে পঞ্চাশ হাজাবও কিছুই নয়। এখানে ত ভালবাসার কোন স্থান থাকতে পারে না। গত সংক্রান্তির দিন আমার বাবা যখন আপন অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের অনেককেই ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন, তখন তারা কেউই কাঁদেনি, বরং ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়েছে খুব। ভামা আমাকে বলেছে একথা।"

"দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণের ঘরে খুব বেশী হলে একটি বা দুটি সতীন থাকতে পারে, কুমার, ষোল হাজারের ভিড়ও সেখানে থাকবে না। অবশ্য একেও আমি দাসত্ব বলে মনে করি। স্ত্রীলোক কি একটা সম্পত্তি যে তাকে এইভাবে দান করা যাবে?"

"আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা সকলে এক হয়ে তুর্কদের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।"

"সে সব ত মহারাজের হাতে। ভণ্ড শ্রীহর্ষ তাঁর পাশে পাশে লেগে রয়েছে।"

৪

অষ্টমীর রাত। পূবদিগন্তে সদ্যোমাত্র চাঁদ উঠতে সুরু করেছে। গোটা পৃথিবীটা আলোকিত হয়ে উঠতে এখনো অনেক দেরী। চারিদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ

করছে, তারই বুক চিরে মাঝে মাছে পেচকের ভীতিপ্রদ ডাক শোনা যাচ্ছে। নিঃসীম এই নিস্তব্ধতার মাঝে দুজন লোক তীর থেকে দ্রুত যমুনার জলে নেমে পড়ল। মুখে আঙ্গুল দিয়ে তিনবার শিষ দিল তারা। যমুনার অপর দিক থেকে একটি নৌকা আসতে দেখা গেল। নীরব-প্রবাহিত জলস্রোতে ধীরে ধীরে দাঁড় টেনে মাঝারি গোছের এক নৌকা পারে এসে ভিড়ল। দুজন লোকই নিঃশব্দে নৌকায় উঠে বসল। ভিতর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল—"সেনানায়ক মাধব ?"

"হ্যাঁ আচার্য, আলহনও আমার সাথে এসেছে। কুমার কেমন আছেন ?"

"এখন পর্যন্ত ত জ্ঞান হয়নি; তার জন্য অবশ্য আমিই সামান্য ওষুধ দিয়ে রেখেছি। কি জানি, যদি রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে চায় কুমার ?"

"কিন্তু আচার্য, আপনার আদেশ কখনো অমান্য করতে পারেন না তিনি।"

"সে আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহলেও এই-ই ভাল, ক্ষতের ব্যথাও এতে কমে যাবে।"

"ক্ষততে ভয়ের কিছু নেই ত, আচার্য ?"

"না, সেনানায়ক, ক্ষত আমি সেলাই করে দিয়েছি এবং রক্তস্রাবও বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্বলতা খুবই আছে, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই আর। এবারে বল ত কি কাজ শেষ করে এলে তুমি ? মহারাজের শব রাজান্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছ ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন তবে রাজান্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা মহারাজের সংগে সহমরণে যাবে !"

"যার যাওয়ার সে যাবে।"

"আর সেনাপতি ?"

"বুড়ো সেনাপতি ত মরতে মরতে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। পরতা ঘুরতে দেখে বহু সেনানায়ক পালিয়েছে, কিন্তু পালাবার কৌশলও তারা জানে না। আমি আশা করিনা যে, ওদের মধ্যে কেউ বেঁচে আছে।"

"এসব ব্যাপার যদি তিন বছর আগে ঘটত এবং হরিশ্চন্দ্র আমাদের রাজা আর তুমি মাধব কান্যকুব্জের সেনপতি হতে !"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাধব বলল, "আপনার প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার, আচার্য মহারাজকে আপনি অনেক করে বুঝিয়েছিলেন যে পৃথ্বীরাজের সংগে এক হয়ে তুর্কীদের সাথে মোকাবিলা করা উচিত, কিন্তু সে সবই অরণ্যে রোদন প্রমাণিত হয়ে গেছে।"

"এখন সে আফশোষ করে কোন লাভ নেই। আর কি ব্যবস্থা করলে বল ?"

"পঞ্চাশজন করে ভাগ করা সৈন্যদলে বোঝাই পাঁচশ' নৌকা এখনই এসে পড়বে। গাগা, মোগে, সলখুর নেতৃত্বে গোটা সৈন্যবাহিনীটাকে ভাগ করে আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি যে, চন্দাবর থেকে পুবে সরে এসে তুর্কীদের সংগে যুদ্ধ কর—সম্মুখ-সমরে কম এগুবে, অতর্কিত আক্রমণই বেশী চালাবে এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়ছে দেখলে পুব দিকে হটে আসবে।"

"কনৌজের রাজপ্রাসাদ.........?"

"সেখান থেকে যতটা জিনিষ সরানো সম্ভব, সরিয়ে ফেলেছি আমি। দুদিন আগে গঙ্গাতেই অনেকগুলো নৌকা নামিয়ে দিয়েছি।"

"এইজন্যই তোমাকে সেনাপতির রোষ থেকে আমি বাঁচিয়েছি মাধব। নিজের আগে তোমাকেই সে মেরে ফেলত। তোমাকে এবং কুমারকে জীবিত দেখে আমি বড়ই সুখী হয়েছি। এবার হিন্দুদের কিছু আশা রইল। যাই ঘটুক, শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়তে হবে। প্রতি পরমাণু পরিমাণ শক্তি বুঝেশুনে ব্যয় করতে হবে আমাদের।"

"অন্য কতগুলো নৌকা আসছে বলে মনে হচ্ছে আচার্য!"

"সেনানায়ক আলহন, ওগুলো এলেই ওদের সব এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়ে দেবে।"

"আচ্ছা আচার্য—" বিনীতভাবে বলল আলহন।

"গলুইর ভিতরে চল মাধব। কিন্তু ওখানে অন্ধকার রয়েছে? ইচ্ছা করেই আমি ওখানকার প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছি।" একটু এগিয়ে তিনি বললেন, "একটু দাঁড়াও —রাধা!"

"বাবা!"—এক তরুণ নারী কণ্ঠ থেকে আওয়াজ এলো। চকমকি ঠুকে প্রদীপ জ্বালা হল, "লোহাটা যত্ন করেই রেখেছিলে ত, না?"

"হ্যাঁ।"

এবাবে তিনি মাধবের দিকে ফিরে বললেন—"ভাই, কেউ বৈদ্যরাজ বলে, কেউ আচার্য, কেউ বা বাবা! এ সব মনে রাখাও আমার পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়চে। তোমরা সবাই আমার ছেলেবেলার নাম 'চক্কু' বলে আমাকে ডেক।"

"উঁহু। স্ত্রীলোকের অভ্যাস বদলানো শক্ত, এজন্য আমরা সব আপনাকে বাবা চক্রপাণি পান্ডেয়র জায়গায় শুধু বাবা বলব।"

"বেশ! চল বাতি জ্বলে গেছে।"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল দুজনে। নৌকার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে পাটাতন, তার নিচে একের পর এক দুটো কুঠরী আছে। নৌকার একদিকে খানিকটা জায়গা খালি। দুজনে একটা কুঠরীর ভিতর ঢুকল। প্রদীপের মৃদু আলোয় একটা খাট দেখা যাচ্ছে। আকণ্ঠ সাদা শাল মুড়ি দিয়ে একটা লোক তার উপরে শুয়ে রয়েছে। খাটের পাশে মোড়ার উপর থেকে এক তন্বী উঠে দাঁড়াল। চক্রপাণি বললেন— "কুমারের কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত ভামা?"

"না বাবা, তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস সেই একইরকম ভাবে চলছে।"

"ঘাবড়ে যাওনি ত তুমি?"

"চক্রপাণির ছত্রছায়ায় থেকে ঘাবড়াব? গহড়বার বংশ যদি প্রথমেই তাদের এই গুরু দ্রোণকে চিনতে পারত!"

"আমাদের প্রধান সেনাপতি পরম সহায়ক মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের সেনাপতি মাধব এসে গেছে দেখ।"

"মহাদেবী ভামা, আপনার সেবক মাধব সেবার জন্য উপস্থিত"—এই বলে অভিবাদন করল মাধব।

"আমাদের মাধবের সংগে অপরিচিত নই আমি। কুমারের পাশাখেলার সাথী কি আমাকে ভুলতে পারে কখনও ?"

"আর যার বাহুদ্বয় গহড়বার বংশের ধূলিলুণ্ঠিত লক্ষ্মীকে পুনরায় তুলে ধববার শক্তি রাখে ভামা!"

"আপনাব মুখে 'ভামা' ডাক কত মধুর শোনায় বাবা!"

"নিজের বাবার কথা মনে পড়ে যায় বোধহয়, না ?"

"না বাবা! রাজকুলে আমাদের অন্যরকম আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। উঃ, কি মিথ্যাঠাট কি ভণ্ডামি এখানে ? মানুষের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আমাদের। আমার শ্বশুরেব সংগে পুরাতন রাজকুলনীতিকেও শেষ করে দিতে হবে।"

"শেষ হয়ে গেছে পুত্রা। বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে তা। কুমারের অন্তঃপুর দেখেছ তুমি ?"

চোখের জল মুছে ভামা বল্‌ল—"আপনিই আমাদের মানুষ করেছেন বাবা।"

"না পুত্রা, কুমার হবিশ্চন্দ্রের জায়গায় এ যদি অন্য কেউ হতো, তবে আমাকে শুধু শূন্যে চেয়েই থাক্‌তে হতো। এ সব কিছুই কুমার হরিশ্চন্দ্র··· ।"

"বাবা।"

কুমারের চোখের পাতা অর্ধ উন্মীলিত হতে দেখা গেল। দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌ল ভামা, "চন্দ্র আমার! রাহুর গ্রাসমুক্ত চাঁদ!"

"ঠিক বলেছ ভামা আমার! কিন্তু এইমাত্র যেন বাবার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম আমি ?"

"বাবা!"

"সে বাবা নয়, যিনি গহড়বারের সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়েছেন; এই বার যাঁকে তুমি বাবা বলো, আর আমিও যাঁকে বাবা বলেই ডাকব।"

প্রদীপের আলোয় কুমারের পাণ্ডুটে চেহারা দেখে তাঁর কপালে হাত রেখে চক্রপাণি বললেন—"শরীর কেমন আছে কুমার ?"

"শরীর এত ভালো আছে যে, মনে হয় যেন আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত হয়ে ফিরিনি।"

"ক্ষত কিন্তু খুব সাংঘাতিক ছিল কুমার!"

"হবে কিন্তু আমার পীযূষপাণি বাবাও যে কাছে ছিল আমার।

"একটু কম কথা বল কুমার।"

"বাবা চক্রপাণির মুখের প্রতিটি কথা হরিশ্চন্দ্রের কাছে ব্রহ্মবাক্যতুল্য।"

"কিন্তু এমন হরিশ্চন্দ্রও চক্রপাণির কোনই কাজে আসবে না!"

"এ হলো শুধু হরিশ্চন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা; কিন্তু বুদ্ধিবিবেচনার প্রশ্ন যেখানে রয়েছে সেখানে হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মাবাক্যকেও যাচাই না করে গ্রহণ করবে না।

"তোমাকে পেয়ে শুধু গহড়বার বংশ নয়, সমগ্র হিন্দু দেশ আজ ধন্য কুমার।"

"আর বাবা চক্রপাণিকে পেয়ে—একটু জল।" তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল গড়িয়ে দিল ভামা। নৌকা চলতে সুরু করেছে দেখে বাবা বললেন—"আমরা দ্বিতীয় রাজধানী বারাণসী চলেছি কুমার। সেনাপতি মাধব সৈন্যবাহিনীকে যথারীতি আদেশ দিয়ে দিয়েছে। সৈন্যেরা এদিক থেকে তুর্কীদের গতিরোধ করবে। ওদিকে বারাণসীতে গহড়বার লক্ষ্মীর জন্য নতুন সৈন্য সংগ্রহ করবো আমরা।"

"না বাবা, আগে যেমনটি বলতেন আপনি, সেই হিন্দু রাজলক্ষ্মী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাব আয়োজন করুন। পুনঃপ্রতিষ্ঠ এই রাজলক্ষ্মীই এবার হিন্দু রাজলক্ষ্মী হবে। হিন্দুর বাহুবলে জয় করেই একে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

"চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণের ভেদাভেদও ঘুচিয়ে দিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই গুরু দ্রোণ"

বাবা নুরদীন

কাল—১৩০০ খৃষ্টাব্দ

"সে দিনকাল শেষ হয়েছে, যখন আমরা ভারতভূমিতে দুগ্ধবতী গাভীর চেয়ে বড় আর কিছুই ভাবতে পারতাম না ; তখনকার দিনে কৃষক, কারিগর; ব্যবসায়ী ও রাজাদের কাছ থেকে আদায় করে অনেক বেশী ধনদৌলত জমা হত আমাদের হাতে ;—স্ফূর্তি করে ওড়াতাম আর টাকা পাঠাতাম গোর দেশে, এখন আর গোরের অধীন নই, স্বাধীন খিলজী শাসক আমরা ?" কথাগুলো বলল একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবক নিজের কালো দাড়ির উপরি ভাগের গোঁফের সূক্ষ্ম রেখার ওপর হাত বুলতে বুলতে। তার সামনে বসে ছিল শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন পুরুষ, পরনে শাদা আচকান, মাথায় বিরাট পাগড়ি।

বৃদ্ধ বলল—"কিন্তু জাঁহাপনা ! যদি মোড়ল, মাতব্বর, প্যাটেল তালুকদার এদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করা যায় তবে তারা বিগড়ে যাবে—আর খাজনা আদায় করার জন্য গ্রামে গ্রামে পল্টন পাঠাবাব সামর্থ্য আমাদের নেই।"

"প্রথমে এই বিষয়ে আপনাকে মন স্থির করতে হবে যে আপনারা ভারতের অধিবাসী হয়ে ভারতবর্ষের শাসকরূপে এদেশে অবস্থান করবেন, না, উট ও খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে হীরা, মতি লুটে নিয়ে যাওয়া গোর-গজনীর দস্যুরূপে বাস করবেন।"

"এখন ভারতবর্ষেই আমাদের বসবাস করতে হবে জাঁহাপনা।"

"হ্যাঁ গোলামের মত আমাদের অস্তিত্বের মূল এখন আর গোরে না, দিল্লীতে, যদি কোন বিদ্রোহ, কোন অশান্তি সুরু হয় তবে আরব, আফ্‌গানিস্থান থেকে সাহায্যকারী কোন সৈন্য আমরা পাব না, অথবা কোথাও পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পাব না।"

"একথা স্বীকার করি জাঁহাপনা!"

"সুতরাং এই আমাদের ঘর, এখন এখানেই থাকতে হবে, আর এজন্য এমনভাবে আমাদের এই ঘর তৈরী করতে হবে যাতে এখানকার লোকে সুখী এবং শান্ত থাকে। এখানকার প্রজাদের মধ্যে কতজনই বা মুসলমান আছে ? একশ বছরের ভিতর দিল্লীর আশপাশের জায়গাগুলকেও আমরা মুসলমান করে তুলতে পারিনি। মোল্লা আবু-মোহাম্মদ, আপনি কতদিনের ভেতরে সমগ্র দিল্লী এবং এই প্রদেশকে মুসলমানে রূপান্তরিত করতে পারন, বলুন ত ?"

সামনে উপবিষ্ট তৃতীয় বৃদ্ধ দাঁতহীন ঠোঁটের নিচ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রসারিত শাদা দাড়ির গোছা ঠিক করতে করতে বলল—"আমি নিরাশ হইনি সুলতানে-জমানা। তবে অশীতিবর্ষ বয়স্ক এই বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে যদি জবরদস্তি করে

মুসলমান করাতে চাই তবে তাতে পুরোপুরি সফল হবার কোনই আশা আমাদের নেই।”

“এজন্য আমরা ভারতে অধিষ্ঠিত মুসলমানেরা সমগ্র ভবতবর্ষ মুসলমান হয়ে যাবার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। এক শতাব্দী আমরা এই ভাবেই কেটে যেতে দিয়েছি এবং নিজেদের প্রজা-সম্বন্ধে কোনো কিছু না ভেবে যথাশক্তি শুধু ভূমিকর, বাণিজ্যশুল্ক এবং রাজস্ব আদায় করতেই চেয়েছি। তার পরিণাম দেখেছেন? নবাবের খাজনা বাবদ একটাকা আনে ত পাঁচটাকা যায় তহশীল আদায়কারীর পেটে। দুনিয়ার আর কোথাও দেখেছেন যে গ্রামের কর্মচারীরা রেশমী পোষাক পরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বের হয় ইরাণের তৈরী তীর ধনুক ব্যবহার করে না—ওয়াজির-উল্‌-মুল্‌ক আমার রাজ্যে এই ধরণের অবাধ লুণ্ঠন এখন বন্ধ করতে হবে।”

“কিন্তু হুজুর! বহু হিন্দু মুসলমান হয়েছে এই লোভেই। এবার তাহলে সে পথও বন্ধ হয়ে যাবে।”—মোল্লা বলল।

“ইস্‌লামও যদি এই ধরণের লুট এবং ঘুষের ব্যাপার সমর্থন কবত, তবু সবকাবী খাজনা এবং সরকারী সম্পত্তির স্বার্থে সে সব বরবাদ করে দেওয়া হত। তা ছাড়া যে সরকারের কর্মচাবীরাই লুঠ করে তার আর আশা ভরসা কী?”

“রাজ্যের ভিত এদের দিয়ে মজবুত হতে পাবে না একথা স্বীকার করতেই হবে জাঁহাপনা। কিন্তু আমি শুধু বিদ্রোহ বিপদের কথাই ভাবছিলাম!” ওযাজির বলল।

“গ্রামের আমলারা তাই করে বসবে যদি তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওযা হয়, একথা ঠিক। কিন্তু গ্রামে আমলার সংখ্যাই বেশী, না কৃষকেব সংখ্যা?”

“কৃষকের। আম্‌লা ত প্রতি একশ কৃষকে মাত্র একজন। এই একশো কৃষকের বক্ত চুষেই ঐ একজন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়, রেশমী পোষাক পবে আর ইরানী তীর ধনুক ব্যবহার করে। এই ধরণের রক্তচোষা বন্ধ কবে আমরা কৃষকের অবস্থার উন্নতি করব। তাদের সরকারের অনুগত করে তুলব। একজনকে অখুশী রেখে একশো লোককে খুশী করে তোলাই কি ভালো হবে না?”

“ঠিকই বলেছেন হুজুর! এ বিষয়ে আমারও এখন আর সন্দেহ নেই কোনো, যদিও হিন্দুস্থানের মুসলমান সুলতানগণের মধ্যে এক নতুন পন্থা আপনি অনুসরণ করতে যাচ্ছেন। এই পথেই সাফল্য লাভ করা যাবে। এতে গ্রামের উচ্চশ্রেণীব কিছু লোককে শুধু অখুশী করে তুলব আমরা।”

“গ্রামে এবং শহরে উচ্চশ্রেণীর সামান্য কিছু লোক অখুশী হয়ে উঠলে কিছুই যাবে আসবে না। সাময়িক এক খোড়ো ছাউনির জায়গায় আমাদের এখন শাসনকার্যের পাকপোক্ত ইমারতের বুনিয়াদ তৈরী করতে হবে।”

মোল্লা কী যেন চিন্তা করলো। দাড়ির উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, “হুজুর-বালা, আমিও এখন বুঝতে পারছি যে গাঁয়ের আমলাদের বদলে গাঁয়ের সমগ্র কৃষক শ্রেণীর সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখলে সরকারের পক্ষে তা অধিক লাভজনক বলেই

প্রমাণিত হবে। গ্রাম এবং শহরে কাপড়ের কারিগরদের প্রতি সামান্য নজর দিয়েছি আমরা। পঞ্চায়েতকে মজবুত করে তুলতে তাদের সাহায্য করেছি, যাতে করে বেণে-মহাজনদের লুটের হাত থেকে রেহাই পায় তারা। প্রত্যেক আমলা এদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিজেদের জন্য কাপড় তৈরী করত, তুলো ধুনিয়ে নিত। আমরা সেসব বন্ধ করে দিয়েছি এখন। আর তার পরিণাম স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি আজ, ধুনুরী, তাঁতি আর দর্জির ভিতর এমন লোক এখন আর দেখাই যায় না যারা ইস্‌লামের আওতায় চলে আসেনি।—"

"তাহলে এখন নিজেই দেখলেন ত মোল্লাসাহেব, যে কাজে সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হয়, তাতে ইস্‌লামের মঙ্গল!"

"কিন্তু এক বিষয়ে আমার আরজ আছে জাঁহাপনা! আপনি হলেন আমিরউল্—মোমিনীন (মুসলমানদের নায়ক)—"

"সেই সঙ্গে হিন্দুদেরও সুলতান আমি, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা ত খুব কম, সম্ভবতঃ হাজারে একজন।"

"হিন্দুরা অবিরাম ইস্‌লামের অপমান করে চলেছে, এদের এই আচরণ ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এই অপমানকর আচরণ বন্ধ করতে হবে।"

"অপমান? কেন তারা কি পবিত্র কোরাণকে নিয়ে পায়ের তলায় পিষছে?

"না, এতবড় সাহস কেমন করে তাদের হবে?"

"তবে কি মস্‌জিদ্‌কে অপবিত্র করছে তারা?"

"না না, সেও সম্ভব নয় তাদের পক্ষে।"

"তবে কি তারা সারা বাজারময় খোদার রসুলকে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

"না জাঁহাপনা! বরং যারাই আমাদের সুফিগণের সংস্পর্শে এসেছে, খোদা-রসুলকে তারা ঋষির মতই দেখছে। কিন্তু এরা যে আমাদের চোখের সামনে বসেই এদের কাফের ধর্ম পালন করে চলেছে।"

"আপনি যখন তাদের কাফের বলেই মনে করেন, তখন আর তাদেব কাফেরোচিত আচরণে এই আপত্তি কেন? আমার চাচা সুলতান জালালউদ্দিন এ বিষয়ে আমার মত করে মনস্থির করতে পারেননি যে, নিজেকে তিনি ভারতবর্ষের স্থায়ী শাসকরূপেই গণ্য করবেন, না, সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত এক অস্থায়ী শাসন বলে গণ্য করবেন। কিন্তু তিনিও একবার আপনার মত এক প্রশ্নকারীকে কী জবাব দিয়েছিলেন জানেন?"

"না হুজুর-বালা!"

"বলেছিলেন,—'বেওকুফ্ দেখতে পাওনা আমার মনজিলের সামনে দিয়ে প্রতিদিন হিন্দুরা শাঁখ বাজিয়ে আর ঢোল পিটিয়ে নিজেদের মূর্তিপূজোর জন্য যমুনার তীরে যায়, আমার চোখের সামনেই তারা তাদের কাফের-ধর্মের অনুষ্ঠান করে, আমার এবং আমার শাহী-রোবকে (বাদ্‌শাহী মর্যাদা) খাটো করে ছাখে, তারা আমার ধর্মের দুশ্‌মন (হিন্দু)

যারা আমার রাজধানীতে আমারই চোখের সামনে বসে বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে এবং ধন-দৌলত আর উন্নত অবস্থার জন্য মুসলমানদের সাথে নিজের ঠাট-ঠমক আর অহংকার জাহির করছে। আমার কাছে এ লজ্জার কথা। ধনদৌলত সমস্তই আমিই তাদের হাতে তুলে দিয়েছি তাই এবং আমি নিজে দানহিসেবে তাদের দেওয়া সামান্য খড়কুটো নিয়েই খুশী রয়েছি। আমার মনে হয় এর চাইতে ভালো জবাব আমিও দিতে পারি না।"

"কিন্তু সুলতানে-জমানা, ইস্‌লামের প্রতিও ত সুলতানের কর্তব্য রয়েছে।"

"এমন অপরাধও যে করেছে যার সাজা হলো ফাঁসী, সেও ইস্‌লামের শরণে এলে আমি তার বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যে গোলাম হয়ে আছে অথচ ইস্‌লাম গ্রহণ করেছে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দেবার হুকুম দিতে পারি। কিন্তু সরকারী খাজনা থেকে তার খরিদ মূল্য দিয়ে। এই দেশে কোটি কোটি টাকা গোলাম রাখায় ব্যয় হয়েছে। কাজেই ও ছাড়া সমস্ত গোলামের মুক্তির কথা ত আপনি বলতেই পারেন না।

"না জাহাপনা, গোলাম রাখার অধিকার সম্বন্ধে ত আল্লাহ্‌তালাও ফরমাজ দিয়েছেন।"

"না, যদি আপনি বলেন ত আমি আমার তখ্‌তের বিনিময়েও মুসলমান-অমুসলমান সমস্ত দাস দাসীর মুক্তির ফরমান জারি করতে পারি!"

"কিন্তু এ তাহলে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হবে।"

"শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কথা ছাড়ুন মোল্লা সাহেব, এই মুহূর্তে আপনি ত নিশ্চয় কোনো প্রিয় দাসীর কথা ভাবছেন! সবচেয়ে বেশী গোলামই ত রয়েছে মুসলমানের ঘরে।

"আল্লাহ্‌তালা মোমিনদের এই অধিকার স্বীকারই করে নিয়েছেন।"

"কিন্তু-দাসদাসীরাও যদি মোমিন হয়! তাহলেও অবিশ্যি আমার মনে হয় আর আপনি এই দুনিয়ার মুক্ত হাওয়ায় এদের শ্বাস গ্রহণ করতে দেবেন না এবং শুধু বেহ্‌স্তের আশায় এদের বসিয়ে রাখবেন।"

"আমার আর কিছু বলার নেই। ইস্‌লামী সাম্রাজ্যে ইস্‌লামী শরীয়তের শাসন চালু হওয়া উচিৎ, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই।"

"কিন্তু এই চাওয়া টুকুই যে কম নয় মোটে। এরজন্য ইস্‌লামী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাকেই মুসলমান হতে হবে। আপনাদের সামনে—আপনিও শুনুন ওয়াজির সাহেব—আমার মতামত সাফ্‌ জানিয়ে দিতে চাই। সুলতান মামুদের মত এক বিদেশী সুলতান জবরদস্ত বিদেশী সৈন্যবাহিনী সংগে নিয়ে শান্তিপূর্ণ শহর সমূহ লুণ্ঠন করতে পেরেছিলো, লুটের মাল উট এবং খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পেরেছিল, কিন্তু সেরকম কোনো কাজ করা কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত আমার মত লোকের ক্ষমতার বাইরে। আমার সরকার কায়েম হয়েছে হিন্দু প্রজাদের রাজস্বের উপর, কায়েম হয়েছে হিন্দু সিপাই, সেনানায়কদের উপর নির্ভর করে—আমার সেনাপতি মালিক হিন্দু; পাঁচ হাজার সৈন্যের সেনানায়ক চিতোরের রাজা আমার স্বপক্ষে।"

"কিন্তু জাঁহাপনা গোলাম সুলতানও ত দিল্লীতেই থাকতেন।"

"আপনি বাধা দেবেন না! আমাকে চঞ্চল এবং বদ্‌মেজাজী বলা হয়, কিন্তু এইসব বিরোধী মতামত শোনা থেকে আমাকে বিরত করতে পারে না। গোলামদের সরকার এক রাতের পাখীর বাসার সামিল ছিল। মংগোলদের সৃষ্ট তুফানে হিন্দুস্থানের ইসলামিক রাজত্ব কোনোমতে বেঁচে গেছে, হিন্দুরা জানতো না যে মংগোলদের মত দুশমন মুসলমানেরা কখনো ছাখেই নি, তা না হলে, তারা যদি মংগোলদের সামান্য ও উৎসাহ দিত তবে ভারতের মাটিতে নতুন জন্মানো ইসলামী সাম্রাজ্য দাঁড়াতেই পারত না। জানেন না চেঙ্গিসের বংশ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য চীনের উপর আধিপত্য করছে?"

"জানি হুজুর-বালা।"—মোল্লা বললো, "এবং ঐ বংশ বৌদ্ধ ধর্মকেই অনুসরণ করে।"

"বৌদ্ধধর্ম। তার এতসব মঠ-মন্দির জ্বালিয়ে দেবার এবং মাটিতে মিশিয়ে দেবার পরও এখন পর্যন্ত কাফেরদের সাকার স্বরূপ ধর্ম ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।"

'কাফেরদের সাকার স্বরূপ কেন?"

জাঁহাপনা, হিন্দুদের—ব্রাহ্মণদের—ধর্মে ও সিরজনহার (স্রষ্টা) আল্লার কথাও কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ত তাঁকে একেবারেই অস্বীকার করে।"

'চেঙ্গিসের বংশ শুধু আজ নয়, তার পৌত্র কুবলেখার সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মের বিশ্বস্ত অনুচর বলে মনে করে নিজেদের। শুধু তাই নয় চেঙ্গিসের ফৌজে, মংগোলদের মধ্যে বহু সিপাহ-সালার এবং সৈন্য ছিল। বুখারা, সমরকন্দ, বলখ ইত্যাদি ইসলামী দুনিয়ার শহরগুলোর মুসলমানী সভ্যতার সমস্ত কেন্দ্রকে বেছে বেছে নির্মূল করে দিয়েছে তারা। তারা আমাদের নারীদের উচ্চ-নিচ বংশের বিচার না করে যথেচ্ছভাবে দাসীতে পরিণত করেছে। শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এই সমস্ত জুলুমকে প্ররোচিত করেছিল বৌদ্ধ মংগোলেরা। তারা বলত, আরবেরা আমাদের বিহার সমূহ ধ্বংস করেছে, আমাদের নগরসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছে, শিশুদের মেরে ফেলেছে, আমাদের এসবের বদলা নিতে হবে। ভেবে দেখুন, যদি মংগোলেরা ভারতীয় বৌদ্ধদের সংগে মিলে হিন্দুদের দলে টানবার সফলতা লাভ করত, তবে ইসলামের হাল কী দাঁড়াত?

"নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত জাঁহাপনা।"

"এইজন্যই বালুর চরে আমাদের রাজ্যের ভিত স্থাপন করা উচিৎ নয়, গোলামদের নকল করতে আমরা পারি না।"

ওয়াজীর এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ ছিল, এইবারে সে মুখ খুলল—"কিন্তু সরকার আলী! গ্রামের আমলাদের ক্ষমতা কমে গেলে অতদূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য পৌছুবে কী করে?"

'যখন রেশম পরা ঘোড়ায় চড়া আপনার দল ছিল না, তখন কী করে কাজ চলত—আপনি জানেন?"

"আমি সে সম্বন্ধে খোঁজ করিনি।"

"আমি করেছি। যখন শাসকেরা নিজেদের লুণ্ঠনকারী বলে মনে করল, তখন তারা

লুণ্ঠনকারী আমলা নিযুক্ত করল। সব জায়গায় সর্বদা এমনই হয়, এর আগে সমস্ত গ্রামে পঞ্চায়েত থাকত, সে গ্রামের সে ব্যবস্থা বা লড়াই-ঝগড়া থেকে স্থরু করে সরকারের রাজস্ব দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই নিজে করত। গ্রামের কোন এক ব্যক্তিকে দিয়ে রাজার কোন কাজ ছিল না। সে শুধু পঞ্চায়েতের সংগেই সম্পর্ক রাখত এবং মনে করত যে তার এবং খাজনা দেনেওয়ালা কৃষকের মাঝে সম্বন্ধ স্থাপিত করবার জন্য এই পঞ্চায়েত রয়েছে।"

"তাহলে জাঁহাপনা, একশ বছরের মৃত এই পঞ্চায়েতগুলোকে আবার আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে।"

"এছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। যদি ইস্‌লামী সাম্রাজ্যকে এই দেশে শক্তিশালী করে তুলতে হয়, তাহলে সর্বতোভাবে প্রজাসাধারণকে স্থখী সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য আমাদের হিন্দুপ্রজার রীতি-রেওয়াজ, নিয়ম-কানুনকে সম্মান করতে হবে, দিল্লীর সাম্রাজ্যে ইস্‌লামী শরীয়তের জায়গায় স্থলতানী শরীয়ত চালু করতে হবে। ইসলামের প্রচার মোল্লাদের কাজ, তাদের আমরা বৃত্তিদান করতে পারি। স্থফিদেরও কাজ তাই, এবং ভালভাবেই কাজ করে যাচ্ছে তারা, তাদের মঠগুলোকে আমরা নগদ টাকা দিতে পারি অথবা সরকারী খাজনা থেকে রেহাই দিতে পারি।"

২

বর্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও খালবিলগুলি জলে ভরে আছে। বড় বড় বাঁধ দিয়ে ঘেরা ধানের ক্ষেতে জল জমে আছে, তার ভেতর সবুজ সবুজ ধানের শিস দুলছে। চারিদিকে স্থদূর বিস্তৃত মগধের সবুজ প্রসারের মাঝখানে বড় হিলসা (পাটনা) গাঁ অবস্থিত, সেখানে কিছু ব্যবসায়ীদের ইঁটের পাকাবাড়ী রয়েছে, বাকী সব কৃষক এবং কারিগরদের টালি বা খড়ের ঘর। এ ছাড়া ব্রাহ্মণদের কিছু বাড়ী আছে, তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। হিলসার মন্দিরসমূহ একশ বছর আগে (মহম্মদ বিন-বখতিয়ার) খিলজির সৈন্যরাই বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, তারপর থেকে সেই ভগ্নস্তূপ-গুলোকে যেখানে-সেখানে পূজা করছে হিন্দুরা। গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তে বৌদ্ধদের মঠ অবস্থিত ছিল, তার প্রতিমাগৃহে ভেঙ্গে-চুরে গেলেও, ঘর এখন পর্যন্ত বাসযোগ্য ছিল। ভিতরে ঢুকে তার অধিবাসীদের দেখে কেউ বলতে পারত না যে বৌদ্ধ-ভিক্ষু তাদের ছেড়ে চলে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মঠের বাইরে পাথরের ছোট এক পাটাতনের উপর আধা-বয়সী এক পুরুষ বসে ছিল। বাদামী এক কৌপীনে তার শরীর ঢাকা। মাথা

এবং ভ্রূ কামানো, গোঁফ-দাড়ি খুব ছোট ছোট—মনে হয় এক সপ্তাহ আগে কামানো হয়েছিল। হাতে তার কাঠের মালা। সেদিনটা ছিল আশ্বিনের পূর্ণিমার দিন, গ্রামের নরনারী সকলে খাবার, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে এসে কৌপীনপরা পুরুষের সামনে রেখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষটি স্মিত-মুখে হাততুলে আশীর্বাদ দিচ্ছিল সবাইকে।—

এসব কী? হিলসার পুরোণো বৌদ্ধমঠ ত নষ্ট হয়ে গেছে? গেছে সত্যি, কিন্তু মঠের বাইরে ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভাব ঠিকই ছিল। আজ হিলসার কৌপীনধারী বাবাকে দেখে কি বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়া আর কিছু বলা যায়? সে ছিল অবিবাহিত, শুধু সেই নয় তার পূর্বতন চারজন গুরুও অবিবাহিত কৌপীনধারী ছিল হিন্দু—অথবা বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হওয়া দশ-পাচ ঘর কারিগর একে সন্ন্যাসীর সমাধি বলে বলত, ব্রাহ্মণ এবং কিছু ব্যবসায়ী একে মঠ বলত না, কিন্তু গ্রামের বাকী সকলের কাছে এখনও এ মঠ রয়েছে। এই বাবার আগেও কোন জাতিবিচার হত না, আর নতুন বাবাগণেরও জাত নেই কোন। এরাও কৌপীন পরত, অবিবাহিত থাকত। ব্যারাম হলে এরা লোকের শনি ছাড়ায়, মরণ এবং শোকের সময় এরা অলখ-নিরঞ্জন-নির্বাণের উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করে। এইজন্য আজ শরতের পূর্ণিমার নির্ব্বাণ দিনে লোকে আগের মতই এই মুসলিম ভিক্ষুদেরও পূজা দেয় এসে। আর কারিগর মুসলমানেরা প্রথমে যেমন বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের আপন পূজ্য গুরু বলে মান্য করত, তেমনি এখন বাবা এবং তার কৌপীনধারী চেলাদের মান্য করে।

মঠের পুরোনো মোহান্ত (পীর) দের সমাধি (কবর), গুলোকে বন্দনা করে গ্রামবাসীরা ধীরে চলে গেল। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রূপালী চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই সময় কারিগরদের ঘরের দিক থেকে দুটো লোকের সংগে কে একজন আঙিনার দিকে আসছে দেখা গেল, কাছে এলে বাবা মৌলবী—আবুল আলাইকে চিনতে পারল। তার মাথায় শাদা পাগড়ী, পরণে লম্বা চোগা পায়ে জুতোর উপর পর্য্যন্ত পায়জামা। তার কালো দাড়ি হাল্কা হাওয়ায় দুলছে। উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত বাড়াতে বাড়াতে মধুর স্বরে বাবা বলল,—

"আসুন, মৌলানা আবুল-অলাই। আস্‌সালাম-আলায়কুম।" মৌলানার শক্ত দুই হাতকে নিজের হাতে নিয়ে তাকে আলিংগন করল।

মৌলানাও অনিচ্ছুক ভাবে "ওয়ালেকুমসালাম" করল।

তাকে খোলা পাটাতনের কাছে নিয়ে গিয়ে বাবা বলল—"আমার তখ্‌ত এই নগ্ন পাথর, বসুন।"

মৌলানা বসবার পর বাবাও বসল, প্রথমে মৌলানাই কথারম্ভ করল।

"শাহ্ সাহেব, যখন এখানে কাফেরদের ভিড় লেগেছিলো, তখন আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই তামাসা।"

" 'তামাসা' একশবার বলুন মৌলানা, কিন্তু 'কাফের' বলবেন না। আপনি, নুরুর হৃদয়ে যেন শরাঘাত হয় এতে।"

"এই হিন্দুরা কাফের নয় ত কী ?"

"সকলের ভেতরই ঐ নূর রয়েছে; নূর আর কাফের আলো আর অন্ধকারের বিবাদের মত এরাও এক জায়গায় থাকতে পারে না।"

"তোমার এই সমস্ত তসব্বুফ্ (বেদান্ত) ইস্‌লাম নয়, ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি।"

"আমারা কিন্তু আপনাদের ভাবধারাকে ইন্দ্রজাল বা ভেল্কি আখ্যা দিই না। আমরা 'এক নদীর বহু ঘাট'—এর অস্তিত্ব স্বীকার করি। আচ্ছা, আপনারা সকল মানুষকেই খোদার সন্তান বলে মনে করেন না ?"

"হ্যাঁ, মনে করি।"

"আর এও মানেন ত যে তিনি সর্বশক্তিমান।"

"হ্যাঁ।"

"মৌলানা, আমাদের ঐ সর্ব-শক্তিমান মালিকের হুকুম বিনা যখন একটা পাতা ঝরতে পারে না, তখন আমি বা আপনি আল্লার এই সমস্ত সন্তানকে কাফের বলবার কে ? আল্লা যদি ইচ্ছা করতেন ত সকলকেই একপথে চালাতেন। চান না যে তার মানে হলো এই—সকল পথই সমান প্রিয় তাঁর।"

"শাহ সাহেব, আমাকে আপনার তসব্বুফের মিথ্যাগুলো শুনাবেন না।"

"কিন্তু মৌলানা, এ ত আমি ইসলামের দৃষ্টি কোণ থেকেই বলছি। আমরা স্থফীগণ ত আল্লা এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই স্বীকার করিনা। আমাদের কল্‌মা (মূলমন্ত্র) হল, 'অন-ল্-হক্' (আমিই সত্যদেব), 'হাম-ও-স্ত' (সবই ঐ ব্রহ্ম)।"

"এটা কাফেরের ধর্ম।"

"আপনি এমনি মনে করেন, আগেও বহু লোক এমনি মনে করত, কিন্তু স্থফীগণ আপন রক্ত ঢেলে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও তা করবে।"

"আপনাদের জন্যই এখানে ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।"

"আগুন এবং তলোয়ারের সাহায্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার যে প্রচেষ্টা আপনাদের; তাকে আমরা অন্যায় মনে করেছি ঠিকই কিন্তু তার বিরুদ্ধে ত রুখে দাঁড়াইনি, তবু কতটুকু সাফল্য আপনারা লাভ করেছেন শুনি ?

"আপনারা ওদের ধর্মকেই সত্য বলে প্রচার করেন।"

"হ্যাঁ, কারণ মহান্ সত্যকে কুলুংগীতে আটকে রাখার শক্তি নিজের ভিতর অনুভব করি না আমরা, ইস্‌লাম যদি তার শহীদদের কাছে সত্যি হয়, যদি তসব্বুফ আপনার প্রতিভাবান্ প্রেমিকের কাছে সত্যি হয়, তা হলে হিন্দুরাও আপনাদের তরোয়ালের নিচে হাসতে হাসতে গর্দান এগিয়ে দিয়ে হিন্দু ধর্মকেই সাচ্চা প্রমাণিত করে তুলছে।"

"হিন্দু-মার্গ সচ্চা ! হিন্দুদের মার্গ পূর্বের, আমাদের হল পশ্চিমের, সম্পূর্ণ উল্টো।"

"এতই যদি উল্টো হবে ত আজ সন্ধ্যায় গ্রামের এই কৃষকেরা মুসলমান মঠকে পূজো করে গেল কেন? আপনি কি মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুপনার গন্ধ-মাত্র সহ্য করতে চান না মৌলানা?"

"হ্যাঁ, সহ্য করা চলবে না।"

"তাহলে আমাদের সধবা মুসলমান স্ত্রীদের সিন্দুর মুছিয়ে দিন গিয়ে।"

"মোছাবো।"

বাবা হেসে বললেন—"সিন্দুর মোছাবে এই জন্যের জুম্মন, বলত বাবা আমাকে, তোমার সলিমা কি মেনে নেবে তা?"

"না বাবা, মৌলবী সাহেব জানেন না, সিন্দুর শুধু বিধবাদের কপাল থেকেই মোছা যায়।" পাশেই দণ্ডায়মান জুম্মন বলে উঠল।

বাবা তার কথা বলে যেতে লাগলো,—

"ক্ষমা করুন মৌলবী আবুল-আলাই আমরা সুফীগণ কোনো সুলতানের ভিক্ষা অথবা কোন আমীরের দয়ার দান নিয়ে এখানে বসি নি। আমরা কৌপীন আর লেংটি পরে এখানে এসেছিলাম। কোনো হিন্দুই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে নি। এই মঠটাকেই ধরুন, আগে এটা বৌদ্ধ-বিহার ছিল। আমার পূর্বতন পঞ্চম গুরু বৌদ্ধ-শ্রমণদের চেলা ছিলেন। এ কোন ছল নয় তা, তিনি এসেছিলেন বুখারা থেকে এবং বৌদ্ধশ্রমণদের বেদান্ত দ্বারা অকৃষ্ট হয়ে তাদের চেলা হয়েছিলেন। বেদান্তের বাণী সর্বক্ষেত্রেই এক; বাইরের পোষাকে এর কোনো পরিবর্তন হয় না; সে পোষাক বৌদ্ধেরই হোক, হিন্দুরই হোক বা মুসলমানেরই হোক। আমাদের ঐ গুরুর পরে এই মঠ মুসলমান নামধারী ফকিরদের জিম্মায় রয়েছে। বেশ বদলানোর উপর আমরা কোনোই জোর দিই নি, আমরা প্রেম শিখিয়েছি লোককে, যার ফলে দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের খুব কম লোকই আমাদের ঘৃণা করে। পণ্ডিতগণের মধ্যে জড়তা ছিল, প্রেমের পথ তারা চিনতে পারেনি, আপনারাও যেমন চিনতে পারছেন না আজ—আর এই জন্যই জুম্মনের বাপ-দাদাকে হিন্দুর বদলে মুসলমান নাম ধারণ করতে হয়েছিল, আর এখনও তাই এদের কাছে আপনাদের যথেষ্ট খাতির রয়েছে।"

৩

চৈত্রমাস শেষ হয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত গাছে নতুন পাতা গজাবার ছিল, সে গুলোতে গজিয়ে উঠেছে তা। এ বছর খুব আম হয়েছে, এজন্য আম গাছগুলোতে পুরোণো পাতাই রয়ে গেছে সব। নিচে খামারের উঠোন। সেখানে দুপুরের এই গরম আব্‌হাওয়ার

মধ্যেও দুজন কৃষক ফসল মাড়াই করছে। এই সময় কোনো পরিশ্রান্ত পথিক ঘর্ম সিক্ত হয়ে খামারের এক গাছের নিচে এসে বসল।—তার মুখচোখের চেহারা থেকে তাকে ভিনদেশী পথিক বুঝতে পেরে মংগল চৌধুরী তার কাছে এসে বলল—

"রাম রাম ভাই? এই রোদ্দুরে হাঁটা যথেষ্ট শক্তির কাজ!"

"রাম রাম ভাই! কিন্তু চলতে যাকে হবেই, তার রোদ্দুর-ছায়ার বিচার করবার সময় কই?"

"জল খাও ভাই, মনে হচ্ছে যেন মুখ শুকিয়ে গেছে তোমার, ওই ঘটিতে ঠাণ্ডা জল রয়েছে।"

"কী জাত তোমরা?"

"অহীর। মংগল চৌধুরী আমার নাম।"

"চৌধুরী, ঘটি-দড়ি দুই-ই আমার কাছে আছে, আমি ব্রাহ্মণ, কুয়োটা দেখিয়ে দাও আমাকে।"

"যদি বল পণ্ডিতজী ত আমাব ছেলেকে দিয়ে আনাই।"

"দাও পাঠিয়ে, বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।"

"ঘীসা, এদিকে আয় ত বাবা।"

মাড়াই বন্ধ রেখে মংগল চৌধুরী গুড় আর কুয়ো থেকে টাট্‌ক, জল নিয়ে আসতে বলল ছেলেকে।

এদের কাছে জিজ্ঞেস করে পথিক জানতে পারল, দিল্লী এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূর. কাজেই আজ সে পৌঁছুতে পারবে না।

মংগল চৌধুরী অত্যন্ত রসিক লোক। চুপ করে থাকাই তার পক্ষে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার।

চৌধুরী বলল, "আমাদের এখানে ত এ বছর ভগবানের কৃপায় চমৎকার ফসল হয়েছে। বৈশাখে ফসল কাটা মুশ্‌কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের ওখানে ফসলের অবস্থা কী পণ্ডিতজী?"

"ফসল মন্দ হয়নি চৌধুরী!"

"রাজা ভালো হলে দেবতারাও খুশী হয় পণ্ডিতজী! যখন থেকে 'নতুন' সুলতান তখ্‌তে বসেছে তখন থেকেই প্রজারা বেশ সুখে আছে।

"তুমি কি সেই রকমই দেখছ, চৌধুরী?"

"আরে, এই খামারেই ত কিছুটা দেখছি। দু' বছর আগে এলে দেখতে পেতে এর চার ভাগের এক ভাগ ফসলও হয়নি।"

"উন্নতি হয়েছে, চৌধুরী!"

"উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সুলতানের কৃপাতেই পণ্ডিতজী। আগে আমরা কিষাণরা না খেয়ে, না পরে মরতাম আর বদ্‌মাসেরা রেশমী পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। গম এতটুকু হতে না হতেই তাদের ঘোড়া আমাদের ক্ষেতে এসে

হাজির হতো। কে প্রতিবাদ করবে? আমাদের গ্রামগুলোর ত এরাই ছিল সুলতান।"

এই সময় মংগল চৌধুরীর মতই হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে এক ময়লা ফতুয়া, মাথায় চিপা শাদা-টুপী পরিহিত অপর এক চৌধুরী এসে পড়ল এবং কথার মাঝেই বলে উঠল, "আরে এখন দেখছ ত চৌধুরী, কোথায় চলে গেল তাদের সেই বিরাট ক্ষমতা! এখন ব্যাটারা আবার দান-পাবার আশায় বসে আছে। আমাকে বলছিল সেই ব্রাহ্মণ—কী যেন নাম তার, চৌধুরী?"

"সিব্বা।"

"এখন কেন সিব্বা বলছ, সে সময় ত সে পণ্ডিত শিবরাম ছিল।" বলছিল, চৌধুরী ছেদারাম, "দু' মণ গম দাও, হাতে পয়সা হলে দাম দিয়ে দেব। মুখের উপর ত না বলা যায় না, কিন্তু আমার তখনকার কথা মনে পড়ল, যখন এই ব্রাহ্মণ ভদ্রভাবে কথাও বলতে জানত না। 'আরে ছিদ্দে' ছাড়া অন্য কোনোরকম ডাক তার মুখ থেকে শুনিনি।"

"আর এখন? তুমি হলে চৌধুরী ছেদারাম, আর আমি চৌধুরী মংগলরাম। "মংগে' আর 'ছিদ্দে' থেকে কোথায় চলে এসেছি আমরা আড়াই বছরের মধ্যে।"

"আমি বলব চৌধুরী! এ সবই সুলতানের দয়া, না হলে আমরা 'মংগে' আর 'ছিদ্দে'ই রয়ে যেতাম।"

"সেই কথাই ত আমি বলছিলাম পণ্ডিতজীকে।"

"আমাদের পঞ্চায়েতও ফিরে পেতাম না আমরা, দিনও চলত না আমাদের।"

"চৌধুরী মংগলরাম, তুমি কলম ধরতে জানো না, অথচ তুমি গ্রামের পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছ—কী করে কাজ চালাও তুমি? আমলাদের কথা ছেড়ে দাও, এই সব বাণিয়ারাও এক টাকা দিয়ে দু' টাকার ফসল তুলে নিয়ে যেত। জ্যৈষ্ঠ মাস পার হতে না হতেই তোমাদের ঘরে ইঁদুর চরে বেড়াত।"

"আমরা ত তাই বলছি, আমাদের সুলতান লক্ষ বছর বেঁচে থাকুক।"

ব্রাহ্মণ পথিক অজ্ঞ আহীরদের মুখ থেকে এই তারিফ্ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে পড়ল, কিছু একটা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগল সে। গুড় আর জল খাওয়ার পর সে আরও উতলা হয়ে উঠল! চৌধুরীদের কথা শেষ হচ্ছে না দেখে মাঝখানেই সে বলে উঠল—"সুলতান আলাউদ্দিন আপনাদের পঞ্চায়েত ফিরিয়ে দিয়েছে—"

"হ্যাঁ পণ্ডিত, তার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু পণ্ডিত, জানি না কে আমাদের সুলতানের নাম অলাভদীন রেখে দিয়েছে। আমরা ত নিজেদের গাঁয়ে এখন লাভদীন বলি তাকে!"

"তোমাদের যা খুশী নাম রাখ চৌধুরী! কিন্তু জান সুলতান হিন্দুদের উপর কী অত্যাচার করেছে?"

"আমাদের মেয়েরা চাদর পর্যন্ত না পরে রাত দিন বুক ফুলিয়ে ক্ষেতে-খামারে ঘুরে বেড়ায়। কই, কেউ ত তাদের টেনে নিয়ে যায় না?"

"ইজ্জত-ওয়ালা ঘরের ইজ্জত নষ্ট করে তারা।"

"তাহলে আমরা হলাম সব বে-ইজ্জত-ওয়ালা কিন্তু তোমার সেই চোথামারা ইজ্জত-ওয়ালা কারা, পণ্ডিত?"

"তুমি অভদ্রভাবে কথা বলছ, চৌধুরী মংগলরাম!"

"কিন্তু পণ্ডিত, তোমার বোঝা উচিত যে যখন থেকে আমরা পঞ্চায়েত ফিরে পেয়েছি, তখন থেকে আমাদের ইজ্জতও ফিরে এসেছে। এখন আমরা জানি বড় বড় আমলার দলই কেবল করে ইজ্জতদার হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-হিন্দু, মুসলমান-মুসলমান বলেন, কিন্তু যারাই আমলা হয়েছে, সকলেই একরঙে রঞ্জিত ছিল, তা ছাড়া তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু।"

একটা কথা বাদ পড়ে যাচ্ছে দেখে চৌধুরী ছেদারাম বলে উঠলো—"আমাদের বলা হয় হিন্দু-মুসলমান—এরা দুজন আলাদা। কিন্তু আপোনি চৌধুরী, নিজেদের হিন্দু ব্রাহ্মণ বলা এই সব লোকেরা নিজের নিজের স্ত্রীকে সাত-পর্দায় ঢাকা বেগম বানিয়ে রাখছে।"

"হ্যাঁ চৌধুরী! অথচ আমার ঠাকুর্দা বলতো যে কণৌজ এবং দিল্লীর রাণীকে খোলামুখে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছে সে।"

ব্রাহ্মণ বললো—"কিন্তু চৌধুরী, সে সময় আমাদের ইজ্জত নষ্ট করবার মত কোনো মুসলমান ছিল না।"

"আজও আমাদের ইজ্জত খেতে-খামারে ঘুরে বেড়ায়, কেউ নষ্ট করে না তাকে।"

"আর যদি কখনও নষ্ট হয়ে থাকে ত সে ঐ ব্রাহ্মণ সিব্বারই চালে।"

"বেকার বসে খাওয়া এই সব লোক অন্যের ইজ্জত নষ্ট করা ছাড়া আর কী করবে!"

"এ হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নয় পণ্ডিত, এ হলো পরের উপর বসে খাওয়া লোকেদের কাজ। পাকা হিন্দু আমরাই পণ্ডিত। আমাদের মেয়েবউরা কোনো দিন সাত পর্দার আড়ালে থাকবে না।"

এরপর আর একবার সাহস করে বললো ব্রাহ্মণ—"আরে চৌধুরী, তোমারা ত জানো না, সুলতানের সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণে গিয়ে আমাদের মন্দির ভেঙে দিয়েছে, দেবমূর্তি সব পায়ের তলে গুঁড়িয়েছে।"

"আমরা অনেক শুনেছি পণ্ডিত, একবার নয়, হাজারবার শুনেছি যে মুসলমানী রাজত্বে হিন্দুদের ধর্ম নেই। কিন্তু আমার দিল্লীর খুবই কাছে থাকি পণ্ডিত, না হলে হয়ত আমরা বিশ্বাস করে নিতাম, আমাদের বিশ ক্রোশের মধ্যে ত কোন মন্দিরও ভাঙা হয়নি, কোনো দেবমূর্তিকেও পায়ের তলে দাবানো হয়নি।"

"হ্যাঁ, চৌধুরী মংগলরাম, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, তুমি ত আমার চেয়েও বেশী দিল্লীতে যাতায়াত করো, আমি অনেকবারই দশহরা দেখতে দিল্লী গিয়েছি। কি বিরাট মেলা হয় সেখানে, অর্ধেকের বেশী লোকই সেখানে স্ত্রীলোক। হিন্দুদের মেলা, কাজেই মেলার

লোক বেশীর ভাগই হিন্দু। দেবমূর্তি সাজিয়ে সুলতানের অলিন্দের নিচে দিয়ে নিয়ে যায় তারা, শঙ্খ, নাকাড়া আর নরশিঙা বাজাতে বাজাতে।"

"হ্যাঁ, চৌধুরী ছেদারাম, এসব মিথ্যাই। শেঠ নিষ্কামল সুলতান-প্রাসাদ থেকে একশ গজ দূরেই এক বড় মন্দির তৈরী করাচ্ছে। কয়লক্ষ টাকা লাগবে কে জানে। গতবারে পাথর আসতে দেখেছিলাম আমি। এবারে দেখে এসেছি এক কোমর দেয়াল উঠে গেছে। সুলতানের যদি ভাঙার ইচ্ছাই থাকবে, তাহলে নিজের চোখের সামনে মন্দির উঠ্‌তেই বা দেবে কেন?"

"হ্যাঁ, চৌধুরী, রাজায় রাজায় লড়াই হয়, লড়াইতে কেউ কারও অপেক্ষায় থাকে না। কিছু হয়ত হয়ে গেছে আগে, তাই নিয়ে এখন হল্লা বাধানো হচ্ছে। একশ বছর আগে আমাদের আশে-পাশে এমনি ঘটনা ঘটেছিলো, কিন্তু আজ কোথাও কিছু শোনা যায়?"

"আমার মনে আছে যখন আমরা গ্রামের কয়েকজন লোক হাকিমের তাঁবুতে গিয়েছিলাম, সে বলেছিলো—আগেরকার সুলতানেরা এক রাত্রি বাস করতে আসতো এখানে, আমাদের সুলতান লাভদীন আমাদের ঘরে সুখ-দুঃখের চিরসাথীরূপী সুলতান, এইজন্য প্রজাদের লুণ্ঠন করে না সে, বরং তাদের সুখী দেখতে চায়।"

"আর এখন শুধু এটা চাওয়ার কথা নয়, চারিদিকেই লোকেরা সব সুখী হয়ে উঠছে।"

৪

দিল্লীর বাইরে নির্জন এক কবর ছিল, তার কাছে কিছু নিম এবং তেঁতুলের গাছ জন্মেছিলো। অগ্রহায়ণের ঠাণ্ডা রাত। কাঠের আগুনের কাছে দুজন ফকীর বসেছিল, যার মধ্যে একজন আমাদের পরিচিত নূরদীন। দ্বিতীয় ফকীর নিজের শাদা দাড়ি এবং গোঁফের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললো,—

"বাবা, পাঁচ বছরের ভিতর আবার হরিখানে দুধের নদী বয়ে যেতে আরম্ভ করেছে।"

"ঠিক বলেছো বাবা জ্ঞানদীন। এখন কিষাণদের চেহারা বেশ হাসিখুসী দেখা যায়।"

"বাবা, ক্ষেত-খামার যখন হেসে ওঠে তখন মুখের চেহারায়ও হাসি ফোটে।"

"আমলারা ত গেছেই, এই বানিয়া-মহাজনেরাও মরে যেত ত শান্তির বাঁশরী বাজতো।"

"প্রচুর লোটে এরা। আর এদের এই বড় বড় মঠ, বড় বড় মন্দির-সদাব্রত ত এই লুঠের অর্থেই চলেছে।"

"এরা বলে, ধনী না থাকলে ধর্ম টিকবে না। আমি বলি, যতদিন পর্যন্ত ধনীরা থাকবে ততদিন পর্যন্ত অধর্মের পাল্লাই ভারী হয়ে থাকবে।"

'জ্ঞানী-ধ্যানী, পীর-পয়গম্বর, মুনিঋষি ছাড়া ধর্মের পথে কে চলবে? অথচ তাদের কাছে একটা কম্বল, একটা কৌপীন ছাড়া আর কি থাকে?"

'যতদিন পর্যন্ত গরীবের শ্রমে বড় হওয়া লোক থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ ভাই-ভাই হতে পারে না। আর সুলতানও মানুষে মানুষে শত্রুতা বাড়িয়ে তোলবার একটা যন্ত্রমাত্র, অথচ তার মান-মর্যাদাও জনসাধারণের শ্রম-বিনা টিঁকতে পারে না।"

"সেই দিনের আশায় আমরা থাকবো বন্ধু যেদিন এই সমস্ত গোলকধাঁধাঁর খেলা হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুরৈয়া

কাল : ১৬০০ খৃষ্টাব্দ

বর্ষার কর্দমাক্ত বারিধারা চারিদিকে গড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছিল। সমতল ভূমির উপর দিয়ে মন্থরগতিতে জলের ধারা গড়িয়ে চলেছে, বেগে ছুটে চলেছে ঢালু জমির উপর দিয়ে, আর উচ্ছল আবেগে ফুলে উঠে বিস্তৃত পাহাড়ী জলস্রোতের রূপ ধারণ করেছে নদীনালাগুলোর বুকে। গাছেরা যেন এখনও পর্যন্ত জলভরা মেঘ ধরে রেঁখেছে, ওগুলো থেকে এখনও বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ছে টুপটাপ্ করে। এসব ছাড়া এমনিতে বর্ষা এখন গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষণ ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

এক শমীবৃক্ষ থেকে কিছুটা দূরে শ্বেতবসনা এক তরুণী দাঁড়িয়েছিল। তার মাথার উপর থেকে শাদা চাদর খসে পড়েছে এবং দ্বিধাবিভক্ত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের গভীর অরণ্যাণীতে প্রবাহিতা গংগার রূপালী ধারার মতই সিঁথির সরল রেখা দেখা যাচ্ছে। কানের পাশে কুঞ্চিত কালো কুন্তল থেকে এখনও দু-একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। তরুণীর তুষারশুভ্র গম্ভীর মুখমণ্ডল থেকে বড় বড় কালো চোখ দুটো যেন দূরস্থিত কোনো চিত্রপট নিরীখ্ করছে। আজানুলম্বিত রেশমী বাস জলে ভিজে বুকের সংগে সেঁটে রয়েছে, যার নিচে থেকে লালকাঁচুলীতে বাঁধা সুগোল স্তনযুগল স্পষ্টভাবে উপচে পড়েছে মনোরম ভঙ্গিমায়। সরু কোমর থেকে পায়জামা পরা রয়েছে, তার আঁটাসাঁটো নিম্নাংশে তরুণী জংঘা প্রদেশের সুডোল আকৃতি পরিপুষ্ট হয়ে রয়েছে। কর্দমাক্ত শাদা মোজার উপর লাল রংএর জুতো পরা রয়েছে। জলে ভিজে সে দুটো আরও নরম এবং সম্ভবতঃ হেঁটে চলারই অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এক তরুণকে তরুণীর দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার উঁচু পাগ্ড়ী, আচ্কান সবই শাদা এবং সবই ভিজে। কাছে এসেও সে লক্ষ্য করলো তরুণীর দৃষ্টি তার প্রতি পড়ছে না। পায়ের শব্দ না করেই তরুণীর পাশে দুহাত দূরত্বের মধ্যে এসে গেল সে। কিছুদূরে বয়ে চলা নালার কর্দমাক্ত জলধারা স্থিরদৃষ্টিতে দেখছিল তরুণী। তরুণ ভেবেছিলো, তার সহচরী এবারে তাকাবে তার দিকে। কিন্তু এক এক মিনিটে এক একটা যুগ অতিবাহিত হয়ে চললো, তরুণীর চোখের তারা তবুও নিশ্চল হয়েই রইলো। কপালের উপর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণাগুলো মুছে ফেলবারও অবকাশ হলো না তার। নিজেকে আর অপেক্ষা করতে অসমর্থ দেখে ধীরে ধীরে তরুণীর কাঁধের উপর তার হাত রাখলো, তরুণী মুখ ফিরালো। দূরগত দৃষ্টি ফিরে এলো তার, উজ্জল হয়ে উঠ্লো বড় বড় কালো চোখ দুটো, সুন্দর রক্ত অধরপুটে মৃদুহাসির রেখা ফুটে বেরুলো এবং ভিতর

থেকে চিক্‌চিক্ করে উঠলো সুসজ্জিত দন্তরাজি। তরুণের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো সে—

"তুমি বহুক্ষণ থেকে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো কমল ?"

"বহুযুগ থেকে—সেই তখন থেকে, স্রষ্টা যখন সবেমাত্র জলের ভিতর থেকে বিশ্বসৃষ্টি সুরু করেছেন, পৃথিবী তখন গলিতাবস্থায় ছিল এবং পর্বত, বৃক্ষ বা প্রাণীসমূহের ভার বহন করতে পারার মত অতটা দৃঢ় ছিল না।"

"থামো, কমল ! তুমি তো সব সময়ই কাব্য করছ।"

"হায়, সুরৈয়া ! সত্যি কথাই তো তুমি বলো, কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আমার অদৃষ্টে কবিতা নেই।"

"সুরৈয়া অন্য কোন রমণীর সঙ্গে ঘর করা পছন্দ করে না।"

"এই হৃদয়ও তো ঐ কথা বলে। কিন্তু, তুমি অমন ধ্যানমগ্ন হয়ে কী ভাবছিলে বলোত ? বলনা, আমার সুরৈয়া !"

"ভাবছিলাম, বহুদূর—বহুদূর—সমুদ্র কতদূরে, কমল !"

"সবচেয়ে কাছে হলো সুরাট থেকে, মাত্র একমাসের রাস্তা।"

"আর এই জল কোথায় যায় ?"

"বাংলার দিকে। সে আরও অনেক দূর, সম্ভবতঃ দুমাসের রাস্তা।"

"বেচারা এই কাদাগোলাজলকে এতটা পথ চলতে হবে! আচ্ছা কমল, সমুদ্র দেখেছো তুমি ?"

"বাবার সংগে একবার উড়িষ্যা গিয়েছিলাম আমি, তখন দেখেছি প্রিয়ে !"

"কী রকম দেখতে ?"

"দিগন্তবিস্তৃত এক কালো মেঘ যেন পড়ে রয়েছে সামনে।"

"এই জলের অদৃষ্টেও এই সমুদ্রসন্দর্শন রয়েছে ! আচ্ছা ওখানে গিয়েও এর কাদা রং এমনি থাকবে ?"

"না সুরৈয়া, ওখানে একটিমাত্র রংই দেখা যায়,—ঘননীল বা কালো।"

"তুমি যদি নিয়ে যাও ত আমিও একদিন সমুদ্র দেখতে পাই।"

"সুরৈয়া প্রিয়তমা আমার, তুমি যদি আজ্ঞা করো ত এই জলের সাথেই যাত্রা করতে প্রস্তুত আমি।"

দুহাত দিয়ে কমলের গলা জড়িয়ে ধরে তার ভেজা গালে নিজের সিক্ত গাল চেপে ধরলো সুরৈয়া, তারপর কমলের উৎফুল্ল চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,—

"সমুদ্রে আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু এই জলের সাথে নয় কমল।"

"মলিন জলধারার সংগে নয় প্রিয়তমা ?"

"মলিন বলো না কমল, এ মলিন নয়। আকাশ থেকে যখন পড়ে তখন কি এ মলিন ছিল ?"

"না সুরৈয়া, চন্দ্রসূর্যের চেয়েও তখন নির্মল ছিল এ। তোমার ঐই সুন্দর অলকগুচ্ছ

কেমন উজ্জ্বল করে তুলেছে ছাখো জলের এই ধারা। চাঁদের মত শুভ্র তোমার দুটো গাল কেমন মনোরম করে তুলেছে এ! আকাশ থেকে সোজা তোমার যে সব অংগে এ পড়েছে, সে সমস্ত স্থানেই তোমার সৌন্দর্যকে অদ্ভুত উজ্জ্বল করে তুলেছে।"

"তাহলে ত এর এই মলিনতা তার নিজস্ব নয়। সাগরসংগমে এর যাত্রাপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে যে তারই সংগে সংঘর্ষে এই মলিনতা প্রাপ্ত হয়েছে যে। সোজা সাগরের জলে ঝরে পড়া ফোঁটাগুলোও কি এমনি মলিন হয় কমল?"

"না প্রিয়তমা।"

"এই জন্যই ত এই মলিনতাকে আমি এর দোষ মনে না করে ভূষণ বলেই মনে করি। তুমি কী বলো কমল?"

"তোমার অধর আমার মনের কথাকেই ব্যক্ত করেছে সুরৈয়া।"

২

আকাশের নীলিমার ছায়া সরোবরের অতল জলরাশিকে আরও নীল করে তুলেছে। অনল-ধবল শ্বেত পাথরের ঘাট আরও যেন সাদা হয়ে উঠেছে এই নীলিমার পটভূমিকায়। সবুজ দূর্বাঘাসের মধ্যে স্বল্পপত্রযুক্ত সবুজ বৃক্ষরাজি বড়ই সুন্দর লাগছিলো দেখতে। বিশেষ করে এই বসন্তের মধ্যাহ্নবেলায়। বহুদূর প্রসারী বৃক্ষশ্রেণীর লতা-মণ্ডপ এবং ঝর্ণাধারা সুসজ্জিত মনোরোম উদ্যান। শাহীবাগ আজ তরুণ তরুণীর বসন্তোৎসবের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত এই উদ্যানে স্বর্গবিহারীদের মত তারাও পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুষ্করিণী থেকে দূরে বাগানের ধারে লালপাথরের ছাউনীর বাইরে চারব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মাথায়ই এক ধাঁচের পাগড়ী—সামনের দিকে কিছুটা প্রসারিত; হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একই রকমের গলাবন্ধ জামা, একই রকমের শাদা কোমরবন্ধনী। সকলের মুখের উপরই এক রকমের গোঁফ, অধিকাংশই শাদা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ এরা বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর এগিয়ে এসে চারদিক খোলা ছাউনীর নিচে বিছানো গদীর উপর বসে পড়ল। চারদিকে এক অখণ্ড নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, এই বৃদ্ধের দল ছাড়া আর কেউ-ই সেখানে ছিল না। নীরবতা ভঙ্গ করে একজন বলে উঠল—

"বাদ্‌শাহ্‌ সালামত্‌!—"

"কি ফজল এখনও কি আমি দরবারে অধিষ্ঠিত রয়েছি? মানুষ কি কখনও সাধারণ মানুষের মত সরল হয়ে থাকতে পারে না?"

"ভুলে যাই—"

"নাম ধরে ডাকো, বাল্লোনা জলাল বা আকবর, না হয় বন্ধু বলো!"

"এ বড মুশ্‌কিল মিত্র জালাল, দুরকমের জীবন যাপন করতে হয় আমাদের।"

"দুরকম নয়, চাররকম ভাই ফজ্‌লু!"

"ভাই বীরু! তোর তারিফ করি আমি, সবসময়েই যেন সমস্তকিছুর জন্য তৈরী থাকিস্ তুই, আমি তো যখন এক দুনিয়া থেকে অপর দুনিয়ায় চলে আসি তখন মনটাকে তৈরী করে নিতে অনেক সময় লেগে যায়। কী ভাই টোড়র, ঠিক বলিনি?"

"হ্যাঁ ভাই ফজলু, আমিও তাজ্জব বলে যাই, কী ক'রে এমন করে বীরু। অদ্ভুত মগজ ওর—"

"বীরবলকেই না হিন্দুস্তানের সমেত লোক ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্ণধার বলে জানে!"

"কিন্তু টোডর মলও তো বীরু ভাই! সেও কি সব জায়গায় পযবেক্ষণ চালায় নি?"

"বীরবল—চালাক বা না চালাক, দুনিয়া আমার কথাই জানে, আর আমার এই মগজের প্রশংসা আমাদের জল্লুও করবে।"

আকবর—"নিশ্চয়ই, আর এ ব্যাপার শুধু সেই কাহিনীতেই নয়, বাদ্‌শাহ জলালুদ্দিন আকবরের বিভিন্ন বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো সম্বন্ধে যা সুপ্রচলিত।"

বীরবল—"এ এক চমৎকার স্মৃতি মনে করিয়ে দিলে জল্লু ভাই। ঐ কাহিনীর সংগে সংগে আমিও মারা যেতে বসেছি। বীরবল এবং আকবরের নামে যে কোন রকমের কাহিনী রচনা করে বলে বেড়ানো এক সখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বহু কাহিনী আমি জমিয়ে ফেলেছি। এক একটা কাহিনীর জন্য এক এক আশরৃফি মূল্য ধরে রেখেছি।"

আকবর—"এই আশরৃফির জন্য কাহিনী গুলো তোমার মগজ থেকেই সোজা বেরিয়ে আসে না ত?"

বীরবল—"তাও হতে পারে, কিন্তু তাতে কোনো তফাৎ নেই। সে ক্ষেত্রেও ত একথা বোঝা যাবে যে কী রকম সব অর্থহীন কাহিনী আমাদের দুজনের নামে রটানো হচ্ছে, রাগ করিস না ফজলু ভাই, শেঠ ছদামীমলের মত কঞ্জুস নই আমি।"

আবুল ফজল—"না রে বীরু, আমার উপর মিছামিছি রাগ করিস না, তোর গল্প গুলোকে ভাই বড ভয় করি আমি।"

বীরবল—"হ্যাঁ, আমিই আইন-ই-আকবরীর মত পুঁথি লিখে রেখে দিয়েছি কিনা!"

আবুল ফজল—"আইন-ই-আকবরী পড়ার মত কটা লোক পাওয়া যাবে তুই-ই ধর্মতঃ বলত ভাই টোডর, আর বীরবলের গল্প গুলোকে মুখে মুখে ছড়াবার লোকই বা কত হবে।"

টোড়রমল—"এ তো বীরুও জানে।"

আবুলফজল—"যাহোক্। তোমার—আশরফি ওয়ালা কোনো গল্প তাহলে শোনাও বীরু!"

বীরবল—"কিন্তু তোমরা সকলে ত প্রথমেই ধরে নিয়েছ যে এ গল্প আশরফি দিয়ে কিনিনি আমি, আমার নিজের মগজ থেকেই বেরিয়েছে এ।"

আকবরর—"কিন্তু না বললেও কোন্‌টা আসল মুদ্রা কোনটা জাল সে আমরা বুঝতে পারি।"

বীরবল—"যেন আমার সব গল্পের উপরই মার্কামারা আছে। বেশ, যা তোমাদের মর্জি ভাই। গল্প তো শুনিয়ে দিই আমি! গল্পের সারাংশটুকুই কিন্তু সংক্ষেপে বলব শুধু।

"আকবরের একবার খুব সখ হল হিন্দু হবার। বীরবলকে সে এই কথা জানাল বীরবল বড়ই বিপদের মধ্যে পড়লো। বাদশাহকে সে না-ও করতে পারে না, অথচ তাকে হিন্দু বানাবার ক্ষমতাই বা তার কোথায়? দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকলো সে,—একদিন সন্ধ্যায় বাদ্‌শাহ্‌-মঞ্জিলের খিড়কির কাছে হিছ—ছো—ও,' 'হিছ-ছো—ও' করে জোর আওয়াজ হতে লাগলো। বাদ্‌শাহ্‌ মঞ্জিলের এই দিকটাতে এমন সময় কখনও কাপড় কাচার শব্দ শোনা যায় না। কৌতূহল বেড়ে গেল তাই বাদশাহ্‌র। এক মজুরের পোষাক পরে যমুনাতীরে এলো সে। রূপ যতই বদলাক না কেন, বীরুর চোখে ধরা না পড়ে পারলো না সে,—যাহোক্‌ ওখানে কাপড় আছড়ানো হচ্ছিল না, মোটাসোটা এক গাধাকে সোডা-সাবান দিয়ে রগ্‌ড়ে ধোয়া হচ্ছিল।"

মুচকি হাসিটুকু লুকিয়ে গলার আওয়াজ বদলে বাদ্‌শাহ্‌ জিজ্ঞেস করল,' "কী করছো হে চৌধুরী?"

—নিজের কাজ করছি ভাই, তোর কী দরকার তা দিয়ে?

—বড় অসময়ে ঠাণ্ডায় হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছো চৌধুরী!

—মরতে ত হবেই, কালই একে ঘোড়া বানিয়ে বাদ্‌শাহের কাছে দিতে হবে।

—গাধাকে ঘোড়া বানিয়ে?

—কী করা যাবে, এই হলো বাদ্‌শাহের হুকুম।

বাদ্‌শাহ্‌ এবার হেসে উঠে স্বাভাবিক স্বরে বললো,—চলো বীরবল, আমি বুঝতে পেরেছি যে মুসলমানের হিন্দু হওয়া গাধার ঘোড়া হবারই সামিল।

"ভাই ফজল, এই গল্প শুনে মনে হল, যেন আমার দেহের ভিতরে সাপ ঢুকেছে।"

আকবর—"আমাদের জীবন সায়াহ্নে এসে আমাদের এই গল্প শুনতে হচ্ছে! আমাদের সারা জীবনের একাগ্র সাধনার পরিণাম কি শেষে এই দাঁড়াবে।"

আবুলফজল—"আমরা শুধু আমাদের কালের ঝক্কিই বহন করতে পারি। কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করছে বসন্তোৎসব রত ওই সব যুবক-যুবতীদের উপর।"

টোডরমল—"কিন্তু ভাই আমরা ত মুসলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দুকে মুসলমান বানাতে চাইনি।"

আবুলফজল—"আমরা দুজনকেই এক করে দেখতে চেয়েছি—একজাতি এক প্রাণ বানাতে চেয়েছি।"

বীরবল—'মোল্লা আর পণ্ডিতেরা কিন্তু আমাদের মত চিন্তা করে না। আমরা চাই ভারতবর্ষকে শক্তিশালী রূপে দেখতে। ভারতের অস্ত্রে তীক্ষ্ণতা আছে, ভারতীয় মস্তিষ্কে প্রতিভা রয়েছে, যুবকদের রয়েছে সাহস। কিন্তু ভারতবর্ষের দোষ, ভারতের দুর্বলতা হ'ল তার ভেতরকার অনৈক্য; টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে তার ভাগ হয়ে পড়া।"

আকবর—"এই ত আমার একমাত্র আকাংখা ছিল বন্ধু, এতদিন পর্যন্ত আমরা এরই জন্য সংগ্রাম করে এসেছি। আমরা যে সময় কাজ আরম্ভ করি চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল তখন, কিন্তু এখন ত আর তা বলা চলে না। এক পুরুষে যতটা করা সম্ভব আমরা তা ঠিকই করেছি। কিন্তু এই গাধা-ঘোড়ার গল্প আজ পাথরের মত চেপে বসেছে আমার অন্তরে।"

আবুলফজল—"ভাই জালাল, নিরাশ হওয়াও আমাদের উচিৎ নয়। বৈরাম খান খানানের সময়ের সংগে তুলনা করো আজকের। সে সময় কি যোধাবাই তোমার স্ত্রী হয়ে হারেমে বসে বিষ্ণুর মূর্তি পূজো করতে পারত?"

আকবর—"তফাৎ সত্যিই আছে ফজল, কিন্তু লক্ষ্যে পৌছুতে এখনও আরও বহুদূর চলতে হবে আমাদের। ফিরিংগি পাদরাদের কাছে আমি শুনেছি যে তাদের ওদিকে সবচেয়ে বড বাদ্‌শাহও একটির বেশী স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে না। এই প্রথাব কথা আমার কত ভালো লেগেছে, তা সেই সময়েই আমার কথাবার্তা থেকে তুমি বুঝে থাকবে টোড়র। আমিও যদি এমনি ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারতাম! কিন্তু এ বড বিড়ম্বনার কথা যে মন্দ কাজ করবার স্বাধীনতা বাদ্‌শাহর যতটা আছে, ভালো কাজের সময় তা নেই। যদি সম্ভব হতো তবে সলিমের মা ছাড়া আর কাউকে আমার হারেমে রাখতাম না আমি। এ ব্যবস্থা যদি সলিমের জন্যও করতে পারতাম আজ!"

বীরবল—"প্রেম কেবলমাত্র একজনের সাথেই হতে পারে জালাল। মনোহর হংস-দম্পতিদের যখন দেখি, তখন বুঝতে পারি তাদের জীবন কত সুন্দর। আনন্দের দিনে যেমন পরস্পরের সাথী ওরা, বিপদের দিনেও ঠিক তেমনি।"

আকবর—"আমার চোখ থেকেও একবার জল ঝরেছিলো বীরু ভাই। সিংহ শিকারে গুজরাট গিয়েছিলাম সেবার। অবশ্য হাতীর পিঠে চড়ে বন্দুকের সাহায্যে সিংহকে মারা কোনো বাহাদুরীর কাজ নয়, এ কথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব,—সিংহের মত থাবা এবং নখ যখন তোমার নেই, তখন ঢাল-তরোয়াল নিয়ে তার সামনে এগুতে পারো তুমি, কিন্তু এর চেয়ে বেশী কোনো অস্ত্রধারণ করা বীরত্বের পরিচায়ক নয়। আমি কিন্তু বন্দুকের সাহায্যেই সিংহটিকে মারলাম। গুলি ওর মাথায় গিয়ে লাগল, আর্তনাদ করে সেখানেই পড়ে গেল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো তার সিংহী। অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে তাকাল, পরক্ষণেই এদিকে পিছন দিয়ে সিংহের গাল চাটতে লাগল। তৎক্ষণাৎ আমি শিকারীদের গুলি ছোঁড়া বন্ধ

করতে বললাম এবং হাতী ফিরিয়ে আনলাম। আমার মনে সেদিন এতবড় আঘাত লেগেছিল যে সিংহী যদি হামলাও করতো আমার উপর তবু হয়ত হাত তুলতাম না আমি। বহুদিন পর্যন্ত বেদনাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি এবং সেই সময়েই বুঝতে পেরেছি যে ওই সিংহের যদি হাজার পাঁচশ সিংহী থাকতো, তবে অমন করে সেদিন গাল চাটতো না তারা।"

আবুল-ফজল—"আমাদের দেশকে কতদূর পথ অতিক্রম করতে হবে, অথচ আমাদের গতি কত মন্থর! তাছাড়া এও ত আমাদের জানা নেই যে আমাদের পদযুগল অসমর্থ হয়ে পড়লে আমাদের ভার বহন করবার মত কেউ রয়েছে কিনা!"

আকবর—"আমি চেয়েছিলাম অস্ত্রচালনাকারী হিন্দু মুসলমান দুই জাতির মধ্যে রক্তসম্পর্ক স্থাপিত হোক। এই সম্পর্কের কথা স্মরণে রেখেই প্রয়াগে ত্রিবেণী তটে কেল্লা তৈরী করিয়েছি আমি। গঙ্গা যমুনাধারার এই সংগম আমার অন্তরেও এক বিরাট সংগমের স্পৃহা জাগ্রত ক'রে তুলেছে। কিন্তু কত সামান্য সফলতা তা'তে লাভ ক'রেছি আমি এখন দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুতঃ যে কাজ শুধু বংশ পরম্পরায়ই অনুষ্ঠিত হ'তে পারে, এক পুরুষের মধ্যে তাকে গ'ড়ে তোলা যায় না। কিন্তু একটা বিষয়ে চিরকালই আমার গর্ব থেকে যাবে যে, আমি যেমন বন্ধু পেয়েছি, তেমন বন্ধু খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। আকবর আর যোধাবাঈ মেহেরুন্নিসার মত মিশ্র বিবাহ ঘরে ঘরে দেখতে চাই আমি। অথচ এমন আর একটিও দেখতে পেলাম না।"

টোডরমল—"হিন্দুরাই এ বিষয়ে বেশী পশ্চাৎপদ ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে।"

বীরবল—"আর এখন তারা গাধাকে ঘষেমেজে ঘোড়া বানাবার গল্প তৈরী করছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানে যদি এতই তফাৎ থাকবে তো ঘোড়া গাধা হ'য়ে যাচ্ছে কি ক'রে! হাজার হাজার হিন্দুকে মুসলমান হ'য়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না কি?"

আকবর—"আমি তো সব সময়েই এ দেখবো ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে আছি যে, হিন্দু তরুণরা নাম এবং ধর্ম ত্যাগ না ক'রেই মুসলমান তরুণীদের বিয়ে করুক।"

আবুল ফজল—"এখানে আমি তবে একটা সুসংবাদ শোনাই জালাল! আমরা যে কাজ ক'রে উঠতে পারিনি, আমার সুরৈয়া সে কাজ ক'রেছে।"

সকলে উৎসুক নয়নে আবুল ফজলের দিকে তাকাল।

"তোমরা আরও শোনবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছে তো? আমাকে একটু বাইরে থেকে আসতে দাও—"

এই বলতে বলতে আবুল ফজল বাইরে গিয়ে থামের পাশে দাঁড়িয়ে কি দেখল, তারপর, ফিরে এসে বলল—"শোনার চেয়ে চোখে দেখাই ভাল, এসো আমার সংগে।"

সকলেই থামের কাছে গেল। সবুজ অশোক গাছের নীচে পাথরের উপর উপবিষ্ট দু'টি তরুণ মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে আবুল ফজল বলল—"ঐ দেখ, আমার সুরৈয়াকে।"

টোডরমল—"আর ঐ আমার কমল! দুনিয়া আর আমাদের কাছে অন্ধকার নয় ফজলু ভাই—"

এই বলে টোডরমল দুইহাতে আবুল ফজলকে জড়িয়ে ধ'রে আলিংগন ক'রল।

এরা দুজন যখন আলিংগন-মুক্ত হ'ল, তখন চারজনের চোখেই জল এসে প'ড়েছে। আকবর মৌনভংগ ক'রে বলল—"তরুণদের এই বসন্তোৎসবের ব্যবস্থা অনেক বছর হ'তেই আমি ক'রেছি। কিন্তু এত বছর পরে আজই প্রথম আসল বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান হ'ল। আমার মন চাইছে যে ওদের দুজনকে ডেকে কপালে আশিস্‌-চুম্বন দিয়ে দিই আমি। ওরা যদি জানে যে গঙ্গা-যমুনা সংগমের মত ওদের ঐ মধুর মিলনকেও অন্তরের সংগেই সমর্থন করি আমরা, তবে খুবই ভাল হয়।"

আবুল ফজল—"সুরৈয়া এ কথা জানে, তার বাপ-মা এই প্রণয়কে কত সুখের ব'লে মনে করে "

টোডরমল—"কমলত জানে না। কিন্তু তুমি বড় ভাগ্যবান ফজলু। কারণ সুরৈয়ার মাও তোমার সাথেই একমত। কমলের মা এবং সুরৈয়ার মা—দুজনে যদিও অন্তরংগ সখি, তবুও কমলের মা কিন্তু কিছুটা প্রাচীন পন্থী, যাহোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কমল আর সুরৈয়াকে আমি প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রব।"

আকবর—"সবচেয়ে আগে আমাকেই আশীর্বাদ করতে দেওয়া উচিত।"

বীরবল—"আর আমাকে তোমার সাথে নেবেনা জললু ?

আকবর—"নিশ্চয়ই, এমন ধোবী কোথায় পাওয়া যাবে ?"

বীরবল—"আর এমন ঘোড়া ব'নে যাওয়া গাধাই বা কোথায়।"

আকবর—"আমাদের এই মিলন আজ কত মধুর হ'য়ে গেল। মাসে একদিনও যদি এমন আনন্দ লাভ করা যেত !"

৩

ছাতের উপর চারিদিকে দরজাযুক্ত এক সুসজ্জিত কামরা। কামরার ভেতরের দিককার ছাত থেকে লাল, সবুজ, সাদা ঝার টাঙানো র'য়েছে। দরজাগুলাতে দু'পাল্লা ক'রে পর্দা দেওয়া। ভেতর দিককার পর্দাগুলো বুটিদার গোলাপী রেশমের। মেঝের উপর সুন্দর ইরাণী গালিচা। কামরার মাঝখানে সাদা গদির উপর অনেকগুলো তাকিয়া বালিশ পাতা। গদির উপর ব'সে দুটি তরুণী সতরঞ্চ খেলছে। এদের মধ্যে একজন আমাদের পরিচিত সুরৈয়া, আর লাল ঘাঘরা, সবুজ চেলী এবং হলদে ওড়না পরা অপর তরুণীটি বীরবলের তের বছরের কন্যা ফুলমতী। খেলার চাল দেবার চিন্তায় এত মগ্ন হ'য়ে আছে তারা যে, গদির উপর এগিয়ে আসা পায়ের শব্দও শুনতে পেল না। "সুরৈয়া!"—ডাক শুনে দু'জনেই চোখ তুলে তাকাল এবং তারপর উঠে দাঁড়াল। "কাকিমা" ব'লে ডেকে উঠলো সুরৈয়া, আর কমলের মা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে গালের

চুমু দিয়ে দিল। সুরৈয়ার মা বলল—"তোর জন্য লাল মাছ নিয়ে এসেছে কমল—যা পুকুরে ছেড়ে আয়। ততক্ষণ আমি মুন্নীর সংগে খেলছি।"

"মুন্নী বড় হুঁসিয়ার মা, আমাকে দু'বার মাত ক'রে দিয়েছে। ছোট মেয়ে ব'লে ওকে উড়িয়ে দিয়ো না,"—এই ব'লে ওড়না ঠিক করতে করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুরৈয়া।

প্রাসাদের পছনের দিককার বাগানে পুকুরের ধারে কমল দাঁড়িয়ে ছিল। তা'র সামনে নতুন এক মাটির হাঁড়ি প'ড়ে ছিল। কাছে এসে নিজের হাতের মধ্যে কমলের হাত নিয়ে সুরৈয়া বল্‌ল—

"লাল আর হ'লদে মাছ নিয়ে এসেছ কমল ভাই।"

"হ্যাঁ, সোনালী রঙেরও এনেছি।"

"দেখিতো"—ব'লে সুরৈয়া সামনে ঝুঁকে হাঁড়িটা ঝাঁকাতে লাগল!

"এগুলোকে আমি পুকুরে ছেড়ে দিচ্ছি, সেখানে থাকলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। পুকুরের স্বচ্ছ জলের উপরও গুগুলোকে দেখ সুরৈয়া।"

ঠোঁটে এবং চোখে হাসি ফুটিয়ে পুকুরের কাছে এসে দাঁড়াল সুরৈয়া। কমল হাঁড়ি উপুর ক'রে মাছগুলো পুকুরে ঢেলে দিল। পুকুরের স্বচ্ছ জলে তাদের লাল, গোলাপী সোনালী রঙ সত্যই বড় সুন্দর মনে হ'তে লাগল। কমল গম্ভীর স্বরে বোঝাতে লাগল—"এগুলোকে আমি পুকুরে ছেড়ে দিচ্ছি, সেখানে থাকলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। এখনও এগুলো ছোট আছে সুরৈয়া, কিন্তু বড় হ'লেও ছয় আঙুলের চেয়ে ছোটই থেকে যাবে।"

"এখনও কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর কমল।"

"এই দেখ সুরৈয়া—এটার কি রঙ বল তো?"

"গোলাপী।"

"ঠিক যেমন তোমার গাল দুটি।"

"ছোট বেলায়ও তুমি এমনি ক'রেই বলতে ভাই কমল?"

"ছোটবেলায় সুরৈয়াও যে ঠিক এমনিই ছিল।"

"ছেলেবেলায় তোমাকে বেশ মিষ্টিলাগত কমল।"

"আর এখন?"

"এখন খু—উ—ব মিষ্টি।"

"আগের চাইতে বেশী! কেন?"

"কেন জানিনা, যখন থেকে তোমার স্বর বদলাতে লাগ্‌ল, তোমার ঠোঁটের উপর সূক্ষ্ম কালো গোঁফের রেখা দেখা দিতে লাগল, মনে হয় তখন থেকেই আমার প্রেম গভীর হ'য়ে উঠ্‌ল আরও।"

"আর তখন থেকেই কমলকে দূরে দূরে রাখ্‌তে আরম্ভ করলে তুমি!"

"দূরে? দূরে রাখ্‌তে?"

"নয় কেন,—আগে আগে কেমন লাফিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলতে।"

"ওসব নালিশের ফিরিস্তি দিতে ব'সো না কমল, তার চেয়ে নতুন কোন খবর বল।"

"নতুন খবর একটা আছে সুরৈয়া—আমাদের প্রেমের ব্যাপার জানাজানি হ'য়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"আমাদের দু'জনের বাড়ীতে। আলী হজরৎ বাদশাহ্ সলামত পর্য্যন্ত জেনেছেন।"

"বাদশাহ্ সলামত পর্য্যন্ত?"

"ভয় পেলে নাকি সুরৈয়া?"

"না, না, প্রেমের কথা তো কোন না কোনদিন প্রকাশিত হ'য়ে পড়বেই। কিন্তু এখনই কি ক'রে হ'ল?"

"এত কথা তো আমিও জানতাম না, কিন্তু শুনেছি কাকা-কাকিমাই একে প্রথম সমর্থন জানিয়েছে, তারপর বাবা এবং বাদশাহ্ সলামত এবং সকলের শেষে মা।"

"মা?"

"মার সম্বন্ধে সকলের ভয় ছিল। জান তো, বড় প্রাচীনপন্থী স্ত্রীলোক আমার মা?"

"কিন্তু এখনও আমার গালের উপর থেকে কাকিমার চুমুর দাগ মোছেনি!"

"হ্যাঁ, সকলের ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'য়েছে। বাবা যখন তার কাছে বলে, সে তখন অত্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠেছিলো।"

"তা' হলে আমাদের প্রেম সাদর-সমর্থন পেয়েছে?"

"আমাদের আপনজন সবার কাছেই পেয়েছে: কিন্তু বাইরের দুনিয়া একে মানতে রাজী নয়।"

"এই বাইরের দুনিয়ার তুমি পরোয়া কর কমল?"

"একেবারেই নয় সুরৈয়া, পরোয়া করি আমি শুধু ভবিষ্যত দুনিয়ার—যার জন্য এ পথ প্রদর্শন করতে যাচ্ছি আমরা আজ।"

"বৌদিও সব কথা জানে কমল, এখন আমি বেশ বুঝ্‌ছি তা'! রাত্রে ঘরে গিয়েছিলাম, ঠাট্টা ক'রে আমায় বললো সে—'ঠাকুরঝি, আমি যে নন্দাইয়ের আশায়ই ব'সে ছিলাম—আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হ'তে চ'লেছে'—তোমার নাম অবশ্য করেনি সে।"

"এর মানে দাদাই বলেছেন বৌদিকে, আর ওদের দুজনেরও বেশ সমর্থন রয়েছে আমাদের প্রেমে।"

"তা হলে তোমার শ্বশুরকুলের সবাই তোমার অনুকূলেই কমল।"

"আর তুমি আমার মাকে তোমার স্বপক্ষে টেনে নিতে পেরেছ!"

"কাকিমার পূজা-পাঠের কথাই তোমরা শুধু চিন্তা করেছ কমল, কিন্তু যদি জানতে যে আমাকে তিনি কত ভালবাসেন, তবে সম্ভবত তাঁর সম্বন্ধে কোন সন্দেহই পোষণ করতে না।"

"আমরা জানতাম বলেই তাঁর উপর প্রয়োগ করার জন্য তোমাকেই চরম অস্ত্ররূপে ঠিক করে রেখে ছিলেন বাবা। কিন্তু সে অস্ত্র প্রয়োগ করবার আগেই কেল্লাফতে হ'য়ে গেল। এখন তো আমাদের বিয়েই হ'তে চ'লেছে।"

"কোথায়?"

"পণ্ডিতের কাছেও নয়, মোল্লার কাছেও নয়। আমাদের আপন পয়গম্বরের কাছে, যিনি ভারতবর্ষের নতুন ত্রিবেণীর নতুন দুর্গ নির্মাণ করছেন।"

"যিনি খাল, বিল, নদীনালাকে পবিত্র সমুদ্রে পরিণত করতে চান—কবে হ'বে কমল?"

"পরশু, রবিবার সুরৈয়া।"

"পরশু!"

সুরৈয়ার চোখের জল শিশিরবিন্দুর মত টলমল করে উঠ্‌লো। তা' মুছে দিয়ে তা'র চোখে চুমু দিল কমল, ওদের দুজনের কেউই তখন জানতে পারল না যে, আরও চারটি চোখও তাদের মত লুকিয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে।

৪

বসন্তের হাল্কা হাওয়া, সন্ধ্যাবেলা আর অস্তগামী সূর্যকিরণের লাল আভায় অগ্নিবর্ণ সাগর—সব মিলিয়ে কী অপূর্ব এক দৃশ্য! সমুদ্রের বালুবেলায় বসে দুটি তরুণ হৃদয় এই দৃশ্য উপভোগ করছিল। উপভোগের এমনি এক পরম মুহূর্তে পৌঁছে একজন বলল,—"কী সুন্দর এই সমুদ্র, আমাদের ইষ্ট দেবতা!"

"আমরা সকলেই যে সমুদ্রের সন্তান এখন আর তাতে কোন সন্দেহ আছে প্রিয়ে?"

"না গো আমার কমলবরণ কমল, আমরা স্বপ্নেও কখন ভাবিনি যে এমন এক স্বর্গলোককে সমুদ্র আপন গর্ভে লুকিয়ে রেখেছে।"

"পরিপূর্ণ ভাবে না হলেও ভেনিসকে মানুষ স্বর্গে পরিণত করে ফেলেছে, এতেও কোন সন্দেহ নেই।"

"সাধুজী যখন বলে যে, আমাদের দেশের কুলবধূরা এবং কুলকন্যারা পুরুষের মতই অবগুণ্ঠনহীন স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায়, তখন তার কথায় আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আজ দু'বছর হয়ে গেল আমরা এই স্বর্গরাজ্যে বাস করছি, এই ভেনিসের সাথে দিল্লীর তুলনা করো ত প্রিয়!"

"যদি কেউ বলে যে ফ্লোরেন্সের মত সমৃদ্ধ রাজ্য রাজাহীন অবস্থায় টিঁকে থাকতে পারে ত আমরা বিশ্বাস করবোঁ কখনও!"

"আর ভেনিসের মত নগরকে কোনো রাণী কি পরিচালনা করতে পারে!"

"দিল্লীতে কি আমরা এমনি স্বচ্ছন্দে বিহার করতে সক্ষম সুরৈয়া!"

"বোরখা ছাড়া? না প্রিয়তম, পাল্কীর ভিতর আবরু রেখে সেখানে চলাফেরা করতে হয়। আর এখানে——হাত-ধরাধরি করে চললেও কেউ আমাদের দিকে তেমন দৃষ্টি দেয় না।"

"গুজরাটে কিন্তু অনাবৃতমুখী কুলাংগনাদের দেখেছি আমি। শুনেছি দক্ষিণেও পর্দা প্রথা নেই।"

"এ থেকেই বোঝা যায়, ভারত ললনারাও এক সময়ে পর্দামুক্ত ছিল। আমাদের দেশ আবার কখনও কি অমনি হতে পারবে কমল?"

"আমাদের পিতৃপিতামহরা ত তাদের জীবনভোর চেষ্টা করেছেন। এই ছোট দেশ ফ্লোরেন্স, মাত্র তিনদিনেই যাকে অতিক্রম করা যায়, তার দিকে একবার চেয়ে ত্যাখো সুরৈয়া! এখানকার লোকেরা কেমন গর্বের সংগে মাথা উচিয়ে চলে। কারও সামনে মাথা নত করা বা কুর্নিশ করা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 'রাজা' নাম শুনলে তারা থুতু ফেলে, রাজা এদের কাছে এক শয়তান অথবা অগ্নিশ্বাসনিক্ষেপকারী এক নাগ বিশেষ।"

"কিন্তু কমল এসবের মধ্যে সত্যতাওকি নেই কিছু? ফ্লোরেন্সের কৃষকের সাথে তুলনা করো ভারতবর্ষের কৃষকের, এখানে কি সেই নগ্ন-জীর্ণ হাড্ডিসার চেহারা কোথাও দেখা যায়?"

"না প্রিয়ে, আর তার কারণ হলো এই যে এখানে শাহী শান্‌-শৌকতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয় না।"

"ভেনিসেও ত ধনকুবের রয়েছে এবং তারা অনেকেই ত আমাদের কোটিপতিদের হার মানায়।"

"আমাদের কোটিপতিরা এক লাখের উপর এক নিশান উড়ায়। আমি ভাবতাম চৌবাচ্চা ভরা এত টাকা আর মোহর অন্ধকারে পড়ে থেকে কী লাভ হয়? এদের ত চলতে দেওয়া উচিৎ, এক হাত থেকে আর এক হাতে যেতে দেওয়া উচিৎ। এই গতিছাড়াই ত মিঠাইমণ্ডা নিজের নিজের জায়গায় পড়ে শুকোয়, ফল নিজের জায়গায় পড়ে থেকে পচে। কাপড়ের গুদাম পোকায় কাটতে থাকে। অথচ এইসব পুঁতে রেখে আমাদের শেঠেরা তার উপর লাল নিশান উড়ায়। লোকে বলে, এর যখন এক'শ নিশান রয়েছে, তখন এ শেঠ ক্রোড়মল।"

সূর্যের রক্তিম আভা কিছুক্ষণ হলো মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে বিরাজ করছে এখন অন্ধকার ছায়া। সমুদ্রলহরী তটস্থিত পাথরের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে একটানা শব্দ করে চলেছে, তরুণ-তরুণীরা এখনও বালুতট ছেড়ে উঠতে চাইছে না। সমুদ্রকে তারা সত্যিকারের সংগী বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। যদিও তারা শুধু জলপথেই ভ্রমণ করেছে, তবু তারা জানতো যে তাদের সামনে অবস্থিত এই সমুদ্রের একাংশ ভারতের মাটি স্পর্শ

করে আছে। তাই কখনো কখনো তাদের মনে এই প্রশ্ন জেগে উঠ্‌তো, এপারের সংগে ওপারের মিলন ঘটানো যায় না কি!

অনেক রাতে ফিরতি পথ ধরলো তারা। অন্ধকার এই রাত এবং সেই সংগে নিজের অবস্থা উপলব্ধি করে সুরৈয়া বললো,—

"আমাদের বাদ্‌শাহ্‌ নিজরাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, এবং তা'তে বহুলাংশে সফলতাও লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু সেখানে কি এমন নিঃশংক হয়ে বেড়াতে পারি আমরা! কেন পারি না কমল?"

"এখানে সকলের অবস্থাই ভালো। কৃষকের ক্ষেতে আঙুর, গম এবং ফলাদি উৎপন্ন হয়।"

"আমাদের দেশের জমিতেও ত সোনা ফলে?"

"আর সেই সোনা লুটবার লোকও যে আমাদের দেশে অনেক রয়েছে সুরৈয়া!"

"আর একটা জিনিষ দেখছো ত কমল, এখানে কারও বাড়ী গেলে সংগে সংগে কেমন বোতল-গ্লাস এসে হাজির হয় টেবিলের উপর।"

"ভারতবর্ষে কিন্তু আমার বাবার এইজন্যই বদনাম ছিল যে তিনি বাদ্‌শার সংগে বসে পান করে থাকেন।"

"আর আমার ঝিরা আমাকে কী শেখাতো জানো, বলতো রাজপুতানীরা বড় নোংরা হয়, তাদের ঘরে শূয়োর রান্না হয়। এখন আমার মনে হয়, ওখানকার অন্ধরা এখানে এসে বুঝুক যে তুনিয়ায় ছোট-বড় জাত বলে কিছু নেই।"

"পান-ভোজনেও ছুত-ছাতের বালাই নেই এখানকার তুনিয়ায়।"

"ফ্লোরেন্স কিন্তু বেশ একতাবদ্ধ কমল, একদিন হয়ত ভারতবর্ষও এমনি একতাবদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে।"

"সে তখনই হবে যখন আমরা সবাই সমুদ্রকে জয় করতে পারবো।

"সমুদ্র—বিজয়!"

"ভেনিস সাগর-বিজয়িনী নগরী, সুরৈয়া। ভেনিসের এই সুরংগ পথ, এই সু-উচ্চ প্রাসাদসমূহ ওই সমুদ্রবিজয়েরই প্রাসাদ। সমুদ্রবিজয়ে ভেনিস আর একা নয় আজ, বহু প্রতিদ্বন্দ্বী তার রয়েছে। আমার কিন্তু একথা পরিষ্কারই মনে হয় যে পৃথিবীতে এখন সমুদ্রজয়ীদের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার নিজের মনও ঐ সমুদ্রবিজয়ের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি আমি।"

"তুমি কী সব অত বই নিয়ে রাতের পর রাত পড়াশুনো করো প্রিয়তম? বইপত্র পাওয়া কত সহজ এখানে!"

"আমাদের দেশেও সীসা রয়েছে প্রিয়তম, কাগজ এবং সুদক্ষ কারিগরও রয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও ছাপার কাজ শিখিনি। আমাদের দেশে যদি ছাপাখানা খোলা হয়, তবে জ্ঞানার্জন অনেক সুলভ হয়ে উঠ্‌বে। আর এই যে এত সব বই আমি পড়ছি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ নাবিকদের মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি, এর ফলে ক্রমেই স্থিরনিশ্চিত হয়ে

উঠ্‌ছি আমি যে, সমুদ্রবিজয়ী দেশই বিশ্ববিজয়ী দেশরূপে বিরাজ করবে। স্নান ইত্যাদি না করার জন্য এই সব ফিরিংগীদের আমাদের দেশের লোকেরা নোংরা বলে থাকে, কিন্তু এদের অনুসন্ধিৎসার প্রতি প্রশংসাবান না হয়ে থাকতে পারে না আমার অন্তর। এরা ভূগোলের গল্প রচনা করে না বসে, সকল জায়গায় ঘুরে সম্যক্‌ জ্ঞানার্জন করে। এদের তৈরী মানচিত্র ত আমি তোমাকে দেখিয়েছি সুরৈয়া।"

"সমুদ্র আমার বড় ভালো লাগে কমল!"

"শুধু ভালোলাগা নয় সুরৈয়া সমুদ্রের উপরই দেশের প্রাণ নির্ভর করছে। এই কাঠের জাহাজের উপর রক্ষিত কামানটিকে দেখছো ত? এইসব জাহাজ হলো এক একটা ভাসমান দুর্গ। মংগোলীয়রা তাদের জয়যাত্রার জন্য ঘোড়া এবং বারুদের কাছে সম্পূর্ণ ঋণী। পৃথিবীতে যাদের কাছেই এখন এইসব যুদ্ধজাহাজ থাকবে তারাই জয়ী হবে। এই জন্যই আমি এ বিদ্যা অর্জন করতে মনস্থ করেছি সুরৈয়া।"

কমল এবং সুরৈয়ার সাধ পূর্ণ হতে পারলো না। ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেছিলো তারা, কিন্তু সে যুগ ছিল জলদস্যুদের যুগ। সুরাটে পৌছুবার পথে জলদস্যুরা তাদের জাহাজ আক্রমণ করলো। সংগীদের নিয়ে কমল তার বন্দুক এবং কামান চালিয়ে যেতে লাগলো দস্যুদের উপর। কিন্তু দস্যুরা ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত প্রবল। কমলের জাহাজ তাই গোলাবিদ্ধ হয়ে জলে ডুবে যেতে লাগলো। সুরৈয়া তার কাছেই ছিল, তার ঠোঁটে মৃদুহাসি ফুটে উঠলো, মুখ থেকে শেষ কথা বেরুলো তার—সমুদ্র-বিজয়!"

রেখা ভগৎ

কাল—১৮০০ খৃষ্টাব্দ

১

কার্তিকের পূর্ণিমা। এই সময় গণ্ডক (নারায়ণী)—স্নান এবং হরিহর দর্শনের ভিড়। দূর-দূরান্তর থেকে গ্রাম্য নরনারীরা বহুযত্ন-সঞ্চিত অর্থ এবং ছাতু-চাল নিয়ে হরিহর ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেচে। বাগানের মধ্যে কিছু বলদ-ঘোড়া আর হাতী বাঁধা দেখে কে ভাবতে পেরেছিলো যে এটাই ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মেলায় পরিণত হবে!—

একখানা মোটাকাপড়ের গামছায় করে কাঁচালঙ্কা আর মূলো সহযোগে লবন-মাখ ছাতু পরমতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে রেখাভগৎ আর তার চার সঙ্গী এক আমগাছের নীচে কম্বলের উপর বসেছিলো। রেখার মহিষ বিক্রয় হয়ে গেছে, আর এখনও সে থেকে থেকে ট্যাঁকে হাত দিয়ে বিক্রির কুড়িটা টাকা দেখে নিচ্ছে। একথা সকলেই জানতো যে এই মেলায় এমন সব চোর এসেছে যারা যাদুমন্ত্রে টাকা মেরে নেয়। রেখা আর একবার ট্যাঁকের উপর হাত বুলিয়ে নিলো তারপর পরম নিশ্চিন্তির সঙ্গে কথা আরম্ভ করলো,—"আমাদের তো মোষ বিক্রি হয়ে গেল, তিনমাস ধরে খুব খাইয়ে দাইয়ে আমি ওকে তৈরী করেছিলাম মৌলুভাই। ওরকম মোষের জন্য বিশটাকা দাম কম নয়। কিন্তু টাকাও আজকাল দেখতে দেখতে উড়ে যায়।"

মৌলা—"উড়েতো যায়। এ ছাড়া টাকাপয়সার আজকাল অভাবও পড়ে গেছে চারিদিকে। এই কোম্পানীর রাজত্বে কোন কিছুরই সুরাহা নেই। আমরা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মরে যাই, অথচ আমাদের ছেলেপুলেদের পেট-ভরা খাওয়া জোটেনা একসন্ধ্যাও।"

রেখা—"এতদিন পর্য্যন্ত আমরা হাকিমকে নজর-বেগার এবং আমলা-পাইককে ঘুষ দেওয়ারি ভিতর দিয়েই দিন কাটিয়েছি, কিন্তু তা হলেও জমি তো আমাদেরই ছিলো।"

মৌলা—"সাত-পুরুষ থেকে জংগল কেটে জমি আবাদ করেছি আমরা।"

সোবরণ—"মৌলুভাই, বাঘা ক্ষেতের কথা জানো তো? ওখানে ভয়ানক জংগল ছিলো। আমাদর মুরিস্‌.জনাবন বাবাকে ওখান থেকেই বাঘে ধরে নিয়ে যায়—সেই থেকেই ওই জায়গার নাম 'বাঘাক্ষেত' হয়েছে। প্রাণ দিয়ে আমরা সেই জমি আবাদ করেছি।"

রেখা এই সময় ভোলা পণ্ডিতের দিকে তাকালো, কালোদেহ ভোলাপণ্ডিত পাতলা শাদা কাপড়ের পাগড়ী ঠিক করছিলো। রেখা বললো,—

"ভোলাপণ্ডিত, তুমি তো সত্যযুগের কথা পর্য্যন্ত জানো, বলতে পারো, এমন দুর্দশায় কোনদিন পড়েছে প্রজারা ?"

মৌলা—"জমি আমরা তৈরী করেছি। চাষ করা, বীজবোনা সব কাজে আমরা খেটেছি। অথচ আমাদের গ্রামের মালিক আমরা নই, রামপুরের মুন্সীজী।"

ভোলাপণ্ডিত—"অধর্ম! রেখা-ভগৎ অধর্ম। রাবণ এবং কংশের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে কোম্পানী। পুরাণ ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে রাজা পাবে কৃষকের কাছ থেকে এক দশমাংশ ফসল।"

মৌলা—"আর আমি তো অবাক হয়ে যাই পণ্ডিত! কোথাকার কে রামপুরের মুন্সী! তাকে আমাদের মালিক আর জমিদার বানিয়ে দিয়েছে কেন ?"

ভোলাপণ্ডিত—"সবই উলটে গেছে মৌলু, প্রথমে প্রজাদের উপর একজন রাজা ছিলো। কৃষকেরা শুধু একজন রাজাকেই জানতো। রাজা বহুদূরে আপন রাজধানীতে থাকতো। শুধু ফসলের এক দশমাংশ পেলেই সে খুশী থাক্‌তো, তাও যখন ফসল হতো তখন, কিন্তু এখন ফসল হোক আর না হোক, নিজের হাড়মাংস বেচে, মেয়ে-বোনকে বেচে জমিদারের খাজনা দিতেই হবে।"

রেখা—"আর এই খাজনার কোনও হদিস্ পাওয়া যায় না পণ্ডিত। বছর বছর খাজনা বেড়েই চলেছে। একথা জিজ্ঞেস করারও কেউ নেই যে এমন অন্যায় আদায় কেন হবে।"

মুন্সী সদাসুখলাল পাটোয়ারী এসেছিলো হরিহর ক্ষেত্রে স্নান করতে, আর সস্তা পেলে একটা গরু কিনতে। কিন্তু এবছরের দুর্মূল্যতা দেখে কাঁপুনি ধরে গেল তার। তার গায়ে ময়লা ছেঁড়া এক ফতুয়া এবং মাথায় টুপি। কানে এখনও খাগের কলম দেখে মনে হয়, এখানেও বুঝি হিসাব লিখতে হবে তাকে। মসরখের জমিদারের পাটোয়ারী বলে সে ভাবছিলো যে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা উচিৎ কি না। কিন্তু আলোচনা যখন গ্রাম্য রাজনীতি নিয়ে তখন মুখ-কান-ওয়ালা মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকা মুস্কিল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত দয়ালপুর তার মালিকের জমিদারীতে নয়। কাজেই দয়ালপুরের কৃষকের কথাবার্তায় অংশ গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি আছে বলে সে মনে করলো না। কলমটাকে আঙুলের সাহায্যে ঘোরাতে ঘোরাতে মুন্সীজী বলল,—

"কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে কিনা? সেই কথা বলছো পণ্ডিত? কে জিজ্ঞেস করবে? এখানে তো সবাই লুট করে খায় পরের ধন। যত পার লুটে খাও। কোন রাজা নেই। নাজিম সাহেবের দরবারে আমার মাসতুত বোনের এক জামাই থাকে, অনেক গোপন তথ্যই সে জানে। কোন রাজা নেই, একশ-দুশ ফিরিংগিডাকাত দল বেঁধে জেঁকে বসেছে। এই দলকেই তারা বলছে কোম্পানী।"

রেখা—"ঠিক বলেছ মুন্সীজী, 'কোম্পানী বাহাদুর' 'কোম্পানী বাহাদুর' শুনে শুনে আমরা ভেবেছিলাম, কোম্পানী কোন রাজা হবে বুঝি, কিন্তু আসল কথাটি আজ বুঝলাম।"

মৌলা—"সেইজন্যই তো, যেদিকে তাকাও সেইদিকেই দেখবে লুট চলছে। ন্যায়-অন্যায়ের খোঁজ-খবর করবার কি কেউ আছে? এই রামপুরের মুন্সীজীর সাতপুরুষের কারো কখনও দয়ালপুরের সংগেকোনও সম্পর্ক ছিলো?"

সোবরণ—"আমার তো মৌলুভাই, মাথায়ই ঢোকে না যে, এই রামপুরের মুন্সী আমাদের গাঁয়ের মালিক হয়ে গেল কি ক'রে। দিল্লীর বাদশাহের সংগে কোম্পানী যুদ্ধ করেছে—"

মুন্সী—"দিল্লী নয়, সোবরণ রাউৎ মুকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদের) নবাবের কাছ থেকে এই অঞ্চল কোম্পানী লিখিয়ে নিয়েছে। দিল্লীর তখ্‌ৎ থেকে আমাদের এই অঞ্চলকে মুকসুদাবাদ ছিনিয়ে নিয়েছিলো, সোবরণ রাউৎ।"

সোবরণ—"আমাদের এত কথা মনে থাকে না মুন্সীজী, আমরা তো শুধু দিল্লীর কথাই জানতাম। আচ্ছা, মুকসুদাবাদের হাতেও যখন রাজ্য এলো, তখনও তো একই রাজা ছিলো না? আমাদের যেমন জুটতো তেমনই খাজনা দিতাম। কিন্তু এখন একে দুই রাজ্য বলবে, না কি বলবে?"

রেখা—"দুই রাজ্যই হয়েছে সোবরণ ভাই,—এক কোম্পানীর রাজ আর দ্বিতীয় রামপুরের মুন্সীজীর রাজ। যাঁতার এক পাল্লায় পিষলে বাঁচার আশা তবুও কিছুটা থাকে, কিন্তু দুপাটে পড়লে পরে বাঁচা একেবারেই অসম্ভব। আর এব্যাপার তো আমরা নিজে-দের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মুন্সীজী তুমিই বলো! আমরা তো গেঁয়ো, মূর্খ, আনাড়ী, তুমি এবং ভোলাপণ্ডিতই আমাদের মধ্যে জ্ঞানী।"

মুন্সী—"রেখাভগৎ বলছো তুমি ঠিকই। জমিদার হল যাঁতার একটা পাল্লা। আর সে রাজার চেয়ে কোন্ বিষয়েই বা কম?"

রেখা—"কম কেন, বরং এক-কাঠি বেশী মুন্সীজী। গাঁয়ের পঞ্চায়েতের পরামর্শ কেউ নেয় এখন? রেওয়াজ আছে, আমরা পাঁচজন মোড়ল ঠিক করে দিই, কিন্তু কোন্ কাজে হাত দিতে পারে তারা? সবই জমিদার আর তার আমলা গোমস্তারা করে। গাঁয়ের ভিতর ঝগড়া বাধলে বাদী-বিবাদী দুজনের কাছ থেকেই জরিমানা নেয় তারা। পনেরো বছরও ত কাটেনি সোবরণ রাউৎ, মেয়ে-মরদের ঝগড়ায় কখনও মোষ বিক্রি হতে দেখেছ?"

সোবরণ—"আর ভাই তখন ত সব কিছুই পঞ্চায়েতের হাতে ছিল। গাঁয়ের মোড়ল কোন পরিবারকে উচ্ছন্নে যেতে দিত না, খুনের মামলা পর্য্যন্ত আপোষে মিটমাট করে দিত তারা। আর বাঁধ আর খালগুলোর অবস্থা দেখনি? মনে হয়, ওগুলোকে দেখবার বা ওগুলোর ভার নেবার এখন আর কেউ নেই। পঞ্চায়েত যদি এখনও সক্রিয় থাকত তা হলে কি কোনমতেই এমন হতে পারত?"

রেখা—"কোনমতেই হ'তো না সোবরন রাউৎ। নিজের ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন তুলে দেয় কে? বৃষ্টি বেশী হলে এমন পরিষ্কার নালা নেই, যা' দিয়ে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে। বৃষ্টি কম হ'লে, এমন বাঁধ নেই যে, জল ধ'রে রাখা যায়—যাতে ফসল শুকিয়ে যেতে না পারে।"

মুন্সী—"পঞ্চায়েতকে ধ্বংস করে কোম্পানী এই কাজ তুলে দিয়েছে জমিদারের হাতে।"

রেখা—"আর জমিদারেরা যে কি করছে' সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি!"

মুন্সী—"আমিও জমিদারের নিমক খাই রেখাভগৎ তুমি জানো, মসরখের জমিদারের পাটোয়ারী আমি। কিন্তু এ অন্যায়ের সম্পত্তি অন্যায়ের ধন যে খায়, সে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। আমাকে দেখো—সাত ছেলে ছিলো আমার,—ঘোড়ার মত যোয়ান,—সব ম'রে গেল—" মুন্সীজীর চোখে জল দেখে সকলেরই হৃদয় সহানুভূতিতে ভ'রে উঠলো। "সব ম'রে গেল রেখাভগৎ, ঘরে এখন জল দেবার জন্য একটা বাচ্চা মেয়েও নেই। আর আমার মালিককে তো জানোই, ছাপরার সেই রাণ্ডীর পিছনে কি ভাবে ঘুরছে? তার ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়েছে, রেখা ভগৎ।—এই যে দুটো বাচ্চাকে দেখছো—এদের লোকে তার সন্তান বলে জানে৷ কিন্তু আসলে এরা নাপিতের ঔরসজাত।"

রেখা—"মালিকদের মধ্যে এরকম ঘটনা এখন অনেকেরই হচ্ছে।"

সোবরন—"ক্ষেত গেল, গ্রাম গেল, সাত-সমুদ্র পারের দস্যুরা আমাদের ওপর ঘরের ডাকাত লেলিয়ে দিল। পঞ্চায়েত গেল, যে সামান্য ফসল আমরা ফলাই তাও নিয়ে নেওয়া হয়। আর যদি কখনও ঠিকমত রোদ-বৃষ্টি হলো, সামান্য ফসল ঘরে উঠলো, তো মালিক-জমিদার, চৌকিদার পাটোয়ারী গোমস্তার পেট ভরাতেই খতম হ'য়ে যায় তা'।"

মুন্সী—"পাটোয়ারীদের লুটের কথা আমি জানি সোরবন রাউৎ, কিন্তু এওতো তোমরা জান নিশ্চয় যে জমিদার মাত্র আট আনা মাইনে দেয় পাটোয়ারীদের মাসে, আট আনা পয়সায় জিভও ভেজানো যায় না,—একথা কি জমিদার জানে না?"

রেখা—"জানে মুন্সীজী, জমিদার অন্ধ নয়, সবই দেখতে পায়। রাজা কোম্পানী বাহাদুর ডাকাতই বটে,—আমাদের ওপর জমিদারকে এক নতুন ডাকাত ক'রে বসিয়ে দিয়ে গেছে। এততেও আমরা বেঁচে আছি কি করে?"

সোবরন—"বেঁচে কোথায় আছি রেখা? পেটভরে ভাত খেতে পারে বা দেহে একটুকরো কাপড় জড়াতে পারে এমন লোক এখন কি একটাও দেখা যায় দয়ালপুরে?"

মুন্সী—"কোম্পানীর তাতে কি এসে যায় সোবরন রাউৎ? সে তো খাজনা বেঁধে দিয়েই খালাস, জমা দেওয়ার দিন ছাপরা গিয়ে জমিদারেরা টাকার তোড়া জমা দিয়ে আসে। দয়ালপুরের কৃষক মরুক আর বাঁচুক, কোম্পানীর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে দেওয়া হয়। আর পুরো খাজনা না দিলে মেরে কৃষকের হাড্ডি গুঁড়ো করে দেবে জমিদার—তোমার কাছ থেকে জমিদার পাঁচ টাকা নেবে এক টাকা কোম্পানীকে দিয়ে বাকী চার টাকা নিজের পেটে দেবে, সোবরন রাউৎ।"

রেখা—"হাঁ ভগবান! তুমি কি ঘুমিয়ে আছো, না মরে গেছ? কেন তুমি সুবিচার করছো না? আমরা যে ধ্বংস হয়ে গেলাম!"

সোবরন রাউৎ—"হ্যা, শেষ হয়েই গেলাম রেখা, শোনোনি বারো-পরগণার লোকেরা একজোট হয়ে জমিদারকে তাদের মালিক বলে মানতে অস্বীকার করেছে? তারা

ছাপরা গিয়ে কোম্পানীকে বলেছে—'আমাদের পঞ্চায়েত তোমাদের খাজনা মিটিয়ে দেবে, আমরা জমিদারকে মানবো না।' সাহেব কি জবাব দিয়েছে জানো? 'অনাবৃষ্টি আর বানের সময়েও খাজনা দেবে?'"

"অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা প্লাবনের সময় নিজেদের কাচ্চা বাচ্চার প্রাণ বাঁচানই মুস্কিল—তা কি তারা জানে না ওই ফিরিংগীর কথাটা বলতে ভগবানের ভয়ও হল না। রেখা; এর পর সে কি বল্‌ছিল, জান? তোমরা ত কাঙাল, খাজনা যদি না দাও ত কোম্পানী বাহাদুর কি নেবে তোমাদের কাছ্ থেকে? আমরা টাকাওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোককে জমিদার করে দিই; যাতে আমাদের খাজনা বাকী রাখলে তাদের ঘরবাড়ি নিলাম হয়ে যাবার, মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয় থাকে।"

রেখা—"এই জন্যই তো এই ফিরিংগীগুলোর সারা গায়ে শ্বেতী। বড় নির্দয় এরা।"

সোবরন—"বারো-পরগণাবাসীদের কোন কিছুই নেই, কাজেই ওরা জীবনের সাথেই লড়াই করে। কোম্পানী যদি বাহাদুরই হতো তবে বাহাদুরের মত লড়াই করতো লড়নেয়ালা লোকের সংগে লড়তো। বারো-পরগণাবাসীদের কাছে বন্দুক আছে আর কোম্পানীর লোকেদের কাছে অ'ছে কামান। আর এখান থেকে সেখান থেকে কালো-গোরা বহু পল্টনও এ'স গেছে তাদের। গ্রামের পর গ্রাম এরা জ্বালিয়ে দিয়েছে, নারী এবং শিশুদেরও ছাড়েনি। বারোপরগণার লোকদের ক'রবার কি আছে?"

মৌলা—"চাষবাস তো এই ভাবেই নষ্ট হয়ে গেল, তাঁতীদের মুখের অন্নও ঘুচতে আরম্ভ করেছে সোবরন রাউৎ। কোম্পানী বাহাদুর এখন বিলাত থেকে নিজেদের কাপড় এনে বেচছে।"

মুন্সী—"হাঁ, কলের তৈরী সুতো, কলের তৈরী কাপড়। দ্যাখোনা, আমার এই ফতুয়া ওই কাপড়েই তৈরী সোবরন রাউৎ। তাঁতের কাপড় এত সস্তা পাওয়া যায় না। কাজেই মান বাঁচাবার জন্য এই কিনতে হয়। এটা মান বাঁচাবারই প্রশ্ন রেখা-ভগৎ। তুমি অমন হাস্‌ছো কেন রেখা?—সরকারী জাজিমের উপর বসতে হলে তখন বুঝবে।"

রেখা—"তোমার সম্মানের কথায় হাসিনি মুন্সীজী, হাসছি এই জন্য যে, কোম্পানী বাহাদুর রাজত্বও করছে আবার ব্যবসাও চালাচ্ছে। এমনি রাজত্ব!"

ভোলা পণ্ডিত—"সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর—তিন যুগ পার হয়ে গেছে। কলিযুগেরও পাঁচহাজার বছর কেটে গেছে। এই এত সময়ের মধ্যে এমন রাজত্ব কখনও ছিল ব'লে তো শুনি নি!"

মুন্সী—"নাজিমের দরবারে এক মুন্সী কোম্পানীকে ফিরিংগী ডাকাত আখ্যা দিয়েছে, ভোলা পণ্ডিত! আর একজন বলেছে যে, কোম্পানী হলো ফিরিংগী ব্যবসাদারদের আড্ডা। ওরা শুধু ব্যবসার জন্যই নিজেদের দেশ থেকে এসেছে। প্রথমে এখানকার মাল ওখানে নিয়ে বেচতো, কিন্তু এখন এরা বিলাতে বড় বড় কারখানা খুলেছে—তা'থেকে নিজেরাই মাল তৈরী করায় আর নিজেরাই তা' বিক্রি করে।"

মৌলা—"তা' হ'লে বোঝা যাচ্ছে, কারিগরদেরও আর উন্নতির আশা নেই।"

শীতের গঙ্গা সবুজ আকার ধারণ করে এবং তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যময় গতি আরও গম্ভীর রূপ ধারণ করে। এই সময় নৌকাডুবির ভয় অত্যন্ত কম থাকে। এই জন্য ব্যাপারীরা এই সময়টাকে ব্যবসায়ের মৌসুম ব'লে মনে করে। এই সময় গঙ্গার পারে ঘণ্টা চারেক বসে থাকলেই দেখা যাবে—শত শত বড় বড় সব নৌকা সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই কোম্পানীর মালে বোঝাই থাকে—তার মধ্যে বহু মালই আসে বিলাত থেকে এবং সেগুলো উপরের দিকে যায়। আর যদি পাটনা, গাজীপুর, মির্জাপুরের মত তেজারতী শহরের ঘাট থেকে দেখ ত দেখবে, গংগার চারিধাব বড় বড় নৌকায় ঢাকা আছে।

পাটনা থেকে এক বজরা (বড় নৌকা) নিচের দিকে যাচ্ছিল। এতে করে সোরা, জাজিম ইত্যাদি বহু জিনিষ-পত্র বিলাত যাচ্ছিল। এরই একটা নৌকায় যাচ্ছিল বাঙ্গালীর সন্তান তিনকড়ি দে আর বিলাতি সাহেব কোলম্যান। পাটনা থেকে কলকাতা যেতে এক সপ্তাহের বেশী সময় লাগে, সুতরাং তিনকড়ি দে আর কোলম্যানেব ভিতর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। যদিও প্রথমে একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে সংকুচিত হয়ে উঠত। তিনকড়ি দে'র কাছে নকল জুলফী, আঁটোসাঁটো প্যাণ্ট, ফিতায় ঝোলান বোতাম এবং কালো কোট পরিহিত শ্বেতমুখ ভয় এবং ভক্তির বস্তু ছিল। কিন্তু কোলম্যানই কথারম্ভ করেছিল—এ জন্য ধীরে ধীরে তিনকড়ির সাহস বেড়ে উঠছিল। আলাপ-আলোচনায় তিনকড়ি বুঝতে পারল যে, কোলম্যান কোম্পানীর সাহেবদের ঘোরতব বিরুদ্ধে এবং গভর্ণর থেকে আরম্ভ করে কোম্পানীর ছোট বড এজেণ্ট পর্যন্ত কাউকেই গালাগালি দিতে দ্বিধা বোধ করে না। তিনকড়িও কোম্পানীর চাকরদের বরদাস্ত করতে পারত না। বিশ বছর পর্যন্ত কোম্পানীর বড় বড় দপ্তরে কেরানীর কাজ করেছে সে। গরীবের ঘরেই সে জন্মেছে, কিন্তু সে ছিল তাদেরই একজন যাদের আশা সীমাবদ্ধ এবং লোভ যাদের আত্মসম্মানের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। সারাজীবন ধরে খাওয়া-পরার মত রোজগার ক'রে নিয়েছিল তিনকড়ি। কোনো পুরণো এজেণ্টের দয়ায় লুটের সময় সে চব্বিশ পরগণা জেলায় চারখানা গ্রামের জমিদারী পেয়েছিল, যাব আয়ের তুলনায় খাজনা অনেক কম ছিল। সাহেবের দয়াতেই হয়েছিল এটা। কিন্তু এই দয়াটুকু পাবার জন্য এমন কাজ তিনকড়ি করেছিল, যার পাপ জন্ম-জন্মান্তরেও মোচন হবে না বলে তার বিশ্বাস। সাহেবকে খুশী করবার জন্য গ্রামের এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ তরুণীকে সে সঁপে দিয়েছিল তার হাতে। সাহেবেরা সে সময় খুব কমই নিজেদের মেম সংগে করে আনত। কারণ ছ' মাসের বিপদ ঘাড়ে করে সমুদ্র-যাত্রা করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনকড়ির বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। তার সুঠাম কালো দেহের কাঠামো খুবই বলিষ্ঠ

ছিল। কিন্তু রোজই সকালে উঠে সে আয়নায় নিজের মুখ দেখত আর হাতের আঙুলগুলো পরীক্ষা করত, কোন্ দিন তার দেহে কুষ্ঠ রোগ ফুটে বেরুবে—সেই আশংকায় সে থাকত, কারণ তার বিচারে ব্রাহ্মণীর সতীত্বনাশের এই শাস্তি তার কপালেও আছে বলে তার মনে হতো। সাহেবদের খিটিমিটি, গালাগালি আর পায়ের ঠোকর সয়ে সয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। তাই চাকরীর বয়স থাকলেও এখন বাড়ীর সব মরে যাওয়াতে কাজে ইস্তফা দিয়ে সে গ্রামে ফিরে আসছিল। বিশ বৎসরের নীরবে সহ্য করা অপমানের আগুনে তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল। যখন সে কোলম্যানকে নিজের চাইতেও কোম্পানীর বড় শত্রু বলে বুঝতে পারল, তখন ধীরে ধীরে দু'জনে আলাপ করতে লাগল। কোলম্যান একদিন বলছিল—

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৈরী করা হয়েছিল বাণিজ্যের জন্য, কিন্তু পরে এরা লোককে লুট করতে সুরু করে। দেখছ না, যত সাহেব এখানে আসে, সবাই দু'দিনের ভিতর লাখপতি হয়ে দেশে ফিরে যেতে চায়। ছোটবেড সবারই এই একই অবস্থা। ক্লাইভই এমন করেছে, কিন্তু তাকে কেউই ধরেনি। চেতসিংহের রাণীরা অনাহারে মরে যাওয়া সত্ত্বেও লোভের তাড়নায় ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাদের কথা ভাববার অবকাশই পায়নি আর অযোধ্যার বেগমদের কাঙাল বানিয়ে ছেড়েছে সে। কিন্তু আমাদের দেশবাসীরা তাকে ছাড়েনি। শাস্তির হাত থেকে সে বেঁচে গেছে, কিন্তু যা কিছু সে রোজগার করেছিল, কয়েক বছরের মামলায় সবই সে খুইয়েছে।"

"মোকদ্দমা কে চালালো সাহেব?"

"পার্লিয়ামেণ্ট। আমাদের দেশে রাজা নিজের খুশীমত চলতে পারে না। খুশীমত চলার অপরাধে এক রাজার গর্দ্দান আমার কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলেছি আর সে কুড়াল এখনও রক্ষিত রয়েছে। পার্লিয়ামেণ্ট হ'ল পঞ্চায়েত, বুঝলে দে! এদের অধিকাংশ সদস্যকেই দেশের ধনীমানীরা নির্বাচিত করে, আর কিছু বড় বড় জমিদার বংশগত অধিকারের বলে এর সদস্য হয়।"

"জমিদারী প্রথা কতদিন থেকে চলে আসছে?"

"আমাদের দেশের দেখাদেখি ভারতবর্ষে জমিদারী কায়েম হয়েছে দে! আমাদের দেশে এ-প্রথা কায়েম, কয়েক শ' বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু সেখানেও জমির উপর থেকে কৃষকের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জমিদারী-প্রথা কায়েম করেছে যে গভর্ণর, তার নাম জানো?"

"হ্যাঁ, কর্ণওয়ালিশ।"

"হ্যাঁ, বিলাতের পয়লা নম্বরের কষাই-জমিদার সে। এখানে এসে সে দেখল, যতদিন কৃষকেরা জমির মালিক থাকবে ততদিন অনাবৃষ্টি ও প্লাবনের সময় ঠিকমত খাজনা আদায় হবে না। সে এ কথাও ভাবল যে, সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশ থেকে আগত ইংরাজদের এ দেশে কিছু লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে—আর তা হবে এমন সব লোকের সাথে, যাদের স্বার্থ ইংরাজদের স্বার্থের সংগে একক্ষুরে বাঁধা। জমিদার হ'ল

ইংরাজদের সৃষ্টি। কৃষক বিদ্রোহে ইংরাজদের যেমন বিপদ, তেমনি জমিদারেরও বিপদ জমিদারী, তার সম্পত্তি এবং সম্ভ্রম যাওয়ারও সমূহ আশংকা। এই জন্য, ছোট ছোট কৃষককে মালিক বলে স্বীকার না করে যদি পঁচিশ-পঞ্চাশ গ্রামের বড় বড় এক মালিক—জমিদার সৃষ্টি করা যায়, তবে তারা সুসময়-দুঃসময় সর্বদাই কাজে আসবে। এই ভাবে বিলাতের এই কসাই জমিদার ভারতবর্ষের কৃষকদের গলা কেটে রেখেছে।"

"কেটে যে রেখেছে, তাতে সন্দেহ নেই—" নিজের জমিদারীর কৃষকদের কথা মনে পড়ল তিনকড়ির।

"জায়গীরদারের জুলুমে সারা দুনিয়ার লোকই মরছে; তবে এদেরও দিন ফুরিয়ে এসেছে!"

"কেমন করে সাহেব?"

"ফ্রান্সের রাজা-রাণীকে কয়েক বছর আগেই প্রজারা মেরে ফেলেছে। তাদের ক্রোধাগ্নিতে বহু জায়গীরদার জমিদার পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার লোকেরা সকল মানুষের জন্য সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে সময় আমি ফ্রান্সে ছিলাম যে। ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদের উপর ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের তেরঙা ঝাণ্ডা আমি নিজের চোখে উড়তে দেখেছি। ইংলণ্ডের রাজা, জমিদার, জায়গীরদার আজকাল কাঁপছে থর থর করে। ইংলণ্ডেও ফ্রান্সের মতই হ'তো, কিন্তু একটা ব্যাপার তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমার বড় আফ্‌শোস রয়ে গেছে হে।"

"কি ব্যাপার সাহেব?"

"দেখ্‌ছ না, বিলিতি কারখানাজাত মালে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে গেছে? তোমাদের এখানে তাঁতীরা বেকার হয়ে পড়ছে আর আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কারখানা খুলে তাতে জমিদারের অত্যাচারে খেতে না পাওয়া লোকদের কাজ দিয়েছে। তাদের তৈরী মাল এখানে পৌঁছাচ্ছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশেও হাত দিয়েই কল চালানো হ'তো, কিন্তু এখন ষ্টীম-ইঞ্জিন তৈরী করা হচ্ছে,—এদের দ্বারা চালিত তাঁতের কাপড় আরও সস্তায় পাওয়া যায়। তোমাদের দেশের কারিগরেরা ধ্বংস হয়ে গেল, একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল। তবে এখন এই সব কারখানায় মজুরী করে পেট চালাবার মত কাজ তারা পেতে পারে। যদি এই কারখানাগুলো খোলা না হতো, তবে আমাদের দেশেও ফ্রান্সের দশাই হতো। মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে হবে দে। অপরকে যে পশু বলে মনে করে, নিজেকেই তার ছেলেপিলে সহ পশু হতে হয়।"

"ঠিক বলেছ্ সাহেব। আমি নিজের কর্মচারী এবং চাকরদের মানুষ ব'লেই মনে করতাম না। কিন্তু অমনি ব্যবহার যখন সাহেবেরা করতে লাগল আমার সংগে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, মানুষের অপমান করা কত বড় পশুর কাজ।"

"দাস প্রথা তুলে দেবার জন্য বিলাতে প্রবল চেষ্টা করা হচ্ছে।"

"বিলাতেও দাসপ্রথা চল্‌তে দেওয়া হয় ?"

"সারা দুনিয়াতেই হতভাগ্য নরনারীদের নিয়ে কেনা-বেচা চলছে। কিন্তু আমি আশা করি, শীগগিরই এর বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়ে যাবে।"

"তা হ'লে দাসেদের মালিক ধনীরা কি করবে ?"

"ধনীরা ত এ চায়ই না, আর আমাদের পার্লামেণ্টে ত ধনীদেরই প্রভুত্ব, কিন্তু এখন তাদের মধ্যেই কিছু কিছু লোক একে খারাপ বলে মনে করছে—যাই হোক না কেন, মানুষ নিয়ে কেনা-বেচা অত্যন্ত খারাপ কাজ, হে! তুমি নিজেই ত তা বুঝতে পার। কিন্তু যারা এর পক্ষপাতী নয় তারাও পাপ-পুণ্যের বিচারেই যে একে উঠিয়ে দিতে চায় তা নয়। তারা সম্পূর্ণ অন্য কারণে চায় না। আজকাল অনেক কারখানায় দাসেরা কাজ করছে, তারা যে সব লোহার কলে খাটছে, তার দাম অনেক, অথচ তারা সে দামের জন্য গ্রাহ্যই করে না কিছু। দেখছ না সূক্ষ্ম কাজের ভার দাসদের দেওয়া হয় না! যার জীবন-মরণ নিয়ে তুমি রাতদিন খেলা করছ, সে ত সুযোগ পেলেই তোমার ভয়ানক ক্ষতি করে প্রতিশোধ নিতে চাইবেই।"

"মা আর তার শিশুকে আলাদা করে বেচাব মত যখন আমি এক দাসীকে তার নিজের সন্তানকে বেচতে দেখি, তখন আমাব কাছে তা নিতান্তই অসহ্য মনে হয়।"

"অসহ্য যার মনে না হয়, সে মানুষই নয়, হে।"

"আমি ভাবছিলাম ফ্রান্সের রাজাহীন রাজ্যের কথা। তাকে যেন কি বলে সাহেব ?"

"প্রজাতন্ত্র।"

"প্রজাতন্ত্র কি রাজতন্ত্রের চেয়ে ভাল ?"

"প্রজাতন্ত্র সব চেয়ে ভাল রাজ্য, দে! শাহ্, শাহজাদ, বেগম আর শাহজাদীদের কল্যাণেই দেশের সম্পদের অধিকাংশ নিঃশেষ হয়ে যায়! পঞ্চায়েতী রাজ্যের সরকারের কাছ থেকে অধিক ন্যায়, অধিক নিরপেক্ষতা এবং সহানুভূতি পাওয়া যাবে।"

"হ্যাঁ, আমি আগে আমার নিজের গ্রামের পঞ্চায়েতের কাজ দেখতাম, ওতে সত্যিই বেশী ন্যায়নিষ্ঠা দেখা যেত। আর ব্যয়ের বাহুল্যে কেউই ধ্বংস হয়ে যেত না। কিন্তু যখন থেকে কর্ণওয়ালিশের জমিদারেরা এসে পঞ্চায়েতকে ডুবিয়ে দিল, তখন থেকে লোকে শেষ হ'য়ে যেতে লাগল।"

"একথা ঠিকই দে, কিন্তু ফ্রান্সের জনতার উদ্দেশ্য প্রজাতন্ত্রের চেয়েও মহৎ ছিল, তারা মানুষমাত্রেরই সাম্য, স্বাধীনতা এবং মৈত্রী এই মূল ভিত্তির ওপর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।"

"আমাদের দেশের জন্যও ?"

"তোমরা কি মানুষ নও ?"

"সাহেবদের চোখে ত আমরা সত্যিই মানুষ নই।"

"যতদিন পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়ার শাদা-কালো-মনুষ্য সমস্ত জাতির মধ্যে শাসন ব্যবস্থা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন মানুষ, মানুষ-

হিসাবে গণ্য হতে পারে না, দে। কসাই কর্ণওয়ালিশ তার নিজের জাতের গোরা কৃষকদেরও মানুষ বলে মনে করত না। ফ্রান্সের রাজা, জমিদার ত খতম হয়ে গেছে, কিন্তু বানিয়ার দল—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাতভাইরা রাজ্য দখল করে নিয়েছে, যার জন্যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আসল তেরংগা ঝাণ্ডা ফ্রান্সেও উড়তে পারেনি।"

"তা' হলে ফ্রান্সের রাজপরিবারের জায়গায় ব্যবসাদারের রাজ্য স্থাপিত হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, এবং ইংলণ্ডের ব্যবসাদারেরাও সোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে হে ! যখন আমরা সাত সমুদ্র তের নদী পারে ভারতবর্ষের রাজ্য চালাতে পারছি, আর ইংলণ্ডে পারব না ? এজন্য রাজ-শক্তিকে তারা নিজের হাতে তুলে নিতে চায়, যদিও রাজাকে সরিয়ে দিয়ে নয়।"

* "আপনি বলে ছিলেন, ইংলণ্ডের রাজার হাতে শাসন-ক্ষমতাই নেই।"

"হ্যাঁ ! এই গোরা-ব্যবসাদারদের চালাকী এক্ষেত্রেও দেখেছি। আমার খুব দেশ দেখার সখ ছিল। সুবিধা পেয়ে আমি কোম্পানীর চাকরী করে নিলাম। চাকরী যদি না করতাম তবে ব্যবসায়ীরা আমাকে সন্দেহ করত এবং দেশ পর্যটন আমার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত। এইজন্যই আমি দু'বছর কোম্পানীর দাসত্বরূপ নরকে ছিলাম।"

"ভাল মানুষের কাছে এটা সত্যিই নরক, সাহেব। এখানে সে-ই থাকতে পারে, যে সকল পাপেই সিদ্ধ হস্ত, সমস্ত অপমান সহ্য করে শুধু টাকা রোজগারের জন্যই যে সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণওয়ালিশের কোন এক অনুচরের কৃপায় পাপের প্রতিদান হিসাবে চার গ্রামের এক জমিদারী আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তার প্রতিফলও পেয়েছি আমি—আমার বউ; ছেলে, মেয়ে সব মরে গেছে। ওই জমিদারীর নামে এখন আমার প্রাণ কাঁপে, আমিও আজ আপনার সংগে একমত। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রাজ্যদ্বারাই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হতে পারে, মানুষ অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।"

"কিন্তু এই একমত হওয়াতেই বা তার আশা করাতেই কিছু হবে না। এর জন্য ফ্রান্সের মত সহস্র সহস্র লোককে আত্মবলি দিতে হবে। আর এই আত্মবলিও চুপি চুপি দিলে কাজ হবে না। ভারতবর্ষীয় সিপাইরাও ত ইংরাজের জন্য লাখে লাখে আত্মবলি দিচ্ছে। এই আত্মবলি নিজেদের দিতে হবে নিজেদের মংগলের জন্য এবং এ বলি দিতে হবে জেনে শুনে !"

"জেনে শুনে !"

"জানাশোনার মানে হল, ভারতীয়দের পৃথিবীর সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া দরকার। বিজ্ঞান মানুষের হাতে জোরালো শক্তি জুগিয়ে চলেছে। এই বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান দিয়ে মানুষ বন্দুক বোমা বানিয়েছে, নিজকে সবল করে তুলছে। এই বিজ্ঞানই তোমাদের শহরসমূহকে ধ্বংস করে ইংলণ্ডে নতুন কলকারখানা এবং নতুন শহর তৈরী করে চলেছে। ওই বিজ্ঞানের শরণ তোমাদেরও নিতে হবে।"

"তারপর ?"

"তারপর ভারতবর্ষের ছোঁয়াছুঁয়ি, জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমান সবকিছুর ভেদাভেদ মেটাতে হবে। দেখছ না, আমরা কারো হাতেই খেতে জাত-বিচার করি না।"

"না।"

"ইংরাজদের মধ্যে ধনী দরিদ্র ছাড়া ছোট বড় আর কোনও জাতবিচার আছে ?"

"না। তারপর ?"

"সহমরণ বন্ধ করতে হবে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোককে আগুনে পোড়ান,—তুমি কি মনে কর, একে ভগবান কোনদিন ক্ষমা করবেন ?"

কলকাতায় পৌঁছে আলাদা হয়ে যাওয়ায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—এই চিন্তায় কোলম্যান ও তিনকড়ি দে দুঃখিত হল। সবশেষে কোলম্যান বলেছিল—

"বন্ধু, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পড়েছি। পৃথিবীতে ওলট-পালট হয়ে চলেছে। এই ওলট-পালটে আমাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। আর এজন্য প্রথম প্রয়োজন হল, ছাপাখানা এবং সংবাদপত্র চালু করে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা।"

৩

এবছর বর্ষা হয়নি। জ্যৈষ্ঠের শুকনো মাটি তেমনি শুকনো পড়ে রয়েছে। ভাদাই ধান বা রবিশস্য একছটাকও হয়নি। পরিবারের পর পরিবার মরে গিয়েছে অথবা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়েছে। শীর্ণ দেহ লম্বা বিলের জল শুকিয়ে গেলে পরে পঁচিশ মাইল দূর-দূরান্তের লোককে তার গহ্বরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এরা পদ্মমূল খুঁজে বের করতে এসেছিল। আর এর জন্য কতবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছে তার ঠিক নেই।

পরের বছর বর্ষা যখন এলো প্রথম ফসলে রেখা হাত লাগালো। গমের বীজ বুনতে বুনতে মংগরীকে কাছে দেখে বিস্মিত হল সে। এই এক বছরে যেন পৃথিবীতে ওলট-পালট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। ঘরে ঘরে অধিকাংশ লোকই মরে গিয়েছিল, বহু ঘরের লোকজন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলে। রেখা এই কথা ভেবে আশ্চর্য্য হল যে কি করে তারা দুটি প্রাণী দেহমনকে এক করে রেখেছে আর নিজেরাও এক সংগেই রয়েছে।

আরও কখনও অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকবে, কিন্তু, এত কষ্ট সম্ভবত রেখার পূর্ববর্তী কৃষকদের ভোগ করতে হয়নি। সে সময় একমাত্র গভর্ণমেণ্টই ছিল, তাকেও

আবার খাজনা কম দিতে হত। এখন কোম্পানী সরকারের নীচে জমিদারের জবরদস্ত সরকার রয়েছে যাদের লস্কর-পেয়াদার কবল থেকে একটা খড়-কুটও রেহাই পায়না। কোন ফসল দেড়মাস বাঁচিয়ে রাখা যায় না, তার আকালের জন্য কৃষকেরা কি বাঁচাবে?

অগ্রহায়ণ মাসে মংগরী যখন এক ছেলের জন্ম দিল, তখন আরও বিস্মিত হল রেখা। তার বয়েস পঞ্চাশ হয়েছে বলে নয়, কারণ মংগরীর বয়েস ত্রিশ বছ্র‌ই ছিল এবং আরও কটি মৃত সন্তানের জননী হয়েছিল সে। তার বিস্মিত হবার কারণ হল এই যে, দুর্ভিক্ষের দিনে যখন নিজের অস্থিচর্মকে জীইয়ে রাখাই মুশ্‌কিল, তখন মংগরী এক নতুন প্রাণীকে কেমন করে জীইয়ে রেখে জন্ম দিল।

মাঘ মাসে রামপুরের জমিদার তার হাতী-ঘোড়া, পাইক-পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে দয়ালপুরে এলো। রেখা শুনেছিল, জমিদারের ঘরে একটি ছেলেমেয়েও শুকিয়ে যায়নি। দুর্ভিক্ষের সময়ে তার ঘরে সাতবছরের পুরাণো চাল খাওয়া হয়েছে। দয়ালপুরের জমিদারের কাছারি ছিল গ্রামের এক প্রান্তে। তার সামনে পঁচিশ একর জমি জুড়ে এক আম বাগান তৈরী করা হচ্ছিল। তাতে প্রয়োজনীয় জল ঢালা বা তার মাটি খোঁড়ার কাজে দয়ালপুর-বাসীদের বেগার দিতে হত। প্রতিঘরের লোকের উপর মালিক পঞ্চাশটি করে আম-চারার ভার দিয়ে রেখেছিল। চারাগাছ শুকিয়ে গেলে একটিব জন্য পাঁচসিকি দণ্ড দিতে হত। রেখার পরবর্তীরা জমিদারের অত্যাচারকে সনাতন বলে মেনে নিতে আরম্ভ করছিল। তাদের কাছে সোবরণ রাউৎ এবং রেখা-ভগতের বর্ণিত পূর্বের জমিদার রূপ এবং গ্রামে পঞ্চায়েতের কাজ—এ সবই গল্প বলে মনে হত! আকালের পর মালিকের পেয়াদারা আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবতো, কৃষকের মনোবল ভেঙ্গে দিতে এবং অপর পক্ষে মালিকের দাপট বাড়িয়ে তুলতেই আকালের আগমন। অগ্রহায়ণ মাসে যখন রেখার চালে লাউগাছের আগায় ফল ধরতে শুরু করল, তখন থেকেই জমিদারের পেয়াদারা ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করে। লোকে বলত, আকালের পরে রেখার মেজাজ চড়ে গেছে। কিন্তু রেখার কাছে সে কথা ভুল বলে মনে হত। কিন্তু কথাটা ছিল সত্যিই। বস্তুত, আকালের পরে গ্রামের অপর লোকে যতটা পরিমাণ নীচে নেমে গিয়েছিল, তার তুলনায় রেখা ছিল অনেক উপরে। এই জন্যই তার ব্যবহার রুক্ষ বলে মনে হত। পাইক-চৌকিদারকে নিজের ঘরের কাছে ঘুরতে দেখে রেখা ভয়ানক রেগে যেত, যদিও মুখে তা সে প্রকাশ করত না। একদিন চৌকিদার দেওয়ানজীর জন্য লাউ পাড়বার আশায় চালের উপর উঠল। সেই সময় রেখা ঘরে বসে সুখারীকে কোলে নিয়ে আদর করছিল। চালের উপর মচ্‌মচ্‌ শব্দ হতেই সুখারীকে মাদুরের উপর রেখে বাইরে চলে এল। দেখতে পেল, চৌকিদার চালার উপর উঠে লাউ ছিঁড়ছে। তিনটি ইতি-মধ্যেই ছিঁড়েছে, চতুর্থটা ছিঁড়বার জন্য হাত বাড়িয়েছে। রেখার দেহে আগুন জলে উঠল। আধখান গ্রাম শুনতে পায়, এমনি জোরে চীৎকার করে সে বলল "কে হে?"

"দেওয়ানজীর জন্য লাউ পাড়ছি, দেখতে পাচ্ছ না?"—মাথা না তুলেই বলল

চৌকিদার। কর্কশ স্বরে রেখা বলল,—"হাত-পা আস্ত রাখতে চাও ত ভালয় ভালয় নেমে এস। শুনতে পাচ্ছনা না?"

"মালিকের চাপরাশী জান ত?"

"খুব জানি! ভাল মানুষের মতন লাউ গুলো ওখানে রেখে নেমে এস।"

চাপরাশী নিঃশব্দে নেমে এল।

সব শুনে দেওয়ানজী তখনকার মত রাগ চেপে রাখ্‌ল। মাঘমাসে মালিকের আগমন পর্যন্ত এ ব্যাপার চেপে রাখল সে।

মালিক আসবার পরে সেই চাপরাশী সন্ধ্যাবেলা রেখা ভগতের বাড়ী এসে বলল—

"কাল সকাল থেকেই দু'সের করে দুধ মালিকের বাড়ীতে পৌছে দিতে হবে।"

"আমার কাছে গরু-মহিষ কিছুই নেই, দুধ কোথা থেকে পৌছে দেব?"

"যেখান থেকে হোক, মালিকের হুকুম।"

দেওয়ান একথা জানতই যে রেখার কাছে গরু-মহিষ কিছুই নেই। কিন্তু রেখাকে ত তার ঢিট্ করতে হবে এখন। সন্ধ্যাবেলাতেই সে রেখার ঔদ্ধত্যের কথা মালিকের কাছে জানিয়ে দিয়েছে, আর এও বলেছে যে সারাগ্রাম বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মালিক রাত্রের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করে ফেলল এ সম্বন্ধে।

সকালে রেখার কাছ থেক দুধ এল না। পেযাদা এলে রেখা গরু-মহিষ না থাকার কথা বলল। মালিক পাঁচজন গুণ্ডাকৃতি পেযাদাকে হুকুম দিল—

"যাও হারামজাদার মাগের দুধ দুইয়ে নিয়ে এস।"

গ্রামের কয়েকজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারা ভাবল যে, পেয়াদারা রেখাকে ধরে নিয়ে আসবে। রেখাকে কোনকিছু বলার বা শোনার সুযোগ না দিয়ে পেয়াদারা তাকে বেঁধে ফেলল। তারপর দুজনে ঘরে ঢুকে মংগরীকে ধরে আনল। নিরুপায় রেখা অগ্নিবর্ণ চোখে দেখতে লাগল যে, চীৎকাররতা মংগরীর স্তন টিপে ধরে গ্লাসের মধ্যে সত্যিসত্যিই কয়েক ফোঁট দুধ বের করল তারা। পেযাদারা রেখাকে অমনি বেঁধে রেখেই চলে গেল।

লজ্জায় মরে গিয়ে মংগরী সেইখানেই মুখগুঁজে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে যেন কথা বলার শক্তি খুঁজে পেল রেখা। বলল—"লজ্জা করোনা মংগরী। আজ আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত বেঁচে থাকলে বাঁদশাহও এমন করতে পারত না। কিন্তু এই বেইজ্জতীর মজা আমি বোঝাব। যদি আমার দেহে সাচ্চা অহীরের রক্ত থাকে ত এই দেওয়ান এবং রামপুরের মুন্সীর কুলে কাঁদবার লোকও কেউ থাকবে না। এই অপমানের প্রতিকার আমার এই হাতই করবে মংগরী। আয়, আমার হাত ছাড়িয়ে দে।"

মংগরী জলভরা চোখেই রেখার বাঁধন খুলে দিল। ভিতরে গিয়ে সুখারীকে কোলে নিয়ে তার মুখে চুমা দিতে থাকল সে। তারপর মংগরীকে বলল—

"এখান থেকে যা নেবার আছে তা নিয়ে শীগ্‌গীরই তোর মায়ের কাছে চলে যা। আমি এই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি।"

রেখার গলার স্বর মংগরীর অজানা ছিল না। ছেলেকে, আর দু-তিনখানা কাপড় নিলো সে, তারপর রেখার পায়েব উপর পড়ল। রেখা অত্যন্ত কোমল স্বরে বলল—

"শুধু তোর ইজ্জত নয়, সাবা গ্রামের ইজ্জতের বদলা নিতে হবে। যা আর সুখারীকে বলিস্ তাব বাপ কেমন ছিল। দেরী করিস্ না, আমি চললাম চুল্লী থেকে আগুন বের করতে।"

মংগরী বহুদূব পয্যন্ত ঘরটাকে দেখতে লাগল—যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাল থেকে আগুন উঠতে আরম্ভ না করল, ততক্ষণ। লোকেরা গ্রামেব প্রান্তে অবস্থিত রেখার ঘরেব দিকে দৌড়তে লাগল, আর রেখা উন্মুক্ত তলোয়াব নিয়ে দৌড়াল জমিদারেব কাছাবীব দিকে। জীবন সংশয় দেখে চৌকিদাব পেয়াদারা পালাতে য়লাগল। মালিক এবং দেওয়ানকে মারবাব সময় রেখা বলল—"তোমাদেব জন্য কাঁদবাব লোকও বাখব না শয়তানের দল।"

রেখা নিজের কথাকে সত্য প্রমাণিত কবল। প্রতিজ্ঞা পূবণেব চেযেও বেশী কবল সে। কসাই কর্ণওয়ালিস এমনি কতজন বেখাকে জন্ম দিয়েছিল?

মংগল সিংহ

কাল—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ

১

এরা দুজন আজ টাওয়ার দেখতে গিয়েছিল। সেখানে এরা সেই কুঠুরীগুলো দেখল, যার ভিতর জীবনভর বন্দী থেকে রাজদ্রোহীরা পচে মরত। বন্দীদের টানা দিয়ে রাখবার যন্ত্র, কুড়াল এবং অন্যান্য সেই হাতিয়ারগুলো দেখল—যার সাহায্যে রাজা প্রমাণ করত যে, জীবন-মরণ তারই হাতের মুঠোয় এবং পৃথিবীতে সে-ই-সত্যিকারের ঈশ্বর প্রেরিত যুবরাজ কিংবা যমরাজ। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিষ যা আকর্ষণ করল এদের তা হল সেই স্থান, যেখানে ইংলণ্ডের অনেক রাজরাণীর ছিন্নশির ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

এ্যানি রাসেল আজও তার কোমল হাত ওর হাতে দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আজ সেই কোমলতা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। মনে হচ্ছিলো, এগারো বছর আগে (১৮৪৫) বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে আবিষ্কৃত ইলেকট্রিসিটির মত এক শক্তি এ্যানির হাত থেকে সারা শরীরে বয়ে চলেছে। মংগলসিংহ বললো—

"এ্যানি, তুমি কি ব্যাটারী নাকি?"

"এমন কথা কেন বলছো মংগী?"

"আমি যে সেই রকমই অনুভব করছি! ষোল বছর আগে যখন আমি ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করি, তখন মনে হয়েছিল, অন্ধকার থেকে আলোতে চলে এলাম। এখানে বিশাল পৃথিবী—লম্বা-চওড়ায় বড় নয়, বহুদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট জগৎ আমার চোখে পড়ল। চুকন্দরের চিনি (১৮০৮), বাষ্পীয় জাহাজ ষ্টীমার (১৮১৯), রেলওয়ে (১৮২৫), তার (১৮৩৩), দিয়াশলাই (১৮৩৮), ফোটো (১৮৩৯), বিজলী আলো (১৮৪৪)—এসব নতুন এবং আশ্চর্যজনক দেখবার জিনিষ ত ছিলই। কিন্তু যখন আমি কেম্ব্রিজে এসব সম্বন্ধে পড়াশুনো করবার এবং রসায়নাগারে এগুলোকে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলাম, তখন আমি বুঝতে আরম্ভ করলাম যে পৃথিবীর অদৃষ্টে কি ভবিষ্যৎ এক বিরাট লেখা আছে।

"ইংলণ্ডে এসে সত্যিই তোমার মনে হয়েছিল যে অন্ধকার থেকে তুমি আলোতে এলে?"

"সেই অর্থে,—যার কথা এখনই বললাম। ভারত ছাড়বার সময় আমার মনে শুধু দু'টো উদ্দেশ্যই ছিল—এক তো আমার প্রিয় ইষ্টদেব যিশুখৃষ্টের ভক্তবৃন্দের দেশ দর্শন করব, আর দ্বিতীয়ত, আমাদের কুলের হারিয়ে যাওয়া রাজলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবো।"

"কতবার আমি ভেবেছি, তোমার কাছে তোমার নিজের সম্বন্ধে জানতে চাইব কিন্তু বারবারই কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি। আজ তোমার কথা বল মংগী?"

"যে আমার জীবনের গতিকেই বদলে দিয়েছে তার কাছে আর বলতে কি আপত্তি থাকতে পারে আমার? এ্যানি প্রিয়তমা, চল ওই শান্ত টেম্‌সের পারে। আমাদের গংগার মত অত বিরাট, অত সুন্দর নয় টেম্‌স্‌, তবুও যখনই আমি টেম্‌স্‌কে দেখি, তখনই গংগার মধুর স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। তুমি জানো এ্যানি, খৃষ্টানেরা ভগবান যিশুখৃষ্টের ছাড়া আর কারও পূজাকে বিধর্ম বলে মনে করে এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে? কিন্তু টেম্‌স্‌ একবার আমাকে খৃষ্টান থেকে বিধর্মী করে দিয়েছে। আমি আমার নিজের কাফের মাকে অত্যন্ত ভক্তির সংগে ফুল দিয়ে গঙ্গা প্রণাম করতে দেখেছি।"

দুজনে টেম্‌সের ধারে এসে পৌছুল। টেম্‌সের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাথরের এক চত্বরের উপর ওরা বসলো। শাদা টুপীর ভিতর থেকে বেরিয়ে গালের ওপর এসে পড়া এ্যানির সোনালী কেশগুচ্ছ হাওয়ায় উড়তে লাগল, মংগল তাতে চুমু দিয়ে কথা আরম্ভ করল,—

"এই টেম্‌সের পার থেকে বহুবার আমি গঙ্গাকে আমার মানস-তর্পণ নিবেদন করেছি।"

"তোমার মা গঙ্গাকে পুষ্পার্ঘ্য দিতেন?"

"হ্যাঁ, অতি ভক্তিসহকারে, যেমন খৃষ্টানেরা প্রভু যিশুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। তখন আমি প্রথম খৃষ্টান হয়েছি, আমার কাছে একে অত্যন্ত ঘৃণিত প্রথা বলে মনে হতো। কিন্তু এখন না জানি আমি গঙ্গাকে অপমান করবার পাপের জন্য কতবার অনুতপ্ত হয়েছি।"

"খৃষ্টানধর্ম যে আদর্শকে নষ্ট করতে চেয়েছে, আমাদের কবিকুল তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তুমি জান, আমরা একে টেম্‌স্‌পিতা বলে অভিহিত করি।"

"আর আমরা বলি গঙ্গা মা—"

"তোমার কল্পনা আরও মধুর মংগী। তোমার কথা বল আমাকে!"

"বেনারস আর রামনগর গঙ্গার এপার আর ওপারে পরস্পর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। ষোল বছর পর্যন্ত আমি গঙ্গাকে দেখেছি। বেনারসে একেবারে গঙ্গার উপরেই আমাদের বাড়ী। তার নীচে দিয়ে ষাট্‌ ধাপ সিঁড়ি গঙ্গার জল পর্যন্ত নেমে গেছে। সম্ভবত যখন আমি প্রথম চোখ মেলি, তখনই মা আমাকে কোলে নিয়ে গঙ্গা দেখিয়েছেন। কেন জানিনা, আমার মনে হয়, আমার রক্তে গঙ্গা বয়ে চলেছে। রামনগরে আমার ঠাকুর্দার কেল্লা রয়েছে, কিন্তু সেটা আমি দু'একবার মাত্র দেখেছি— নৌকা করে গঙ্গায় বেড়াবার সময়; ওর ভিতরে গিয়ে দেখবার অথবা ওটা বেশীবার দেখবারও ইচ্ছা আমার হত না। মা ত আরও যেতে চাইতেন না। বুঝতেই তো পারো এ্যানি, যে একদিন ঐ কেল্লার যুবরাজ্ঞী হয়েছিল আর আজ যে ইংরাজদের ভয়ে

নাম বদলে বেনারসের এক বাড়ীতে জীবন কাটাচ্ছে, সে কেমন করে ঐ কেল্লার দিকে তাকাতেও সাহস করবে? আমার ঠাকুর্দা চেৎসিংহকে দস্যু ওয়ারেন হেষ্টিংস নাহোক নাজেহাল করেছে—ইংলণ্ডে হেষ্টিংস্ আপন কৃতকর্মের ফলও পেয়েছে কিছুটা। কিন্তু আমার ঠাকুর্দার প্রতি কিছুমাত্র ন্যায় করা হয়নি, লুণ্ঠিত রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া বড় সহজ ন্যায়ের কাজ ছিল না, এ্যানি।"

"তোমার মা এখনও বেঁচে আছেন?"

"বেনারস্ থেকে প্রায়ই আমাদের পাদ্রীর চিঠি আসে, আমি তাঁর মারফতে মাকে চিঠি লিখি। পাঁচ মাস আগে পর্যন্তও তিনি জীবিত ছিলেন এ্যানি।"

"প্রথমে তুমি খৃষ্টান ছিলে না তা হ'লে?"

"না, আমার মা এখনও হিন্দু রয়েছেন। আমি প্রথম প্রথম তাঁকেও খৃষ্টান করতে চাইতাম, কিন্তু এখন—"

"এখন ত তুমিও মার সংগে এক সাথে গঙ্গা মাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করবে?"

"আর পাদ্রী বলবে, এ খৃষ্টান ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে।"

"তুমি খৃষ্টান কি করে হলে?"

"অন্তরের প্রেরণা কিছুই ছিল না, বেনারসেও ইংরাজ পাদ্রী এবং পাদ্রিনীরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করে বেড়ায়। কিন্তু বেনারস্ হ'ল হিন্দুদের রোম। এ জন্য সেখানে তেমন সাফল্য লাভ করা যেত না! একবার এক ডাক্তার পাদ্রী আমার মার চিকিৎসা করেন। তারপর তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। আমার মার সংগে তাঁর পরিচয় অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমি তখন ছোট ছিলাম এবং তিনি আমাকে প্রায়ই কোলে তুলে নিতেন—"

"ছেলেবেলায়ও তুমি বোধ হয় সুন্দর ছিলে মংগী? কে না তোমাকে কোলে নিতে চাইবে?"

"তারপর সেই পাদ্রীই মাকে বোঝালেন 'যে ছেলেকে ইংরাজী পড়াও। পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকেই পাদ্রী আমাকে ইংরাজী পড়াতে সুরু ক'রলেন। মা নিজের পরিবারের অতীত-বৈভবের কথা ভাবতেন এবং মনে মনে আশা ক'রতেন যে, হয়ত ইংরাজী প'ড়ে আমার ছেলে কুল-লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য কিছু ক'রতে পারবে। আমার বাবা আমার তিন বছর বয়সের সময়ই মারা গিয়েছিলেন। এজন্য মা'কেই সব কিছু ক'রতে হ'তো। আমাদের যা কিছু সম্পত্তি সবই তো রাজ্যের সাথে সাথেই চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু মা'র কাছে তাঁর শাশুড়ীর দেওয়া প্রচুর মনি-মুক্তা ছিল। আর আমার মামাও তাঁর বোনকে সাহায্য ক'রতেন। আট বছর বয়সের সময় আমি খুব বেশী ক'রে সেই পাদ্রী দম্পতির বাড়ীতে থাকতে লাগলাম। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শুনবার সুযোগ আমার খুব কমই মিলতো, যদি কিছু মিলতো তো সে পাদ্রিণীর মুখ থেকে। তিনি ব'লতেন 'এ তোমারই ভাগ্য বটে যে তোমার মা বেঁচে গিয়েছেন। সৌভাগ্য না হ'লে, তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর লোকে তোমার মা'কে জীবন্ত দগ্ধ

ক'রে সতী বানাতে চাইতো। আমার মাকে জীবন্ত দগ্ধ করার সংগে হিন্দু-ধর্মকে এক মনে করার পর—তুমিই বুঝতে পারো এ্যানি,—আমার হৃদয়ে এই ধর্মের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ছাড়া আর কোন্ ভাবের উদ্রেক হ'তে পারে! এই সময় সতী প্রথা বন্ধ হ'তে দু'বছর (১৮২৯) বাকী ছিল। আমার মংগলের কথা ভেবে পাদ্রিণীর কথা মা মেনে নিলেন এবং পড়াব জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। কলকাতায় যখন পড়ছিলাম, তখন মা'র মনে সন্দেহ হ'ল যে, আমাকে খৃষ্টান বানাবার জন্যই-পাদ্রিণী এই সবকিছু ক'রছে। মা প্রথমে বুঝতে না পারায় ভালোই হয়েছিল, কারণ তা না হ'লে নিজের চোখ খুলবার সুযোগ আমি পেতাম না।"

"ভারতবর্ষে কি শিশুদের পড়বার কথা কেউ ভাবে না?"

"আমাকে পড়ানো হ'তো, কিন্তু যা' তেরশ বছর আগে পড়লে লাভ ছিল এখনো সেই বিদ্যাই শেখানো হোত।"

"তারপর ইংলণ্ডে আসবার জন্য মা'র অনুমতি কি ক'রে পেলে?"

"অনুমতি? আমি না ব'লেই চলে এলাম। পাদ্রী সাহায্য করলেন। কেম্ব্রিজে পড়বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন তিনি। এখান থেকে আমি যখন মাকে কুশলসংবাদ পাঠালাম, তখন তিনি আশীর্বাদ জানালেন। তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে। প্রত্যেক চিঠিতে আমাকে বাড়ী চ'লে যেতে লিখতেন তিনি।"

"তুমি কি জবাব দিতে?"

"জবাব আর কি দেব। তিনি ভাবতেন, আমি রাজধানীতে আছি, ইংলণ্ডের রাণীর সাথে আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'চ্ছে এবং এক সময় আমি চেৎসিংহের সিংহাসনের অধিপতি হ'য়ে ফিরে যাবো।"

ঐ গঙ্গা-পূজারিণী বেচারী কি ক'রে জানাবেন যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার সাথে তোমার দেখা না হ'য়ে হ'য়েছে সমগ্র দুনিয়ার যত মুকুট-শোভিত-শিরের ভয়ঙ্কর শত্রু কার্ল মার্কস্ আর ফ্রিডরিশ এংগেল্‌সের সংগে!

"সে সময় ভারতবর্ষ পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং তার শক্তি সম্বন্ধেই অজ্ঞান, তখন মার্কসের সাম্যবাদকে কি ক'রে বুঝবেন তিনি?"

"মার্কসের সংগে ভারত সম্বন্ধে কখনও কিছু কথা হ'য়েছে তোমার?"

"বহুবার এই ভেবে আমার অবাক লেগেছে যে, এখানে বসে বসে ভারতের জীবন-প্রবাহ সম্বন্ধে কি করে এত জ্ঞান হ'ল তাঁর! কিন্তু এ কোন ভানুমতীর খেলা নয়, গত তিনশ বছরে বিভিন্ন ইংরাজ ভারতের সম্বন্ধে যতটা জ্ঞানার্জন করে লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছে, সবই এই লণ্ডনে মজুত রয়েছে। আবর্জনার মত পড়ে থাকা এই পুস্তকাবলী গভীর মনোযোগের সংগে প'ড়েছেন মার্কস্। আর যখনই কোন ভারতীয়ের এখানে দেখা পেতেন, তাকে জিজ্ঞাসা করে করে তাঁর সিদ্ধান্তকে যাচাই করে দেখতেন।"

"ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সম্বন্ধে মার্কসের কি সিদ্ধান্ত?"

"ভারতের যোদ্ধাদের খুবই প্রশংসা করেন—তিনি আমাদের বুদ্ধিরও প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন পন্থীদের, ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে তিনি মনে করেন। আমাদের গ্রামগুলোকে স্বয়ং ধারী ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র মনে করেন।"

"প্রজাতন্ত্র?"

"সমগ্রদেশ নয়, দেশের একটা জেলা, এমন কি এক সংগে দু'টো গ্রামও নয়, শুধু একটি একক গ্রাম। কিন্তু সব জায়গাতে নয়, যেখানে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ইংরাজী ছাঁচে জমিদারী প্রথা কায়েম ক'রছে, সেখানকার প্রজাতন্ত্র প্রথমেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রকে জন সম্মত পাঁচ বা অধিক পঞ্চ পরিচালনা ক'রে থাকে। পুলিশ, আইন, সেচ, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি সমস্ত বিভাগই সে পরিচালনা করে, এবং অত্যন্ত বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা, ন্যায় এবং নির্ভয়তার সংগে গ্রামের এক এক অংগুলি পরিমাণ জমি অথবা ক্ষুদ্রতম মানুষের ইজ্জত রক্ষার জন্যেও আপন পঞ্চায়েতের হুকুমে গ্রামের শিশু-বৃদ্ধ সর্বদা প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। —যখন দিল্লীর আশে পাশে অল্প দূর পর্য্যন্তই মুসলমান শাসকদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল, এবং তারা নিজেদের মুসাফির ব'লে মনে ক'রতো, সেই সময়ে প্রথম প্রথম তারা পঞ্চায়েতের ক্ষতি করতে চাইতো। কিন্তু পরে তারা পঞ্চায়তের স্বাযত্ত শাসনকে মেনে নিলো। কিন্তু ইংরাজ শাসকবৃন্দ, বিশেষ করে ইংলণ্ডের জমিদার লর্ড কর্ণওয়ালিশই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রকে বরবাদ করবার আওয়াজ তুললো, এবং বহুলাংশে সফলও হ'ল। কিন্তু এততেও সম্ভবতঃ ভাঙ্‌তো না এই পঞ্চায়েত। গ্রামের প্রজাতন্ত্র এবং তার অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর সবচেয়ে বড আঘাত পড়লো, ম্যান্‌চেষ্টার ল্যাংকাশায়ারের কাপড, শেফিল্ডের লোহার জিনিষ এবং এখান থেকে রপ্তানী করা এ রকম আরও বহু জিনিষ পত্রের কছে থেকে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বাষ্পীয় পোত (ষ্টীমার) জলে নামলো। সংগে সংগেই গ্রামের অর্থনৈতিক প্রজাতন্ত্রের অবশিষ্ট অংশটুকুও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম মলমল উৎপাদনের স্থান ঢাকার দুই তৃতীয়াংশ জনবিরল হয়ে পড়লো। গ্রামের তাঁতীদের অবস্থা হয়ে উঠলো অবর্ণনীয়। যে ভারতীয় গ্রাম নিজেদের কামার, কুমার, জোলা, তাঁতি নিয়ে নিজেকে স্বাধীন মনে করতো, তার এই সমস্ত কারিগর তখন হাত গুটিয়ে ঘরে বসে অনাহারে মরতে লাগলো। আর তাদের জন্য ল্যাংকাশায়ার ম্যানচেষ্টার, বামিংহাম, শেফিল্ডের মাল পাঠানো হতে লাগল। শুধু কাপড়ের কথাই ধরো। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত থেকে ব্রিটেনে ১,৮৬,৬০৮ থান কাপড় এসেছে এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৩,৭৬,০৮৬ থান এসেছে। এই দুই বছরে আমাদের ওখানে ৮,১৮,২০৯৫,১৭,৭৭,২৭৭ গজ বিলাতী কাপড় অতিরিক্ত রপ্তানী হ'ল। এখন ঢাকার মলমল উৎপাদনকারী ভারতবর্ষ নিজের তুলা বিলাতে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী করাচ্ছে। আর এই প্রয়োজনের পরিমাণ? একেবারে হালের হিসাব ধরো, ১৮৪৬-এ ১০, ৩৫, ৩০৯ পাউণ্ড তুলো এখানে এসেছে।"

"কি নিষ্ঠুরতা, কি অত্যাচার!"

"কিন্তু আমার গুরু বলেন, বিদেশীদের এই অত্যাচারে আমাদের হৃদয় কেঁদে ওঠে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তা তৃপ্ত হয় প্রাচীন পন্থার এই পতনে।"

"দু'টোর তা' হলে দু'রাস্তা আছে?

"দু'টোর দু' রাস্তাই হয় এ্যানি! সন্তান-প্রসবের সময় মা কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু একই সংগে তিনি সন্তান প্রাপ্তির আনন্দও অনুভব করেন। ধ্বংস বিনা সৃষ্টি সম্ভব হ'তে পারে না। ছোট ছোট ঐ সব প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস না করে বিরাট শক্তিশালী এক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত ভারতীদের ভক্তি কেবলমাত্র নিজ নিজ গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বড় রকমের দেশভক্তি—সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আত্মত্যাগ করতে তারা পারবে না। ইংরাজেরা নিজের ব্যবসার সুবিধার জন্যই প্রথমে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ এই সমস্ত যন্ত্রকেই শুধু ভারতে আমদানী করছে, কিন্তু মার্কসের এই কথাই ঠিক যে, যদি রেলসমূহ তৈরী এবং মেরামতের জন্য ইংরাজ পুঁজিপতি ভারতীয় কয়লা এবং লোহাকে কাজে লাগাতে না পারে, তবে বেশীদিন পর্যন্ত তারা সস্তায় এই সব জিনিষ এখানে দিতে পারবে না। আবার ভারতীয়েরাও বিজ্ঞানের এই চমৎকারিতা চোখের সামনে দেখে কতদিন পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে?"

"অর্থাৎ, ভারতেও শিল্প এবং পুঁজিবাদের বিস্তার অপরিহার্য্য।"

"নিশ্চয়ই, ইংলণ্ডে এখন সামন্তবাদী প্রভুত্ব নেই এ্যানি।"

"হ্যাঁ, সংস্কার আইন (১৮৩২ খৃঃ) ইংলণ্ডের শাসনের ভার পুঁজিপতিদের হাতেই তুলে দিয়েছে।"

"অথবা বলতে পারো, পুঁজিপতিদের শাসনারূঢ় হবার সূচনা ঐ আইন।"

"তুমি ঠিক বলেছো। চার্টিষ্টদের সভাসমূহ এবং পত্রিকাসমূহ কি তোমার ওপর কোনরকম প্রভাব বিস্তার করেছে এ্যানি?"

"সভার সময় তো আমি ততটা সচেতন ছিলাম না, ওগুলোর স্মৃতি সামান্যই মনে আছে আমার। আমার কাকা রাসেল মন্ত্রীসভায় চার্টিস্টদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তাঁর মুখে বহুবার আমি এই বিপদজনক আন্দোলনের কথা শুনেছি।"

"আচ্ছা এ্যানি, এই কথা বলার সময় তাঁকে কি তেমনি জোরালো বক্তারূপে দেখা গিয়েছিল, পার্লামেণ্টে বারো লক্ষ জনতার সহিযুক্ত সাধারণ দাবী পার্লামেণ্টে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল!"

"না প্রিয়, এখনও তিনি ভয় করেন, যদিও খৃষ্টীয় এই ১৮৫৬ সালে চার্টারবাদের সম্বন্ধে কিছু শোনাই যায় না।"

"ভয় কেন পাবেন না এ্যানি? পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা যেমন সামন্তশাসনকে ধ্বংস ক'রে নিজেদের শাসন কায়েম করেছে, তেমনি মজুরেরাও এই পুঁজির রাজ্য খতম করে ছাড়বে এবং মানবতার জন্য কায়েম করবে—যেখানে ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট, কালো-শাদার ভেদাভেদ ঘুচে যাবে।"

"স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যও ঘুচবে মংগী ?"

"হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের জুলুমে মারা পড়ছে। আমাদের এখানে সামন্তবাদ তো এই সেদিন পর্য্যন্তও সতীপ্রথার নামে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোককে প্রতি বছর আগুনে পুড়িয়েছে আর এখনও তারা যে রকম পর্দার আড়ালে বন্দী হয়ে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পুরুষের জুলুম সহ্য করছে, তা মানবতার কলংক।"

"আমাদের এখানকার স্ত্রীলোকদের তুমি হয়ত স্বাধীন ভেবে থাকবে, কেন না, আমাদের পর্দার আড়ালে বন্দী ক'রে রাখা হয় না।"

"স্বাধীন বলি না এ্যানি' শুধু এইটুকু বলি যে তোমরা তোমাদের ভারতীয় বোনদের চেয়ে ঢের ভালো অবস্থায় আছ।"

"গোলামীর আবার ভাল-মন্দ কি মংগী ? পার্লামেন্টে ভোটের অধিকারও আমাদের নেই। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চৌকাঠও আমরা পেরুতে পারি না। এক মুঠোয় ধরা যায় এমন আঁট করে কোমর ক'ষে, আর যাট গজ কাপড় তা থেকে মাটিতে লুটায় এমনি সব ঘাঘরা পরি আমরা শুধু পুরুষের খেলার পুতুল হবার জন্য। যা হোক, তা হলে মার্কস্ এই আশা করেন যে, ভারতের শিল্প এবং পুঁজিবাদের প্রসার হবে, যার ফলে একদিকে লোকের ভিতরে অধিকতর সাহসের সঞ্চার হবে, অপরদিকে ওখানেও গ্রামের বেকার, কৃষক এবং কারিগরদের কারখানায় একত্রিত করা যাবে। তারপর তারা আপন শ্রমিক সমিতি গড়ে লড়তে শিখবে এবং সাম্যবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে ইংলণ্ডের মজুরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে, এবং পৃথিবীকে পুঁজিপতিদের গোলামী থেকে মুক্ত করে সেখানে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এ কয়েক শ' বছরের ব্যাপার মংগী ?"

"মার্কস্ এও বলেন যে, যদিও ইংরাজেরা বিজ্ঞানের দান কলকারখানা থেকে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত রেখেছে, তবুও বিজ্ঞানের অপর দান যুদ্ধের অস্ত্রসমূহ দিয়ে ভারতীয় সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করেছে। এই ভারতীয় সৈন্যরা ভারতের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করতে বড় রকমের সহায়ক হবে।"

"কিন্তু একি শীগগিরই হতে পারে ?"

"শীগগিরই নয় এ্যানি, সে সময় এসেই গেছে। কাগজে পড়নি, ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৮৫৬ খৃঃ) অযোধ্যাকে ইংরাজ রাজ্যের ভিতর নিয়ে নেওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, এবং নেওয়া হয়েছে বেইমানী করে।"

"বেইমানী বা ইমানদারী নিয়ে আমাদের তর্ক করার নেই। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা সব কিছুই নিজেদের স্বার্থের জন্য করেছে। কিন্তু অজ্ঞাতে তারা অনেক কিছু ভালোও করে ফেলেছে। তারা গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রকে ভেঙে আমাদের সামনে দেশের বিস্তৃত রূপ তুলে ধরেছে। তারা নিজেদের রেল, তার, জাহাজ দিয়ে আমাদের কূপমণ্ডুকতাকে ভেঙে বিশাল জগতের সংগে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত করেছে, অযোধ্যা অধিকার করায় কিছু পরিবর্ত্তন আসবে আর আমি তার প্রতীক্ষায় আছি এ্যানি।"

"মার্কসের শিষ্যের কাছ থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে ?"

২

গঙ্গার প্রশান্ত তট আবার অশান্ত হয়ে উঠতে চাইল। বিঠুরের বিশাল প্রাসাদে পেশোয়ার উত্তরাধিকারী নানা সাহেব (ছোট) শুধু সিংহাসন থেকেই নয়, পেন্সন থেকেও বঞ্চিত হয়ে অযোধ্যার ইংরাজদের সগু শিকার হয়ে পড়ার সময় থেকেই অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠল। তার অনুচরেরা তারই মতন পদচ্যুত অপরাপর সামন্তদের কাছে রাত দিন দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। আর সৌভাগ্যবশত ইংরাজেরা আরও এক ভুল করে বসল। আর সে ভুল শুধু ভুলই নয়, নিত্য নতুন পরিস্থিতির মধ্যে এ হলো রীতিমত প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ইংরাজেরা আগের ছররা বন্দুকের জায়গায় আরও বেশী জোরদার কার্তুজের বন্দুক তাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করল। এই কার্তুজসমূহ বন্দুকে ভরবার সময় দাঁতে কাটতে হতো। ইংরাজের দূরদর্শী শত্রু এই ব্যাপার থেকেই সুযোগ সংগ্রহ করে নিল! চারিদিকে রব তুলে দিল যে, বন্দুকের কার্তুজের ভিতর গরু এবং শূয়োরের চর্বি আছে, ইংরাজেরা জেনে শুনেই এই কার্তুজ সিপাইদের দাঁতে কাটতে দিয়েছে, যাতে ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম উঠে যায়, আর সকলেই খৃষ্টান হয়ে যায়।

কাশীরাজ চেৎসিংহের পৌত্র মংগল সিংহের নাম সৈন্যদের মধ্যে বিদ্যুতের মত কাজ করছে, এ কথা মংগল সিংহ জানত, কিন্তু সে কখনও এই রহস্যকে উন্মুক্ত হতে দেয়নি। নানা এবং অপর বিদ্রোহী নেতারা তার সম্পর্কে এইটুকুই জানত যে, সে ইংরাজ শাসনের পরম শত্রু,—বিলেত গিয়ে সে ইংরাজদের বিদ্যা যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছে, রাজনীতি সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় জ্ঞান রয়েছে। বিলাতে থাকার ফলে তার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, যদিও খৃষ্টান ধর্মকেও সে মানে না।

বিদ্রোহী নেতাদের সযত্ন রক্ষিত মনোভাব বুঝতে মংগল সিংহের দেরী লাগল না। সে দেখল যে পদচ্যুত সামন্তেরা নিজ নিজ অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে চাইছে এবং তার জন্য সকলের সাধারণ শত্রু ইংরাজকে সকলে একত্রিত হয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। তাদের কাছে আত্মত্যাগী সৈন্যরা দাবার ঘুঁটির বেশী আর কিছুই নয়। ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে সিপাইরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। কার্তুজের চর্বি যদি দাঁতে কাটতে না হতো ত সম্ভবত অনন্তকাল ধরে তারা কোম্পানীর জয়-জয়কার করে যেত, তার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিত। আর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য—সে ত এতটুকুও কমেনি। পরন্তু যদি বিদ্রোহ সফল হতো, তবে ধর্মের নামে গর্বিত নিরক্ষর সিপাহী আল্লাহ্ এবং ভগবানের কৃপাপাত্র হবার আশায় নিজেদের আরও বেশী কঠোর ধার্মিক বলে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করত। এর বেশী আর কোন চিন্তা যদি তাদের মনকে সচেতন করত, ত সে হ'ত গ্রাম এবং শহরসমূহের লুণ্ঠন। যদিও এই দোষে দুষ্ট সিপাহীদের

সংখ্যা কমই ছিল এবং সম্ভবত কম জায়গাতেই এমনি লুণ্ঠন চলেছিল। তা হ'লেও সোরগোল এতটা হয়েছিল যে, গ্রামের লোকেরা ডাকাত পড়ার মত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হয়ে উঠেছিল। দেশের মুক্তিদাতা সেনাবাহিনীর প্রতি এমন মনোভাব ভালো নয়। এ বিষয়ে অবগত হয়ে মংগল সিংহ প্রথমে নিরাশই হ'লো। চেৎ সিংহের সিংহাসন লাভের আশায় সে আসেনি, সে এসেছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাতে জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ ইংরাজ পুঁজিপতিদের শাসনের মতই অবাঞ্ছনীয় ছিল। কূপমণ্ডুকতাকে সংরক্ষিত করতে সে আসেনি। এসেছিল ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীব্যাপী সংকীর্ণ আবেষ্টনীকে ভেঙে তাকে বিশ্বের অভিন্ন অংশরূপে প্রতিষ্ঠা করতে। সে এসেছিল, ইংরাজ পুঁজিপতিদের শাসন এবং শোষণকে উঠিয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে এক সুন্দর জগৎ নির্মাণে নিযুক্ত করতে। কার্তুজের চর্বির মিথ্যা প্রচারকে সে কখনও সমর্থন করতে পারেনি এবং এর দ্বারা ভারতবর্ষে ধর্ম আবার তার শিকড় গেড়ে বসুক, তাও সে চায়নি। নানা এবং অপরাপর নেতারা সব চেয়ে দামী বিলাতী মদ উড়াত এবং সুযোগ পেলেই মদ আর মাংস খেয়ে খাসা গৌরাংগী সুন্দরীদের এঁটো ঠোঁট লেহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ত। কিন্তু এই সময় তারা ধর্ম রক্ষার জন্য সিপাহীদের নেতৃত্ব করতে চেয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত দোষ ত্রুটির সংগে যখন একটা বিষয় মংগল সিংহ চিন্তা করল, তখন আপন কর্তব্য স্থির করে ফেলতে তার দেরী হলো না। যুগপৎ ইংরাজপতি শাসক এবং ভারতীয় সামন্তদের গোলামীতে পিষ্ট হচ্ছিল ভারতবর্ষ, যার মধ্যে সব চেয়ে মজবুত এবং সব চেয়ে চতুর শাসন হলো ইংরাজের শাসন। এদের হটিয়ে দেবার পর শুধু স্বদেশী সামন্তদের সংগে যুঝতে হবে,—ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে যা অধিকতর সহজ কাজ।

জানুয়ারী মাস। রাত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ছিল, যদিও লণ্ডনের তুলনায় তা কিছুই নয়। বিঠুরে চারিদিকে নৈস্তব্ধ বিরাজ করছিল। কিন্তু পেশোয়ার প্রাসাদের প্রহরীরা স্ব স্ব স্থানে প্রহরারত ছিল। নিজেদের প্রভুর এক বিশ্বস্ত অনুচরের সাথে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে তারা মহলের ভিতর ঢুকতে দেখল। কিন্তু তারা আজকাল এমনি অপরিচিতদের প্রতিরাতেই মহলের ভিতর ঢুকতে দেখত।

নানার সঙ্গে মংগল সিংহের সাক্ষাৎ প্রথম নয়, কাজেই তারা একে অন্যকে বেশ ভালোভাবেই জানতো। এখানে নিজেকে ছাড়া দিল্লীর বৃত্তিভোগী বাদশাহ, অযোধ্যার নবাব, জগদীশপুরের কুমার সিংহ এবং অন্যান্য বহু সামান্তর দূত দেখতে পেল মংগলসিংহ। বজবজ (কলকাতা), দানাপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা মীরাট প্রভৃতি ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কতদূর প্রাবল্য লাভ করেছে তা' লোকের মুখে শোনা গেল। এটা আশ্চর্য্য হ'বারই কথা ছিল যে, এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে নিজের একটিও সৈন্য না রেখে এই সব সামন্ত শুধু বিদ্রোহী সৈন্যদের উপর সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, আর সৈনিক-বিদ্যার কথা ধরলে প্রায় সমস্ত নেতারাই

সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো। তবুও তারা নিজেবা জেনারেলের পদ অধিকার করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। অত্যন্ত আশাপূর্ণ স্বরে নানা বল্‌লো—

"ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব নির্ভর করছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর। আজ তাই আমাদের হাতে চ'লে আসছে।"

"কিন্তু সমস্ত ভারতীয় সৈন্যই আমাদের দিকে আসছে নানাসাহেব! পাঞ্জাবী শিখদের বিদ্রোহ করার কোন খবব এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। অপরপক্ষে অপরাপর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ইংরাজের পক্ষে লড়াই কবে যে ভাবে তাদের পাঞ্জাবকে পরাজিত করেছিল সে কথা স্মরণ কবে পাঞ্জাবীরা তাব প্রতিশোধই নিতে চাইবে। ইংরাজরাও বড হুঁসিয়ার নানা সাহেব। না হ'লে পেশোয়া এবং অযোধ্যাব নাবারের মত দলীপ সিংহকেও যদি তারা কোথাও নজরবন্দী করে রাখতো, তবে আজ সমস্ত শিখপল্টনকে আমাদেব স্বপক্ষে নিয়ে আসা খুবই সহজ হয়ে পডতো। যাহোক, আমাদের মনে রাখতে হবে শিখ এবং নেপাল দেশীয় রাজ্যসমূহের পল্টনেবা আমাদের দিকে নেই। আর দেশের জন্য এই যুদ্ধে যারা আমাদের পক্ষে নেই, তাদের বিরোধী বলে বুঝতে হ'বে আমাদেব।"

নানা বললে, "আপনার কথা ঠিকই ঠাকুব সাহেব। কিন্তু যদি সূচনাতেই আমবা সাফল্য লাভ করতে পারি, তো কোন দেশদ্রোহীরই আমাদের বিরুদ্ধে লডবাব মত সাহস হবে না।"

"আরও এক বিষয়ে আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। একাজ যুদ্ধ সুরু হলে করতে হবে অবশ্য। কিন্তু এখন থেকেই তাব জন্য জনসাধাবণকে তৈবী কবতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে আমরা দেশের মুক্তি-যোদ্ধা।"

পূর্বাঞ্চলের এক প্রতিনিধি বললো—

"আমরা ইংবাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবব এই ব্যাপাবটাই কি একথা বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

মংগলসিংহ—"সমস্ত জায়গাতেই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অস্ত্র ঝন্‌ঝন্‌ করবে না। আমাদের দেশে বহু সংখ্যক কাপুরুষ রয়েছে যারা ইংরাজেব অজেয়তা সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাবা নানা রকমের গুজব রটাবে। আমার তো মনে হয়, পূর্ব, পশ্চিম এবং মধ্য—এই তিন ভাগে ভাগ করে দেশের মধ্যে তিনিটি হিন্দী এবং উর্দু খবরের কাগজ আমাদের ছাপতে হবে।"

নানা সাহেব—"ইংরাজ কায়দা-কানুন আপনার বেশী পছন্দ ঠাকুর সাহেব কিন্তু আপনি দেখছেন কি, খবরের কাগজ ছাড়াই আমরা কার্তুজের ব্যাপার রটিয়ে কি ভাবে জনসাধারণকে তৈরী করেছি।"

মংগলসিংহ—"কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজের চাকরেরা আমাদের বিরুদ্ধে যে সব কথা রটাবে, তার জন্য কিছু করতে হবে নানা সাহেব, এটা সম্ভব নয় যে একদিনেই আমরা ইংরাজের গোটা শাসনযন্ত্রকে অধিকার করে নেবো। মনে করুন তারা গুজব রটিয়ে দিলো যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা—মনে রাখবেন আমাদের এই নামেই ডাকবে তারা—গ্রাম এবং শহর লুঠ করতে, ছোট ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে আসছে।"

নানা সাহেব—"একথা কি লোকে বিশ্বাস করবে?"

মংগলসিংহ—"যে কথা বারবার রটানো হবে এবং যে রটনার বিরুদ্ধে অন্য. কোনও আওয়াজ উঠবে না, সে কথা লোকে বিশ্বাস করতেই আরম্ভ করবে।"

নানাসাহেব—"আমার মনে হয়, কার্তুজের ব্যাপারে ধর্মদ্রোহী বলে ইংরাজদের এত বদনাম করে দিয়েছি যে তাদের কোন কথাই কেউ বিশ্বাস করবে না।"

মংগলসিংহ—"আমি কিন্তু সব সময়ের জন্য একে যথেষ্ট বলে মনে করিনি। যাই হোক, আরও এক কথা আছে। আমাদের এই লড়াইকে ইংরাজেরা নিছক বিদ্রোহ বলে প্রচার করবে। কিন্তু দুনিয়ায় আমাদের মিত্র এবং ইংরাজের শত্রু অনেকেই আছে, যারা আমাদের স্বাধীনতা কামনা করে—বিশেষ করে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে এ রকম বহু জাতি আছে। এইজন্য আমাদের এই লড়াইতে সমগ্র ইউরোপীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে জেহাদ্ রূপে আমরা দাঁড় করাবো না এবং শান্তিপূর্ণ ইংরাজ বাল-বৃদ্ধ-নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করবো না। কারণ এসব যুদ্ধ থেকে আমাদের কোনও লাভ হবে না, উল্টে দুনিয়া জুড়ে মিছামিছি ভারতবর্ষের বদনাম হ'য়ে যাবে।"

নানাসাহেব—"এ তো সেনাপতিদের মনে রাখবার কথা, আমি মনে করি, কোন সময়ে কি করতে হবে, এ সম্বন্ধে তারা নিজেরাই সঠিক সিদ্ধান্ত করতে সক্ষম।"

মংগলসিংহ—"সবশেষে আমি বলতে চাই যে যুদ্ধে সৈন্যরা নিজেদের প্রাণপণ করছে এবং যে যুদ্ধে আমরা জনসাধারণের কাছ থেকেও সাহায্য আশা করেছি, তাকে চর্বিযুক্ত কার্তুজের ঝগড়ায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নয়। আমাদের বলতে হ'বে ইংরাজদের তাড়িয়ে দিয়ে কি ধরণের রাজত্ব আমরা চালাতে চাই, সেই রাজত্বে যোদ্ধা-সৈন্য এবং যে কৃষক-শ্রেণী থেকে সৈন্যরা আসছে সেই কৃষককুল কি পাবে।"

নানাসাহেব—"ধর্মদ্রোহীদের শাসন উঠিয়ে দেওয়াই কি তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য পর্যাপ্ত নয়?"

"এ প্রশ্ন যদি আপনাকেই করা যায় তো কি জবাব দেবেন আপনি? আপনার মনে কি পেশোয়ার রাজধানী পুণাতে ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই? নবাবজাদার অন্তরে কি লক্ষ্ণৌর তখতের আকর্ষণ নেই? যখন আপনারা কার্তুজ এবং ইংরাজশাসন থেকে মুক্ত হবার চেয়েও বড় ইচ্ছা পোষণ করেন,—যার জন্য আপনারা জীবনকে বাজী রাখতে চলেছেন, তখন আমি মনে করি জনসাধারণের সামনেও ভবিষ্যত লাভের বিষয়েও কিছু কথা বলে রাখাটা ভালো হবে।"

"যেমন?"

"গ্রামে গ্রামে আমরা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করবো, যেখানে অল্পব্যয়ে লোকে ন্যায় বিচার লাভ করতে পারবে। সমগ্র দেশে আমরা একটি পঞ্চায়েত বানাবো, যাকে সমস্ত গ্রামের প্রজাসাধারণ নির্বাচন করবে এবং বাদশাহের উপরও যার ক্ষমতা থাকবে। জমিদারী প্রথা আমরা উঠিয়ে দেব এবং কৃষক আর সরকারের মাঝে কোন স্বত্বভোগী থাকবে না। জায়গীর যারা পাবে তারা শুধু সরকারকে দেয় খাজনাই আদায় করতে

পারবে জমি থেকে। আমরা কলকারখানার বিস্তার করে নিজেদের দেশের সমস্ত কারিগরকে কাজ দেবো, যাতে কেউ বেকার বসে থাকতে না পারে। সেচকার্য্যের জন্য নালা আর বাঁধ তৈরী করবো আমরা, যাতে কোটি কোটি মজুরের কাজ মিলবে, দেশের মধ্যে বহুগুণ বেশী তরিতরকারী জন্মাবে এবং কৃষকদের জন্য বহু নতুন জমি পাওয়া যাবে।"

মংগলসিংহের কথাগুলোকে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইলো না। সকলেই এই বলে এসব কথাগুলোকে চাপা দিয়ে গেল যে, এগুলো সব রাজত্ব হাতে আসবার পরের কথা।

খাটিয়ার উপর শোয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত মংগলসিংহের ঘুম এলো না। সে ভাবছিল, এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। রেল, তার, ষ্টীমারের যাদুকে স্বচক্ষে দেখেছে সে। দিয়াশালাই ফোটোগ্রাফী এবং বিদ্যুতের যুগে আমরা প্রবেশ করেছি; কিন্তু এই সব লোক পুরাণো যুগের স্বপ্ন দেখছে। তবুও এই ঘোর অন্ধকারের মাঝে একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। এই লড়াই শুধু জনসাধারণের শক্তি দিয়েই জয় করা হবে, এর ফলে জনতা আপন শক্তিকে চিনতে পারবে। বিলাতী পুঁজিপতিরা যেমন বিলাতের মজুর শ্রেণীর শক্তির সাহায্য নিয়ে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করে মজুরদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি এই ভারতীয় সামন্তরাও ভারতীয় জনতা—সৈন্যবাহিনী, কৃষককুলের সাথে কাজ শেষ হ'য়ে গেলেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু এরা জনসাধারণের মন থেকে তাদের আত্মবিশ্বাসকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, বাহিরের শত্রুর কাছ থেকে বাঁচবার জন্য বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের কাজে লাগাকেও অস্বীকার করতে পারে না। রেল লাইন, টেলিগ্রাফের লাইন, কলকাতায় প্রস্তুত ষ্টীমার—এখন আর ভারত থেকে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারে না। মংগলসিংহের বিশ্বাস এই কালাতীত সামন্তদের উপর ন্যস্ত হয়নি, পৃথিবীতে মানব সমাজের পরিবর্তনকারী শক্তি জনতার উপরেই তার বিশ্বাস রয়েছে শুধু।

৩

১০ই মে (১৮৫৭ খৃঃ) মংগলসিংহ মিরাটের কাছে ছিল, যখন সেখানে সৈন্যরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াল। বাহাদুরশাহের প্রতিনিধির নামে একটা বাহিনীকে সে নিজের অধীনে রাখবার সুযোগ পেল। সামন্ত নেতাদের মংগলসিংহের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু সেই সংগে এও তারা ভাবতো যে তার উদ্দেশ্য তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এই জন্য তাকে দিল্লীর দিকে না পাঠিয়ে, পূর্বদিকে পাঠিয়ে দিল। তারা কেউ ভাবতে পারেনি, মিরাটের পূব আর পশ্চিম থেকে বেরুনো এই রাস্তা ভারতবর্ষের ওই মুক্তি যুদ্ধের ভাগ্যে কোন পৃথক ফল প্রসব করবে না। দিল্লীর দিকে ধাবিত সৈন্যদের

মংগল সিংহের মত নেতার প্রয়োজন ছিল—সে দিল্লীর প্রতিষ্ঠাকে পূর্ণভাবে যুদ্ধ-জয়ের কাজে লাগাতে পারবে।

মংগল সিংহের বাহিনীতে এক হাজার সৈন্য ছিল, তারা বিদ্রোহের দিন থেকেই ভাবতে আরম্ভ ক'রেছিল যে, 'আমরা সকলেই জেনারেল' এদের এই কথাটা বোঝাতেই মংগল সিংহের এক সপ্তাহ লেগে গেল যে, শুধু জেনারেলের বাহিনী কখনও জিত্‌তে পারে না। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মংগল সিংহ ছাড়া উচ্চ সৈনিক বিদ্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। আর এই একই ব্যাপার সমগ্র বিদ্রোহী সৈন্য বাহিনীতে বর্তমান ছিল, এক জায়গায় স্থির থেকে শিক্ষা দেবার সুযোগ মংগল সিংহের ছিল না! সেই সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, অধিক থেকে অধিকতর জেলায় ইংরেজ শাসনকে দ্রুত ধ্বংস করবার।

গঙ্গা পার হ'য়ে রোহেলখণ্ডে প্রবেশ করেই প্রত্যেক রাতে সৈন্যদের কাছে নিয়মিতভাবে তার রাজনৈতিক আদর্শের কথা প্রচার করতো মংগল সিংহ। সৈন্যদের বুঝতে কিছু বেশী সময় লাগল, তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ জাগত, মংগল সিংহ সেগুলো দূর ক'রে দিত, এরপর মংগল সিংহ ফ্রান্সের দু'টো বিপ্লবের ইতিহাস (১৭৯২, ১৮১৮ খৃঃ) শোনাল, এও বলল যে, কি ক'রে ওয়েল্‌সের মজুর শ্রেণী ভারত-শাসক এই ইংরাজ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রেছিল, এবং অসীম কৃতিত্বের সংগে ল'ড়েছিল, নিজেদের সংখ্যা বলের সাহায্যে পুঁজিপতিরা তাদের দমন ক'রতে পেরেছিল, কিন্তু তা'দের বিজয়ী অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে তারা পারেনি।

এই সব শুনে যুদ্ধরত এই সৈন্যদের আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। এদের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সাধক হ'য়ে উঠল, তারা গ্রামে, শহরে, নগরে গিয়ে কথায় এবং আচার ব্যবহারে লোকের মনে বিশ্বাস এবং সম্মানের উদ্রেক ক'রতে লাগ্‌ল। ইংরাজদের খাজনার প্রতিটি পয়সা ঠিক মত ব্যয় করা। প্রয়োজন হ'লে লোকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা, কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত কায়েম ক'রে তার কাছ থেকে এবং লোককে বুঝিয়ে তাদের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে কোন জিনিষই বিনামূল্যে না নেওয়া এবং প্রত্যেকটি জায়গায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে মংগল সিংহের বক্তৃতা—এসব এমনই ব্যাপার ছিল, যার প্রভাব খুব শীগ্‌গীরই পরিলক্ষিত হ'তে লাগ্‌ল। দলে দলে তরুণরা স্বাধীনতার সৈন্য দলে ভর্তি হ'বার জন্য আস্‌তে লাগল।

মংগল সিংহ শুধু সৈনিকের শিক্ষা ব্যাপারে প্যারেডই নয়, গুপ্তচর, রসদসংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দিতে লাগ্‌ল, হাকিম এবং বৈদ্যের এক বাহিনীও সে নিজের সাথে রাখ্‌ল। সামন্তশাহী লুঠতরাজ এবং দুর্নীতির পংককে পরিষ্কার করবার জন্য শিক্ষিতদের মধ্যে অতিরিক্ত দেশভক্তি জাগান প্রয়োজন ছিল আর এই সময়ে তা' করা সহজ ছিল না। তবুও যে কেউ দুটো দিনও মাত্র মংগল সিংহের সংগে থেকে গেছে, সে তার দ্বারা প্রভাবিত না হ'য়ে পারেনি। সিপাহীদের মধ্যে মংগল সিংহকে হেসে হেসে কথা বলতে দেখে কেউ বল্‌তে পারত না যে, শেষ পর্য্যন্ত তার সৈন্য সংখ্যা দু'হাজার অবধি পৌঁছেছিল। অত বড়

পল্টনের জেনারেল ছিল সে, সংগে সংগে তা'র ইংগিতে প্রাণ দেবার জন্ত পল্টনদের প্রত্যেকটি প্রাণ সদা প্রস্তুত ছিল মংগলসিংহ সবসময়েই সিপাহীদের সেঁকা রুটী খেত, সব সময়ে তাদেরই মত কম্বলে শয়ন করত আর বিপদের সময় সকলের আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বন্দী ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ-কে সে যথেষ্ট আরামে রেখেছিল। তারাও সেনাপতির ভদ্র আচরণ দেখে বিস্মিত হতো, কারণ ঐ সময়ে ইউরোপেও কয়েদীদের সংগে এই ধরণের ব্যবহার দেখা যেত না। মংগল সিংহ রুহেলখণ্ডের চারটি জেলায় গেল এবং সব জায়গাতেই সুন্দর ব্যবস্থা সম্পাদন ক'রল।

নানা সাহেব ৫ই জুন (১৮৫৭ খৃঃ) ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রলো এবং দেড়মাস না যেতেই ১৮ই জুলাই ইংরাজের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হ'লো তাকে। হাওয়া ঘুরে গিয়েছিল—এটা বুঝতে মংগল সিংহের দেরী হ'লো না, তবুও আজাদীর পাণ্ডাকে জীবিতাবস্থায় প'ড়ে যেতে সে দিল না। ইংরাজের সৈন্তরা অযোধ্যার নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করতে শুরু ক'রল, স্ত্রীলোকের প্রাণ মান ইজ্জত পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে ফেল্‌ল, এই সব শুনেও মংগলসিংহ এবং তার সংগীরা কোন বন্দী ইংরাজের দেহে হস্তক্ষেপ ক'রল না।

বর্ষা শেষ হ'তে না হ'তে সব জায়গাতেই বিদ্রোহীদের হাত থেকে অস্ত্র খ'সে পড়ল, কিন্তু রুহেলখণ্ড এবং পশ্চিম অযোধ্যায় মংগলসিংহ অস্ত্র উঁচিয়ে রাখল। চারিদিক থেকে ইংরাজ, গুর্খা এবং শিখ সৈন্তরা তা'র উপর আক্রমণ চালিয়ে চলেছিল। মুক্তিসেনার সংখ্যা দিনে দিনে ক'মে যেতে লাগল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেককে বাড়ী পাঠিয়ে দিল মংগল সিংহ, কিন্তু মিরাট থেকে তার সংগে আগত একহাজার সৈন্তের মধ্যে কেউই তার সংগ ছাড়তে রাজী হ'ল না। অবশেষে মংগল সিংহ এমন এক ব্যাপার দেখল যা মৃত্যুকেও আনন্দময় ক'রে তুললো তার কাছে। প্রাণ দেবার তাগিদে তার এই ছোট বাহিনীতে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাঠ, গুর্জর, হিন্দু-মুসলমানের সকল ভেদাভেদ চলে যেতে লাগল। সকলে একসাথে রুটি বানাতে লাগল এবং একসাথেই খেতে লাগল। এইভাবে তারা ভারতবর্ষের এক-জাতিত্বের উদাহরণ স্থাপন করল।

বিন্দাসিংহ, দেবরাম, সদাফল পাণ্ডে, রহিম খাঁ, গুলাম হোসেন—মিরাটের এই পাঁচ সিপাহী মংগল সিংহের সাথে শেষ পর্যন্ত র'য়ে গিয়েছিল—যখন গঙ্গায় দু'দিক থেকে তার নৌকা আক্রান্ত হ'য়েছিল বন্দী ইংরাজ নরনারীদের অনুরোধে ইংরাজ জেনারেল ক্ষমা ঘোষণা ক'রে এই চাইল যে, মংগল সিংহ আত্মসমর্পণ করুক, কিন্তু সে কিছুতেই তাতে রাজী হ'ল না। আজও তাকে বলা হ'ল, কিন্তু গুলির সাহায্যে সে এর জবাব দিল। অবশেষে দুটি মৃতদেহ নিয়ে যখন গংগার বুকে তাঁর নৌকা ব'য়ে চল্‌ল, তখন তাকে বন্দী করা হ'ল। ইংরাজেরা তখন ভারতের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল।

সফ্দর

কাল : ১৯২২ খৃষ্টাব্দ

ছোট অথচ সুন্দর এক বাংলো। বিশাল প্রাংগণের এক ধারে লাল এবং গোলাপী রংএর বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে। একদিকে ব্যাড্মিণ্টন খেলবার ছোটমত জায়গা—তার সবুজ ঘাসগুলোর উপর দিয়ে নিছক বেড়িয়ে বেড়ানোই এক আনন্দের বস্তু। তৃতীয় দিকে এক লতামণ্ডপ এবং চতুর্থ দিকে, বাংলোর পেছনে এক খোলা বারান্দা, সন্ধ্যার সময় প্রায়ই সেখানে সফ্দর জং বসে থাকেন।

বাংলোর বাইরের দেয়ালে সবুজ লতা সব বেয়ে উঠেছে। সফ্দর সাহেব অক্সফোর্ডে এমনি লতামণ্ডিত গৃহ দেখেছিলেন, তাই নিজের বাংলো প্রাংগণে মনোরমভাবেই এ গুলোকে লাগিয়েছেন, এ ছাড়া দুটো মোটরের গ্যারেজ ও রয়েছে। সফ্দর জংএর হাল-চাল, তাঁর বাংলোর আবহাওয়া সব-কিছুতেই হুবহু ইংরেজী ঢং। আধ-ডজন চাকর বাকর তাঁর—ইংরেজ অফিসারের চাকরের মতই তাদের আদব-কায়দা সব। কোমরে লালপটি, আঁটো করে বাঁধা পাগড়ীতে নিজ সাহেবের নাম-চিত্র (মনোগ্রাম)। খাওয়ার ব্যাপারে বিলিতি খানাই ছিল সফদর সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় এবং খানসামাও সেজন্য রাখা হয়েছিল তিনজন।

সফ্দর তো সাহেব ছিলেনই, সাকিনাকেও চাকর-বাকর সবাই মেমসাহেব বলে ডাকতো সর্বদা। সাকিনার ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূর অতিরিক্ত রোমরাজি কামিয়ে ফেলে তাদের আরও সূক্ষ্ম করে রাখা হয়েছে এবং কলপ দিয়ে করা হয়েছে আরও কালো। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর লিপষ্টিকে ঠোঁট রাঙানো তাঁর অভ্যাস। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বিলিতি মেয়েদের পরিচ্ছদ কখনই পছন্দ করতেন না সাকিনা।

গত বছর (১৯২০ খৃঃ) নিজের স্ত্রীকে সংগে নিয়ে যখন বিলেত যান সফ্দর সাহেব। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে সাকিনাও স্কার্ট-পেটিকোট পরুন। সাকিনা কিন্তু এতে রাজী হতে পারেননি। আর বিলেতে নরনারীরা সাকিনার সৌন্দর্যের সাথে সাথে তাঁর বেশভূষারও যে রকম তারিফ করেছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত সফ্দরেরও আর কোন আফ্শোষ ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দুজনের গায়ের রঙই এত পরিষ্কার যে য়ুরোপে সবাই তাঁদের ইটালীয়ান বলে মনে করত।

১৯২১ এর শীত-কাল। উত্তর ভারতের সমস্ত শহরের মত লক্ষ্ণৌতেও শীতকালটাই সবচেয়ে সুন্দর। সফদর সাহেব আজ কাছারী থেকে ফিরেই বাংলোর পিছনের বারান্দার বেতের চেয়ারে এসে বসেছেন। তাঁর মুখমণ্ডল আজ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। সামনে তাঁর ছোট একটি টেবিল, টেবিলের উপর তাঁর নোটবই এবং আরও দুতিন খানা বই পড়ে রয়েছে। পাশেই আরও তিনখানা খালি চেয়ার। সফ্দরের পরণে কড়া-ইস্ত্রী

করা প্রথমশ্রেণীর ইংরেজী স্যুট্। তাঁর গোঁফদাড়ী বিহীন মুখের এই সময়কার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, সাহেব আজ কোন গুরুগম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছেন। এই রকম সময়ে চাকর বাকরেরা খুব কমই আসতো তাদের মনিবের সামনে। সফ্‌দর সাহেবকে রাগ করতে অবিশ্যি ক্বচিৎ কখনো দেখা যেত, কিন্তু চাকর-বাকরেরা ধরে রেখেছিল যে এরকম সময় সাহেব একলা থাকতেই ভালো বাসেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, কিন্তু সফ্‌দর ঐ একই আসনে বসে রয়েছেন। একজন চাকর তার জুঁড়ে টেবিল ল্যাম্প এনে রাখল সামনে। বাংলোর দিক থেকে কার যেন আগমন আভাষ পেলেন সফ্‌দর। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, মাষ্টার শংকরসিংহ ফিরে চলেছেন। দৌড়ে গিয়ে মাষ্টারজীকে ডেকে আনবার আদেশ দিলেন সফ্‌দর।

মাষ্টার শংকরসিংহের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে তাঁর চেহারায়, তাঁর পরণে গলাবন্ধ কালো পায়জামা, মাথায় গোল ফেল্ট টুপী, ঠোঁটের উপর ঝুলে পড়া ঘন কালো গোঁফে তারুণ্যের কোন চিহ্নই নেই। যদিও তাঁর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে তাঁর ভিতর প্রতিভা আছে।

মাষ্টারজী পৌঁছুতেই সফদর উঠে তাঁর হাত ধরলেন এবং তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে বল্‌লেন—"শংকর, আজ তুমি আমার সংগে দেখা না ক'রেই ফিরে যাচ্ছিলে?"

"ক্ষমা কর ভাই সাহেব, আমি ভেবেছিলাম যে তুমি একলাই কোন কাজে ডুবে র'য়েছ।"

"মোকর্দ্দমার দলিলপত্রে একেবারে ডুবে থাকলেও আমার কাছে তোমার জন্য দু'মিনিট সময় থেকে যায়, আর আজ তো আমার সামনে দলিলপত্র নেই-ই কোনও।"

শংকর সিংহের প্রতি সফদরের নিবিড় স্নেহ ছিল, অপর কাউকেই তিনি তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করতেন না। সৈদপুর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'য়ে লক্ষ্ণৌতে বি, এ পাশ করা পর্যন্ত দু'জনেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় কখন কেউ দু'চার নম্বর বেশী পেতেন, কখন বা কম। কিন্তু যোগ্যতার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাঁদের মধ্যে কখনও ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। একটি ব্যাপার দু'জনের বন্ধুত্বকে নিবিড় ক'রে তুলতে আরও সাহায্য করেছিল। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন গৌতম-রাজপুত, যদিও আজ একজনের পরিবার হিন্দু, আর একজনের মুসলমান। কিন্তু দশ পুরুষ আগে এই দু'টো পরিবার শুধু যে হিন্দুই ছিল তা' নয়, উপরন্তু দু'টো বংশই পূর্ব্বজে গিয়ে মিলে যেত। বিশেষ বিশেষ কারণে সংঘটিত পারিবারিক মিলন-সভাগুলোতে এখনও দুই পরিবারের লোককে একত্রিত হ'তে দেখা যায়।

সফ্‌দরই তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। একজন ভাই-এর অভাব তাই খুবই অনুভব করতেন তিনি। আর সেই অভাব পূরণ করেছিলেন শংকর, যদিও সফ্‌দরের চেয়ে ছ'মাসের ছোট ছিলেন তিনি। কিন্তু এসব ত গেল বাইরের ব্যাপার। এগুলো ছাড়াও শংকরের মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল যার জন্য পাকা-সাহেব সফ্‌দর সাদাসিধে শংকরের প্রতি এতটা স্নেহপরায়ণ এবং শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শংকর ছিলেন অত্যন্ত নম্রপ্রকৃতির

কিন্তু খোসামদ করতে তিনি মোটেই জানতেন না। তার ফলে, প্রথম শ্রেণীতে এম, এ, পাশ করেও আজ তিনি সরকারী স্কুলের সামান্য শিক্ষকই শুধু হতে পেরেছেন। যদি সামান্য একটু ইংগিত করতেন তবে অপরে তাঁর জন্য সুপারিশ করতে পারত এবং আজ তিনি কোন হাইস্কুলের হেড্মাস্টারই হয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়, সারাজীবন সহকারী শিক্ষক হয়েই থাকতে চান তিনি। হ্যাঁ, একবার অবিশ্যি বন্ধুর সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি, লক্ষ্ণৌর বাইরে যখন বদলী করা হয়েছিল তাঁকে। বিনয়ের সংগে সংগে আত্মসম্মানবোধও শংকরসিংহের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, যাকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করে চলতেন সফ্দর সাহেব। বারো বছর বয়সের সময় স্থাপিত এঁদের বন্ধুত্ব আজ বিশ বছর পরেও ঠিক তেমনিই আছে।

একথা সেকথা করে দুটো চারটে কথাবার্তার পরই সোনালী ধানের রংয়ের শাড়ী এবং লাল ব্লাউজ পরিহিতা সাকিনা এসে হাজির হলেন। শংকর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"নমস্কার বৌদি!"

মৃদু হেসে 'নমস্কার' বলে জবাব দিলেন বৌদি। এমন একসময় ছিল যখন ধনী 'স্যার'-এর গ্রাজুয়েট দুহিতা সাকিনার কাছে এই গেঁয়ো আকৃতির শিক্ষক শংকরের সাথে বন্ধুত্ব অত্যন্ত খারাপ লাগত। পিত্রালয়েও সাকিনা কোন দিনই পর্দার আড়ালে থাকেননি, কাজেই শংকর সিংহের সামনে আসা না আসার কোন প্রশ্নই ওঠেনি কখনও। কিন্তু সফ্দরের সাথে শংকরকে নিঃসঙ্কোচে কাজ করতে দেখলেই প্রথম মাস ছয়েক পর্যন্ত ভ্রূ কুঁচকে থাকতো সাকিনার। পরিশেষে সফ্দরের কাছে তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে শংকর বাস্তবিকই স্নেহ-সম্মানের পাত্র। আর বর্তমানে ত শংকরের সাথে খাঁটি দেওর-বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন সাকিনা। নিজেকে তিনি স্বেচ্ছায়ই সন্তানহীনা করে রেখেছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি শংকরের শিশুপুত্রকে কাছে এনে রাখতেন। এদিকে গত ছ'বছর থেকে শংকর বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর উপর ভগবান শংকরের কৃপা হয়েছে। তাঁর ঘরে দুবছরের কম বয়সের কোন না কোন শিশু সব সময়েই বয়ে যাচ্ছে এই ছ'বছরে।

গত এক সপ্তাহ ধরে সফ্দরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য সাকিনাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। আজ শংকরকে দেখে তিনি বড়ই খুশী হলেন। কেননা তিনি জানতেন যে সাহেবের মনের ভার লাঘব করতে একমাত্র শংকরের সাহায্যই প্রয়োজন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সাকিনা বললেন, "ঠাকুরপো, আজ তোমার তাড়া নেই ত কোন? বৌদির হাতের চকোলেট পুডিং কেমন লাগবে তোমার?"

সফ্দর—"এ আর জিজ্ঞেস করবার দরকার কী?"

সাকিনা—"প্রথমে আমি জেনে নিতে চাই ঠাকুরপো কখন যাবেন। তাঁর চলে যাবার ত কোন ঠিক নাই!"

শংকর—"আমার সম্বন্ধে এমন কথা বলো না বৌদি। এমন একটিবারের কথাও বল ত দেখি, যখন, তোমার হুকুম মানতে আমি অস্বীকার করেছি?"

সাকিনা—"হুকুম না মানার কথা বলছি না ঠাকুরপো, কিন্তু হুকুম শোনার আগেই সরে পড়া সেও ত এক অপরাধ।"

শংকর—"আমার হুকুমদার বৌদির হুকুম শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত।"

সাকিনা—"আচ্ছা যাচ্ছি তাহলে। এখান থেকে খাবার এবং পুডিং খেয়ে যেতে হবে তোমাকে।"

তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন সাকিনা। সফ্‌দর এবং শংকরের বাক্যালাপও গম্ভীর রূপ ধারণ করল।

সফ্‌দর বললেন,—"সম্পূর্ণ নূতন এক বৈপ্লবিক যুগে আমরা প্রবেশ করেছি শংকর, আমার মতে ১৮৫৭খৃষ্টাব্দের পর এইই প্রথম সমগ্র ভারতভূমির ভিতশুদ্ধ টলমল করে উঠেছে।"

"এই রাজনৈতিক আন্দোলনের কথাই ত তুমি বলছ ভাই।"

"রাজনৈতিক আন্দোলন কথাটা অত্যন্ত সাধারণ শংকর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হল, যখন তা ইংরেজ আই-সি-এস পেনশনারদের কৃপার বস্তু ছিল, তখনও কংগ্রেসের বড়দিন-উৎসবের বক্তৃতা এবং সুরাপানকে 'আন্দোলন' আখ্যাই দেওয়া হতো। তুমিও যদি তাকেই আন্দোলন বলতে চাও ত আমি বলব, আন্দোলনের যুগ থেকে আমরা এখন বিপ্লবের যুগে প্রবিষ্ট।"

"যেহেতু গান্ধীজী তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ডের জন্য এককোটি টাকা তুলেছেন এবং স্বরাজের দাবী নিয়ে খুব হৈ-চৈ সুরু করেছেন?"

"কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি বিপ্লব অথবা বিপ্লবী আন্দোলনের আধার হতে পারে না শংকর। যে বিরাট পরিবর্তন বিপ্লব বয়ে আনে, তাও একআধ ডজন মহাব্যক্তির সামর্থ্যের বাইরে। আজকের এই আন্দোলনের মূল ধরে যখন আমি বিশ্লেষণ করি, তখন এমনি এক সিদ্ধান্তেই আমাকে পৌঁছুতে হয়, তুমি ত জানো শংকর, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ছিল পদচ্যুত সামন্ত প্রভুরা, কিন্তু সে যুদ্ধ চলেছিলো সাধারণ লোকেরই প্রাণের বিনিময়ে। আমাদেরই এক দুর্বলতার জন্য আমরা সফল হতে পারিনি তখনকার সে যুদ্ধে, পরাজিতদের উপর কঠোর প্রতিশোধ নিল ইংরেজরা। সে যাক্, আমি বলতে চাই যে ১৮৫৭র পরে এই প্রথম দেশের সমগ্র জনসাধারণকে স্বাধীনতার যুদ্ধে একতাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসের একজন কৃতী ছাত্র হয়ে তুমিই বল, এমন আর একটিও আন্দোলনের কথা তোমার জানা আছে, সমগ্র জনতাই অংশ গ্রহণ করেছে যাতে?"

"ভাই, সফ্‌দর, নাগপুর কংগ্রেস (১৯২০) এবং কলকাতা কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে যে উত্তেজনার কথা তুমি বলছো, তা আমিও নিজের চোখেই দেখেছি এবং তাকে বিস্ময়কর বলেই স্বীকার করছি আমি। কিন্তু প্রচণ্ড এই ঝড়ের পরও এই লক্ষ্ণৌতেই বহুবার বিদেশী কাপড়ের স্তূপ পুড়ে যাবার পরও তোমার কান পর্য্যন্তই পৌঁছোয়নি তা, আর আজ এমনভাবে কথা বলছো তুমি, যেন বিপ্লবের পাকেচক্রে তুমি জড়িয়ে পড়েছ একেবারে।"

"তোমার কথা ঠিকই ভাই শংকর। সত্যিই এই বিপ্লবের ঢেউ যেন দেহ থেকে আমার পা-দুটোকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। কিন্তু এই বিপ্লব-তরংগকে ছোট রকমের এক স্থানীয় ঘটনা বলে আমি মনে করি না। বরঞ্চ এ এক বিরাট অভ্যুত্থানের সংগে যুক্ত হয়েই প্রকট হয়ে উঠেছে। সমস্ত যুগেই সবচেয়ে বড় বিপ্লবী শক্তি জনতাকে আশ্রয় করেই প্রকট হয়ে ওঠে।"

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে তুমি আরম্ভ করলে ভাই, মস্তবড় জাল ছড়িয়ে বসছো যে!"

"সে কেন; তাহলে আমি বলবো শংকর?"

"বল, আমি শুনবো, বৌদি ত পুডিং তৈরীই করছেন, আর কাল হলো রবিবার। কেউ গিয়ে শুধু বাড়ীতে খবর দিয়ে এলেই হলো যে শংকর এই লক্ষ্ণৌতে বেঁচেই আছে এবং তার বৌদির হাতের পুডিং খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ব্যস্ তারপর সারারাত ধরে নিশ্চিন্ত হয়ে শুনতে পারবো আমি।"

"শংকর, অক্সফোর্ডে আমার জীবনের অর্ধেক আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছিলো শুধু তুমি সংগে না থাকার দরুণ। সে যাক্, শুধু আমিই নই, ভারতের বাইরে সমস্ত জায়গার রাজনীতির ছাত্ররা স্বীকার করে যে গত শতাব্দী এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে সকল পরিবর্তনই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পৃথিবীর অপরাপর রাজশক্তির গতিবিধি দ্বারা, আর এই সব পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে মুখ্যতম আর্থিক কারণ। ১৮৫৭র ঢেউ চলে যাবার পর আমাদের দেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল একেবারে অর্থাৎ আমাদের গতি তখন এত শ্লথ হয়ে গিয়েছিল যে তাকে ঐ ঘুমিয়ে পড়া আখ্যাই দিতে হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশে বিরাট সব পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেল। এক হাজার বছর আগে রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়া ইটালী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে (২রা এপ্রিল তারিখ) একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হল, এবং ম্যাজিনী গ্যারিবল্ডীর মত অতবড় আদর্শ আমাদের উপহার দিলো। রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেও যে জার্মানজাতি নিজেদের একত্রিত করতে পারেনি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তারা আংশিক ভাবে এবং ফ্রান্স বিজয়ের পর ১৮৭০এ (তারিখ ১৮ জানুয়ারী) প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এই পরিবর্তনকে পৃথিবীর এক বিরাট পরিবর্তন বলে বুঝতে হবে। এইটুকু করবার পর, ফ্রান্সের বিশাল শক্তিকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পরাস্ত করে প্যারিস্ এবং ভর্সাইর উপরেও জার্মানী তার ধ্বজা উড়াতে পেরেছিল, যার ফলে ইংলণ্ড এবং রাশিয়া ভীত হয়ে বার্লিনের উপর লক্ষ্য রাখতে লাগল। এটা ত হল বাইরের ভীতির ব্যাপার! কিন্তু এর চেয়েও বড় ভয় তাদের হল প্যারীর শ্রমিক রাজ্য প্যারী-কমুনকে দেখে—দোসরা এপ্রিল থেকে দেড়মাসের কিছু বেশী টিঁকেছিল যা এবং প্রমাণ করে দিয়েছিল যে শুধু জমিদার পুঁজিপতিই নয়, শ্রমিকেরাও রাজ্যশাসন করতে সক্ষম।"

"তুমি কি মনে কর ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীও এসবের সংগে জড়িত?"

"রাজনৈতিক ঘটনাই শুধু নয়, আমাদের ইংরেজ শাসকবৃন্দের ভারত সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের উপর এর প্রভাব বিদ্যমান। য়ুরোপে জার্মানীর মত এক দুর্জয় শক্তির উদ্ভব হতেই ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রইল না। কারণ জার্মানী থেকেই এখন তার যত বিপদের আশংকা। মৃত প্যারী কমুন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া বাদে জার্মানীর সকল রাষ্ট্রের মিলিত এক জীবন্ত যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রাজতান্ত্রিক শাসকবৃন্দের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, একথা আর বলে দেবার দরকার হয় না। একই সংগে এই সময় আরও পরিবর্তন সাধিত হল। ১৮৭০খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সামান্য ব্যবসায়ী থেকে পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হয়। কাঁচামাল কেনা থেকে আরম্ভ করে উৎপাদিত পণ্য বাজারে ছাড়া পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই মুনাফাশিকারের একচেটিয়া ব্যবস্থা পাকা করে নেয়। ব্যবসাতে শুধু কারিগরের কাছ থেকে মাল খরিদ করে এদিক সেদিকে বেচে ফিরলে লাভ হয়। কিন্তু পুঁজিবাদে প্রতিটি পদক্ষেপেই লাভ। তুলা কিনতে গিয়ে লাভ, পরিষ্কার করিয়ে বস্তা বন্দী করাতে লাভ, রেলে এবং জাহাজে চাপিয়ে নিযে যেতে পারলে লাভ, ম্যানচেষ্টারেব মিলে সুতা-কাটা এবং কাপড় বোনায় লাভ, আবার তৈরী কাপড় জাহাজে করে ফিরিয়ে আনতে, জাহাজ কোম্পানী থেকে লাভ, রেলের লাভ—এই সমগ্র লাভের তুলনা করো কারিগরের হাতে বোনা মাল বিক্রি করা ব্যবসায়ীর লাভের সংগে।"

"হ্যাঁ, ব্যবসা থেকে পুঁজিবাদে লাভ ত নিশ্চয়ই বেশী।"

"১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ভার্সাইতে বিজয়ী জার্মানী প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়মকে সমগ্র জার্মানীর কাইজার (সম্রাট) বলে ঘোষণা করল, তার পরের বছর (১৮৭২) ফেঁপে ওঠা ইংরেজ পুঁজিপতি—টোরিগণ—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ইহুদী ডিস্‌রেইলীর মারফৎ সাম্রাজ্যবাদের ঘোষণা করল। এই ঘোষণা শব্দগতই ছিল না, অত্যন্ত বাস্তব সাপেক্ষ ছিল। ফ্যাক্টরীসমূহ এত বেড়ে উঠেছিল যে তার জন্য সুরক্ষিত বাজারের প্রয়োজন হল। এমন সব বাজার, যেখানে জার্মানী এবং ফ্রান্সের তৈরী মালের সংগে প্রতিযোগিতার ভয় নেই। অর্থাৎ যেসব বাজারের ইজারাদারী সম্পূর্ণ নিজের হাতের মুঠোয় থাকবে। এরই সংগে সংগে পুঁজিও এতটা ফেঁপে উঠেছিল যে তাকে মুনাফা-মৃগয়ায় খাটাবার জন্যও প্রয়োজন হল সুসংরক্ষিত স্থানের।—অপর দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পারলেই শুধু এই সব কার্য্যসিদ্ধ হতে পারে। ডিজ্‌রেইলীর অভিধানে এই সবই ছিল সাম্রাজ্য শব্দের অর্থ। ভারতবর্ষে এই দুই বিষয়েই সুবিধা ছিল, আর য়ুরোপ থেকে ভারতে আসবার সবচেয়ে সস্তা এবং সহজ পথ ছিল সুয়েজ খাল—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যাকে কাটা হয়েছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিশরের খদীরের ১,৭৭.০০ শেয়ার চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে টেলিগ্রামে খরিদ করে নিলো ডিস্‌রেলী, সাম্রাজ্য বিস্তারে এটা হল দ্বিতীয় পদক্ষেপে। তারপর ১৮৭৭ এর ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে দরবার বসিয়ে রাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষণা করে ডিস্‌রেইলী সরকার সাম্রাজ্যবাদকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে গেল যে উদারনৈতিক দলের গ্ল্যাড্‌ষ্টোন মন্ত্রী হবার পরও ডিস্‌রেইলীর নীতি পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হল না।"

"আমরা ত এখন পর্যন্তও ছাত্রদের এইই পড়াই যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী—কাইজার-ই-হিন্দ্ উপাধি ধারণ করে ভারতবর্ষকেই ধন্য করেছেন।"

"মনে রেখ ছ'বছর আগে প্রুশিয়ার রাজাও এই কাইজার উপাধি ধারণ করেছিল। কাইজারের নাম এজন্য খেলো হয়ে পড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে পরিত্যক্ত হয়ে পড়া শব্দের মূল্য হঠাৎ কেমন বেড়ে উঠল।"

"রোমান শব্দ কাইজারকে শুধু ভারতবর্ষেই ব্যবহার করা আর ইংরেজীতে তার জায়গায় 'এম্প্রেস্' ব্যবহার করা, এর ভেতর আবার রহস্য নেই ত কোন ?"

"থাকতে পারে! যাইহোক, কাইজার শব্দের সংগে সংগেই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রবিষ্ট হয়েছি। প্রথমে এল ইংলণ্ড। পরাজিত প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তুনিসের (আফ্রিকা) উপর অধিকার কায়েম করে সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরল। আর নতুন ফ্যাক্টরী এবং পুঁজিপতিদ্বারা সুসমৃদ্ধ জার্মানীও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশের দাবী উত্থাপন করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হল।"

"কিন্তু ভারতে ইংরেজের নীতি পরিবর্তনের সাথে এগুলোর কী সম্বন্ধ বল ত ?"

"নিত্য-নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্র ক্রমবর্ধমান কারখানা এবং সেগুলি থেকে উৎপাদিত পুঁজিদ্বারা মুনাফাশিকারের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। ১৮৭৪-৮০ খৃষ্টাব্দের ভিতর ডিস্‌রেইলী মন্ত্রীসভা তা সম্পাদন করে ফেলল। ১৮৮০-৯২ পর্যন্ত অবস্থিত অনুসৃত গ্লাডষ্টোন সরকারও ডিস্‌রেইলীর পথ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে সমর্থ হল না। পুঁজির নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী দানবতাকে কিছুটা ভদ্রবেশ পরাবার প্রযোজন ছিল, যাতে জনসাধারণ সতর্ক হয়ে উঠতে না পারে। এইজন্যই ডিস্‌রেইলী "ভারত সম্রাজ্ঞীর" অভিনয়ের অবতারণা করেছিল। এরপর প্রয়োজন হল উদারনৈতিকদের আরও কিছুটা উদারতা দেখানো। এই উদারতা নেমে এল আয়র্লণ্ডের 'হোম রুল' রূপে। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের প্রশ্ন আজ পর্যন্তও ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। উদারতার সুযোগ নিয়েই আমরা ভারতীয়রা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিজেদের কংগ্রেসকে দাঁড় করালাম। কংগ্রেস বস্তুত: ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলের ধর্মপুত্র রূপেই জন্মলাভ করল, এবং একযুগ পর্যন্ত আপন ধর্মকে সস্নেহে রক্ষা করল সে। কিন্তু ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত দশ বছরের জন্য ব্রিটেনে পুনরায় টোরি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, এলগিন্ এবং কার্জনের মত সুযোগ্য সন্তান ভারতবর্ষে পাঠাল তারা। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্ আরও সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করল। কিন্তু হল উল্টো।"

"তুমি কি লাল (লালা লাজপৎরায়); বাল (বাল গংগাধর তিলক), আর পাল (বিপিন চন্দ্র পাল) এর কথাই বলতে চাইছ ?"

"এই লাল, বাল, পাল—এঁরা ছিলেন বাইরের প্রতীক। রাশিয়াকে পরাভূত করে (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) জাপান নিজেকে বৃহৎ শক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে এশিয়ায় এক নবজাগৃতির সূচনা এনে দিলো। কার্জনের বংগভংগ এবং জাপানীদের এই জয়যাত্রা ভারতীয় যুবকদের কংগ্রেসের অস্পষ্ট বক্তৃতার জড়তা ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জোগালো। অর্ধশতাব্দী পর ভারতীয়গণ নিজেদের জন্য মরতে শিখল, এ বিষয়ে

আয়ার্লণ্ড এবং রাশিয়ার শহীদদের উদাহরণেও অনুপ্রাণিত হলাম আমরা। কাজেই বর্তমান ঘটনাবলীর কারণ অনুসন্ধান শুধু ভারতবর্ষের ভেতরে করতে গেলে ভুল হবে না কি ?"

"নিশ্চয়ই, ডুনিয়ার সকল জায়গাই যে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত।"

"কোন বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি নির্ভর করে ছুটো বিষয়ের উপর। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তসমূহ থেকে কত খানি প্রেরণা লাভ করল এবং সে দেশের সবচেয়ে সংগ্রামী শ্রেণী কতটা পরিমাণে অংশ গ্রহণ করলো তা'তে, প্রথম উৎসের উদাহরণ আমি দিয়েছি। দ্বিতীয় উৎস হল মজুর-কৃষক জনতা। বিপ্লবী যুদ্ধ সেই চালাতে পারে হারাবার মত যাদের কিছু নেই বললেই চলে। সাকিনার অধর-সুধা, এই বাংলো এবং গাঁয়ে পৈতৃক জমিদারী হারাবার ভয় যার আছে বিপ্লবের সৈনিক সে হতে পারে না। এই জন্যই আমি বলছিলাম যে সাধারণ জনতাই শুধু বিপ্লবের বাহন হতে পারে।"

"এ বিষয়ে আমি একমত।"

"তাহলে জনতার ভিতর যে উত্তেজনা আজ হয়েছে তাকে উপলব্ধি করে আর অপরদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে কতটা প্রেরণা পাওয়া যাচ্ছে সে সম্বন্ধেও একবার চিন্তা করে ছাখো। গত মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) গোটা পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পুঁজি এবং উৎপাদিত পণ্যের জন্য সুরক্ষিত বাজার দখলে রাখবার বা বলপূর্বক অধিকার করতে যাবার পরিণাম। জার্মানীর নতুন উপনিবেশের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পৃথিবী বণ্টন করা হয়েছিল আগে থাকতেই। তাই যুদ্ধ করেই সে উপনিবেশ ছিনিয়ে নেবার প্রয়োজন হলো, আর এই জন্যই উপনিবেশের মালিক ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সংগে সংঘর্ষ বাধলো জার্মানীর। যুদ্ধে জার্মানী হেরে গেল, কিন্তু সংগে সংগেই সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন চূরমার করে দেবার জন্য অপর এক শক্র জন্মলাভ করল,—যার নাম হল সাম্যবাদ। সাম্যবাদের শাসনাধীনে উৎপাদন মুনাফাশিকারের যন্ত্র নয়, পরন্তু মানব সমাজকে সুখী এবং সমৃদ্ধ করে তোলবার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, কলকারখানা প্রসার লাভ করে, পণ্যউৎপাদন বেড়ে যায় এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত বাজারের। আবার ঐ সব পণ্য ক্রয় করার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয় যার জন্য ক্রেতার পূর্ণ মজুরী লাভের সুযোগ থাকা উচিৎ। ক্রেতার অর্থ যত কম থাকবে, পণ্যও সেই পরিমাণে অবিক্রীত পড়ে থাকবে বাজারে বা গুদামে। পণ্য উৎপাদন সংক্ষেপে করে আনতে হবে, ফলে, কারখানা কাজেই বহুলাংশে বন্ধ হয়ে যাবে, মজুরেরা বেকার হয়ে পড়বে, মাল খরিদ করবার মত পয়সাও তাদের হাতে থাকবে না। লোকে তখন মাল খরিদ করবে কী করে বল, কারখানাই বা চালু থাকবে কী করে! সাম্যবাদ বলে এই যে, মুনাফার বাসনা ত্যাগ কর। নিজ রাষ্ট্র বা সমগ্র পৃথিবীকে একক পরিবার বিবেচনা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করে না। প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী শ্রম আদায় কর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জীবন ধারণের উপযোগী আবশ্যকীয় সামগ্রী দাও, অবিশ্রি যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজন মেটাবার মত কলকারখানা এবং

কারীগর ইঞ্জিনীয়ার সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দাও। আর এই সমস্ত ব্যবস্থা একমাত্র তখনই হতে পারে, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই থাকবে না, কারখানা এবং সমগ্র উৎপাদন যন্ত্রের উপর থেকেই ব্যক্তির অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

"এরকম কল্পনা সত্যিই সুন্দর।"

"এখন আর এ শুধু কল্পনাই নয় শংকর; পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী দুনিয়া অবশ্য আজও মানবতার এই একমাত্র আশা ভরসার স্থলকে নির্মূল করতে চাইছে, কিন্তু সোভিয়েট সরকার প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য হাংগেরীতে মাত্র ছমাস পরে (মার্চ—আগষ্ট, ১৯১৮) ফ্রান্স এবং আমেরিকার পুঁজিপতিগণের সাহায্যে সোভিয়েট শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ায় মজুর কৃষক রাজের অস্তিত্ব সমগ্র দুনিয়ার সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আর এই সোভিয়েট শাসন কায়েম করেছে যে বিরাট শক্তি তা সমস্ত দেশেই কাজ করে চলেছে, যুদ্ধ থেমে যাবার সংগে সংগেই ইংরেজরা রাউলাট বিল পাশ করবার জন্য এত তাড়াহুড়ো করেছিল কেন? এই বিশ্ববিপ্লবী শক্তিকেই দমন করবার জন্য। তারপর ভেবে ছাখো—যদি ওই বিপ্লবীশক্তি পৃথিবীকে রূপান্তরিত করবার জন্য দেশে দেশে তার বীজ বপন না করত, ত ইংরেজরা রাউলাট বিল পাশই করত না। রাউলাট বিল পাশ হতো না এবং গান্ধীও তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন না। আর অমনি আহ্বানে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে না তুললে ১৮৫৭র পর থেকে চাপা পড়ে থাকা আগুন আজ আবার জ্বলে উঠ্‌ত না। এই জন্যই ত আমি বলছি যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে এক বিপ্লবী যুগে এসে পড়েছি।"

"তাহলে তোমার মতে গান্ধী বিপ্লবী নেতা? কিন্তু যে গান্ধী গোখেলের মত ভাবপ্রবণ নেতাকে নিজের গুরু বলে মনে করেন, তিনি কী করে বিপ্লবী নেতা হতে পারেন সফ্‌ফু ভাই?"

"গান্ধীর সমগ্র আদর্শ এবং সমস্ত কাজকে আমি বিপ্লবধর্মী বলে মনে করি না শংকর। বিপ্লবী শক্তির আধার সাধারণ জনতাকে যে তিনি সংগ্রামে আহ্বান করছেন আমি শুধু তাঁর সেই কাজটুকুকেই বিপ্লবধর্মী বলে মনে করি। তাঁর ধর্মের দোহাই—বিশেষ করে খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে—তাঁকে আমি বরং সরাসরি বিপ্লব বিরোধী চাল বলেই মনে করি। কলকারখানার যুগ ছেড়ে তাঁর অতীতে ফিরে যাবার প্রচেষ্টাকেও আমি বিপ্লবের পথ থেকে এক বিচ্যুতি বলে মনে করি। আর তাঁর স্কুলে-কলেজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তকেও আমি ওই একই পর্যায়ে ফেলি।"

"তোমার মংগল হোক সফ্‌ফু ভাই। তুমি যখন গান্ধীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠ্‌ছিল আমার ত শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল তখন। আমি ভাবছিলাম, তুমিও ত আবার স্কুল কলেজগুলোকে শয়তানের বাসা আখ্যা দিয়ে বসবে না!"

"শিক্ষার প্রণালী দোষযুক্ত হতে পারে শংকর, কিন্তু আজকের স্কুল-কলেজে বসে

সায়েন্সের সংগে পরিচয় ঘটে আমাদের। সে সায়েন্সকে বাদ দিলে মানুষ আজ মানুষ হয়ে থাকতে পারে না। আমাদের মুক্তি যখনই আসুক না কেন, সায়েন্সের কাজ বহুলাংশেই বর্তমান থাকবে। ক্রমবর্ধমান মানুষের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ঐ সায়েন্সের উপরই নির্ভরশীল—তাই সায়েন্সকে ছেড়ে অতীতের পথে পা বাড়ানো আত্মহত্যারই সামিল আজ। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়ে চরখা-তাঁতের পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিপ্লবী সেনাদলে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের আহ্বান করা মোটেই অন্যায় নয়—এ ত তুমিও স্বীকার করবে শংকর।"

"নিশ্চয়! আর অন্যান্য বয়কটগুলোর কথা কী বল তুমি?"

"আদালত বয়কট? সে কিন্তু ঠিকই। তার সাহায্যে আমরা বিদেশী শাসকবৃন্দকে আমাদের ক্ষমতার পরিধি এবং তীব্র অসন্তোষের কথা জানাতে পারি। আর বিলিতি জিনিষ বর্জন করা ত বিলিতি ব্যবসায়ীর গালে এক প্রচণ্ড চড় মারার সামিল। তাছাড়া এতে আমাদের স্বদেশী শিল্প প্রসারের প্রেরণাও মিলবে।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই সফফু, বহুদূর পর্যন্তই এগিয়ে গেছ তুমি।"

"এখনও যাইনি। কিন্তু যেতে আমি চাই।"

"যেতে চাও!"

"তুমি আগে বলত আমরা বিপ্লবী যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি কিনা?"

"তোমাকে আমিই ত কতবার অমনি প্রশ্ন করেছি সফফু ভাই। যেদিন থেকে আমি রুশ-বিপ্লবের খবর শুনলাম, সেদিন থেকেই খুঁজে খুঁজে সাম্যবাদী সাহিত্য পড়তে লাগলাম এবং তার চেয়েও বেশী, নিজেদের সমস্যাগুলো সাম্যবাদ দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার করতে সুরু করলাম।

এতদিন পর্যন্ত আমি শুধু এই সন্দেহের মধ্যে ছিলাম যে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এই মহান্ উদ্দেশ্যের পরিপূরক হবে কিনা। কিন্তু যেমনি তুমি বিপ্লবী জনতার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, অমনি আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। গান্ধীকে আমি বিপ্লবের যোগ্য বাহন বলে মনে করি না সফফু ভাই, তোমার কাছে খোলাখুলিই বলছি সে কথা। কিন্তু জনতার শক্তির উপরে আমি বিশ্বাস রাখি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত সামন্তগণ চর্বী, কার্তুজ আর ধর্ম-বিপদ্‌গ্রস্ত-এর ধূয়া তুলে জনতার এক শক্তিশালী অংশকে দলে টেনে নিয়ে ছিল, কিন্তু আজ রুটির দাবীতেই সমগ্র জনতা আন্দোলনের মাঝে এসে পড়ছে। আমার মনে হয় উত্তেজনার এই কারণ যথার্থ, বিপ্লবের ধ্বনিটাও খাঁটিই; এবং গান্ধী যদি পরে নিজের আসল রূপে অবতীর্ণ হন তবুও বিপ্লবের গতি ফেরাতে সক্ষম হবেন না তিনি।"

"এইজন্যই আমি ঠিক করেছি যে বিপ্লবী সেনাদলে আমি ভর্ত্তি হবো, হবো অসহযোগী।"

"এত তাড়াতাড়ি!"

"তাড়াতাড়ি করলে অনেক আগেই লড়ায়ের ময়দানে নেমে পড়তাম। অনেক

বিচার-বিবেচনার পর আজ তোমার মতামত শুনে আমি সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করছি।"

সফ্‌দর যখন গম্ভীরস্বরে এই কথা গুলো বলছিলেন, শংকরের দৃষ্টি তখন কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে সফ্‌দর আবার বললেন—"তুমি হয়ত ভাবছ বন্ধু, তোমার বৌদির অধর-রাগের কথা, তার রেশমী শাড়ীর মখমলের পাড়টির কথা, অথবা এই বাংলো এবং তার খানসামাদের কথা! সাকিনার উপর অবশ্য কোন জোর করব না আমি, তার যেমন ইচ্ছা জীবন যাপন করুক সে। তার জন্যে তার নিজের সম্পত্তি এবং এই বাংলো রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে এসবের আর কোন আকর্ষণই নেই। তার যেমন ইচ্ছা ঐ দিয়ে জীবন কাটাক সে।"

"তোমার এবং বৌদির কথাই শুধু ভাবছি না আমি, ভাবছি আমার নিজের সম্বন্ধেও। আমার চলার পথে যে মানসিক বাধা ছিল তা দূর হয়ে গেছে। চলো আমরা দু ভাই একসংগেই বিপ্লবের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সফ্‌দর বললেন—"অক্সফোর্ডে বসে তোমার সম্বন্ধেই আমার বড় ভয় ছিল শংকর। এবারে ত আমি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবো।"

সাকিনা এসে খেতে ডাকতেই দুই বন্ধুর বৈঠক শেষ হয়ে গেল।

২

এই রাত থেকে সফ্‌দরকে কিছুটা প্রফুল্ল দেখতে পেলেন সাকিনা। কিন্তু তিনি ভাবলেন যে, এ হয়ত শংকরের সাথে গল্প গুজবের ফল। সফ্‌দরের কাছে সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার হল নিজ সিদ্ধান্তের কথা সাকিনাকে জানানো। এমনিতে সফ্‌দরও আদরআহ্লাদের মাঝে দিয়ে লালিত হয়েছেন। কিন্তু তাহলেও তিনি ছিলেন গাঁয়ের লোক। নগ্ন দারিদ্র্যকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, যে পরীক্ষার তিনি অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, তাতে উত্তীর্ণও নিশ্চয়ই হবেন। কিন্তু সাকিনার কথা স্বতন্ত্র। শহরের এক ধনীর গৃহে পালিত হয়েছেন তিনি। তাঁর সম্বন্ধে একথাই বলা যেতে পারে যে, পা দিয়ে কখনো কঠিন মাটি স্পর্শ করেননি তিনি। রবিবার দিনও তাই সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না সফ্‌দর। সোমবার দিন চীফ্‌কোর্টে যখন নিজের নিকট-বন্ধুদেরও তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান হয়ে গেল, তখন সাকিনাকে জানানোর প্রয়োজন আরও প্রবল ভাবে অনুভব করলেন তিনি।

সে রাতে তিনি লক্ষ্ণৌর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যাম্পেন আনালেন। সাকিনা ভাবলেন যে আজ আরও কোন বন্ধু আসবেন বুঝি। কিন্তু খাওয়ার পর যখন বেয়ারাকে শ্যাম্পেন খুলে এনে দিতে বললেন সফ্‌দর, তখন সাকিনার কৌতূহল হল কিছুটা। সাকিনার ঠোঁটে

শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ধরে সফ্‌দর বললেন। "সাকিনা, প্রিয়তমা, আমার কাছে এটাই তোমার শেষ প্রসাদ হয়ে দাঁড়াবে।"

"তুমি মদ ছেড়ে দিচ্ছ প্রিয়তম?"

"হ্যাঁ প্রিয়তমে, আরও অনেক কিছুই ছাড়ছি, কিন্তু তোমাকে নয়। এখন থেকে তুমিই হবে আমার সুরা। তোমার সৌন্দর্যসুধা পান করেই আমার দৃষ্টি নেশায় বিভোর হয়ে উঠবে।"

এই কথার পর সাকিনার কাতর চেহারা লক্ষ্য করে আবার বললেন সফ্‌দর—"প্রিয়তমা সাকিনা আমার কাছে এসো, আমরা এই শ্যাম্পেন পান করি এখন। আরও অনেক আলোচনাই করবার রয়েছে আমাদের।"

সুরাপানে সাকিনার কোনই ভাবান্তর হল না, যদিও সফদর ওমর-খৈয়ম থেকে অনেকটাই আবৃত্তি করে গেলেন।

চাকর-বাকরেরা বিদায় নেবার পর সাকিনা যখন স্বামীর কাছে এসে অমংগল-আশংকায় অভিভূত হয়ে শুয়ে পড়লেন, তখন নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন সফ্‌দর।

"প্রিয়তমা সাকিনা, আমি এক গুরুতর সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। যদিও আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি যে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় তোমাকেও কিছু বলার সুযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল আমার। কিন্তু এই অপরাধ আমি কেন করেছি, আমার পরবর্তী কথাগুলো থেকেই তা বুঝতে পারবে তুমি। সংক্ষেপে আমার সিদ্ধান্তের মূল কথা হল, আমি এখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হতে চলেছি।"

কথাগুলো সাকিনার হৃদয়ে এসে বজ্রাঘাত হেনে বসল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আর এজন্য মুখে কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে সফ্‌দর আবার বললেন, "কিন্তু সাকিনা প্রিয়তমা আমার, তোমাকে আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর পালিত হতে দেখেছি, কাজেই এ কৃচ্ছ্রসাধনার মাঝে তোমাকে টেনে আনতে চাইনা।"

সাকিনার মনে হল যেন আর একবার নতুন করে আঘাত লাগল তাঁর মনে। এ আঘাত যেন প্রথম আঘাতকেও ভুলিয়ে দিল। আঘাতে আঘাতে আত্মসম্মান জেগে উঠল সাকিনার এবং তিনি বলে উঠলেন, "প্রিয়তম, তুমি কি সত্যই আমাকে এতটা আরামপ্রিয় বলে মনে কর যে তোমাকে কষ্ট সইতে দেখেও আমি পালংকের উপর বসে থাকতে চাইব? শোন সফ্‌দর যদি প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ভালবেসে থাকি, তবে সে ভালবাসা আমাকে তোমার সাথে যে-কোনোখানে যাবার শক্তি জোগাবে। অধর-রাগ অনেক ব্যবহার করেছি আমি, বহুসময় নিঃশেষ করে দিয়েছি শুধু সাজ পোষাকেই, কঠোর জীবনের সংগে পরিচিত হতে কোনোদিনই চেষ্টা করিনি আমি,—এ সবই সত্যি কথা। কিন্তু তাহলেও তুমিই আমার সব সফ্‌দর। এবং তাও এইজন্যে নয়, যে, আমি তোমার সব হয়ে থাকতে চাই বরং এইজন্যেই আমি একথা বলছি যে আমি চিরদিনই তোমার

সাথে সাথে থাকব। আর আমার বর্তমান জীবনের পথ প্রদর্শন যেমন তুমিই করছিল তেমনি আগামী জীবনেও তুমিই আবার আমার পথ-প্রদর্শক হবে।"

সফ্দর কিন্তু এতটা আশা করেননি। যদিও তিনি জানতেন যে সাকিনা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মেয়ে। সফ্দর আবার বলতে লাগলেন,—"নতুন মোকদ্দমা নেওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। পুরোনোগুলোর মধ্য থেকে অনেক অন্যের কাছে সোপর্দ করে দিচ্ছি। আশা করছি এই সপ্তাহের মধ্যেই আদালতের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে যাব আমি। আরও একটা খবর শুনবে সাকিনা? শংকরও আমার সাথে আন্দোলনে ঝাঁপ দিচ্ছে।

"শংকর একটি রত্ন সাকিনা, রত্ন। আমার সংগে সে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত।"

"শংকরের এই ত্যাগ কিন্তু তোমার চেয়েও বড় সফ্দর।"

"আত্মত্যাগের জীবনই সে বরণ করে নিয়েছিল সাকিনা। স্বেচ্ছায় এপথ থেকে কোনদিনই সরেনি সে। তা না হলে খুবই বড় উকীল সে হতে পারত, অথবা নিজের চাকরীতেও যথেষ্ট উন্নতি করতে পারত।"

"তার দুই ছেলে যখন মারা যায়, তখন খুবই কেঁদেছিলাম আমি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে চারটি থেকে দুটি বোঝা কমে যাওয়ায় ভালই হয়েছে।"

"আচ্ছা শংকরের এই সিদ্ধান্তকে চম্পা কী ভাবে গ্রহণ করবে সাকিনা?"

"চোখ বুজে মেনে নেবে সে। তোমাকে কী করে ভালবাসতে হবে সেই ত আমাকে শিখিয়েছে সফফু!"

"ভবিষ্যতের থাকা খাওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা আমাদের করে রাখতে হবে।"

"তুমি ত এই প্রথম বললে একথা, এ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ পেলাম কই? আচ্ছা তুমিই বলো না কী ব্যবস্থা করা যাবে?"

"আমাদের গাঁয়ের ঝি শরীফন, এবং মংগরুকে রেখে বাকী সব চাকরকে দুমাসের মাইনে বখ্শিস্ দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে।"

"বেশ।"

"দুখানা মোটর গাড়ীই বেচে দিতে হবে।"

"ভালোই হবে।"

"দুএকটা খাট আর কিছু মুরগী ছাড়া ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র বিলিয়ে অথবা নীলাম করে দিতে হবে।"

"সেও ভালোই হবে।"

"লাটুশ রোডে মাসীর যে বাড়ী আমরা পেয়েছি, সেখানেই থাকব গিয়ে, আর এই বাংলো ভাড়া দিয়ে দেব।"

"খুব চমৎকার ব্যবস্থা।"

"আর ত কিছুই মনে পড়ছে না!"

"আর আমার কাপড়-চোপড়—আমার বিলিতি কাপড়-চোপড়গুলো?"

"গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছি তাই ও গুলোর কথা বলছো? আমি কিন্তু ওসব পোড়াবার পক্ষপাতী নই, বিশেষ করে বিলিতি কাপড়ের স্তূপ যখন প্রচুর পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। অবিশ্যি আমার খদ্দরের পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরশুই তৈরী হয়ে আসবে।"

"তুমি কিন্তু বড্ড স্বার্থপর সফ্‌দু!"

"খদ্দরের ভারী মোটা শাড়ী তুমি পরবে সাকিনা?"

"তোমার সাথে আমি সর্বরকমেই চলতে পারব।"

'এই সব কাপড়ের কী হবে।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"নীলামে বিক্রী করা যেতে যদি, ত, সে টাকায় কাপড় কিনে গরীবদের বিলিয়ে দিতাম। তা-ই চেষ্টা করে দেখব আমি।"

৩

সফ্‌দরের মত উদীয়মান ব্যারিষ্টারের এই মহান্ ত্যাগের কথা চতুর্দিকে আলোচিত হতে লাগল। সফ্‌দর যদিও শংকরকেই প্রশংসার যোগ্যতর পাত্র বলে মনে করতেন। সারা অক্টোবর এবং নভেম্বর জুড়ে সফ্‌দর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাবার সুযোগ পেলেন। কখনো কখনো সাকিনা বা শংকর তাঁর সংগে থাকতেন। গ্রামের দিকে তাঁর মনোযোগ বেশী ছিল, কারণ গ্রামের কৃষক-মজুরের উপর যতটা আস্থা ছিল তার, লেখাপড়াজানা শহরের লোকের উপর ততটা ছিল না। কিন্তু একসপ্তাহের ভিতরই তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর উচ্চশ্রেণীর উর্দু এক-চতুর্থাংশও গাঁয়ের লোকে বুঝতে পারছে না। শংকর কিন্তু প্রথম থেকেই গেঁয়ো ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন। তার সাফল্য দেখে সফ্‌দরও অযোধ্যার ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া ঠিক করলেন। প্রথমে তাঁর কথাবার্তায় পুঁথিগত শব্দই বেশী থাকতে কিন্তু শংকরের সাহায্য এবং নিজের পরিশ্রমে দুমাস যেতে না যেতেই ভুলে যাওয়া বহু শব্দ এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন বহু শব্দ রপ্ত করে ফেললেন তিনি। এরপর থেকে গ্রামীন জনসাধারণ মনোযোগ দিয়েই শুনতে লাগল তাঁর কথা।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১৯২২ খৃঃ) এখানকার বহু রাজনৈতিক কর্মীর মত সফ্‌দর এবং শংকরও এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফৈজাবাদ জেলে প্রেরিত হলেন। চম্পা এবং সাকিনা এরপরও কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের গ্রেপ্তার করা হলো না।

জেলে গিয়ে রোজ একঘণ্টা নিয়মিত চরখা কাটতেন সফ্‌দর। যারা তাঁর গান্ধী-

বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের কথা জানত, তারা কটাক্ষ করত তাঁর এই চরখা কাটায়। সফ্‌দর কৈফিয়ৎ দিতেন—"বিলিতি কাপড বয়কট করাকে আমি একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার বলে মনে করি ; সেই সংগে এও আমি জানি যে আমাদের দেশে এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে কাপড তৈরী হয় না, তাই কাপডও আমাদের তৈরী করতে হবে। তবে দেশের কারখানা সমূহ যখন পর্যাপ্ত বস্ত্র উৎপাদন করবে, তখন আর চরখা কাটার পক্ষপাতী থাকব না আমি।"

জেলের ভিতর অলস ভাবে বসে থাকা লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী। এই সমস্ত লোকেরা গান্ধীজীর একবছরে স্বরাজ আশার কথায় আস্থাবান হয়ে বসেছিল। তারা মনে করত, জেলে আসাতেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীবাদী আদর্শে তখন পর্যাপ্ত ভণ্ডামী, ধাপ্পাবাজী আর লোক দেখানোর স্থান ছিল না, কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে এই সব বন্দীর মধ্যে সাচ্চা দেশভক্তের সংখ্যাই ছিল বেশী। তবুও সফ্‌দর এবং শংকরের আক্ষেপ হতো এই দেখে যে, রাজনৈতিক জ্ঞান বাডাবার দিকে এদের একরকম দৃষ্টি নেই বললেই চলে। এদের অনেকে রামায়ণ, গীতা বা কোরাণ পাঠ করত, মালা হাতে নাম জপত, আবার অনেকে শুধু তাস,পাশাতেই সমস্তটুকু সময় অতিবাহিত করত।

একদিন গান্ধীবাদী রাজনীতির দিগ্‌গজ পণ্ডিত বিনায়কপ্রসাদের সংগে দেখা করলেন সফ্‌দর। শংকরও সে সময় সেখানেই ছিলেন। বিনায়কপ্রসাদ বললেন—"অহিংসা-রাজনীতির প্রয়োগ গান্ধীজীর এক মহান আবিষ্কার এবং অমোঘ অস্ত্র এক।"

"আমাদের বর্তমান অবস্থায় এ উপযোগী হতে পারে, কিন্তু অহিংসা অমোঘ-সমোঘ কোনো অস্ত্রই নয়। পৃথিবীতে যত অহিংস পশু আছে তারাই অধিকতর ভাবে অপরের শিকার হয়।"

"পশুকুলে না হতে পারে, কিন্তু মানুষের মধ্যে অহিংসা এক অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার করে দেয়।"

"রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে কোনোই নজীর নেই।"

"নতুন আবিষ্কারের নজীর থাকে না কোনো।"

"এটা নতুন আবিষ্কার নয়।" শংকর বলে উঠলেন। "বুদ্ধ, মহাবীরের মত বহু ধর্মোপদেশক এই অহিংসা নীতির উপর জোর দিয়ে গেছেন।"

"কিন্তু তা' রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়।"

সফ্‌দর—"রাজনীতির ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা যা কিছু বেডে গেছে সে এইজন্যই যে, মানবতা আজ কিছুটা উঁচুতে উঠে গিয়েছে। সংবাদপত্রে গুলি চালাবার খবর পড়ে লোকে আজ তার নিন্দাই করে। জালিয়ানওয়ালবাগে গুলি চালিয়ে ইংরেজরা এর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছে।"

"তাহলে আপনার মতে আমাদের এই অহিংসাত্মক-অসহযোগ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়?"

"প্রথমে আপনি বলুন, স্বরাজের সংজ্ঞা কী ?"

"আপনিও ত স্বাধীনতার সংগ্রামে নেমেছেন, আপনিই বলুন না ?"

"আমি ত মনে করি স্বরাজ মানে মেহনতকারীর রাজত্ব—শুধু মেহনতকারীর ।"

"তাহলে আপনার স্বরাজে মন-প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, কষ্ট করে কারাবরণ করা, শিক্ষিত পুঁজিপতি এবং জমিদারদের কোনোই অধিকার থাকবে না ?"

"এ ত আপনিই দেখেছেন যে পুঁজিপতি এবং জমিদারেরা সালিশী-সভা বসিয়েই অবসর পায় না। ওরা জেলে আসতে যাবে কেন ! আর যদি কেউ এসেও থাকে তবে শ্রমজীবীর স্বার্থের সংগে তার স্বার্থকে আলাদা করে দেখা কখনোই উচিত হবে না।"

শংকর এবং সফ্‌দর সর্বদাই বই পড়তেন, এবং দেশের আর্থিক সামাজিক সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রথম দিকে তাঁদের কথা লোকে খুব কমই শুনত। কিন্তু যখন ৩১ ডিসেম্বর (১৯২১ খৃষ্টাব্দ) মধ্য রাত্রি পার হয়ে যাবার পরও জেলের ফটক খুললো না, এবং তারা নিরাশ হয়ে পড়লো ; যখন আতংকিত, উত্তেজিত জনতা কর্তৃক চৌরীচৌরায় কয়েকজন পুলিশের লোকের হত্যার খবর শুনে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দিলেন—তখন বহুলোকই গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল এবং তাদের মধ্যে কিছু এগিয়ে এসে সফ্‌দর এবং শংকরের এই কথার সংগে একমত হয়ে উঠল যে, বিপ্লবী শক্তির একমাত্র উৎস জনসাধারণ, গান্ধীজীর মস্তিষ্ক নয়। আর জনসাধারণের এই শক্তিকে অবিশ্বাস করে গান্ধী নিজেকে বিপ্লব-বিরোধী বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

—শেষ—